উত্তর বাংলার সেরা ওয়েব ম্যাগাজিন www.ekhondooars.com

উত্তরে বাংলার মুক্ত কণ্ঠ

এখন ডুয়ার্স

ডিসেম্বর ২০২০। মূল্য ৩০ টাকা

জল। জঙ্গল। জনসত্তা

বিশেষ
বর্ষ বিদায়
সংখ্যা

সঙ্গে ২০২১-র
ক্যালেন্ডার
ফ্রি !!

হারিয়ে গেছে পাঠশালা

অন্তিম মেগা পর্ব
সার্জেন রেনী'র ডায়েরি
তাজ্জব মহাভারত

মাদারিহাট
রংলি রংলিওট

গল্প। গৌতম রায়। রুমেলা দাশ। সৌরভ দত্ত।

ডুয়ার্সের বইপত্র অনলাইনে
www.dooarsbooks.com

বন্ধুদের অপেক্ষায় ভালোবাসার বইঘর

প্রকাশিত হল

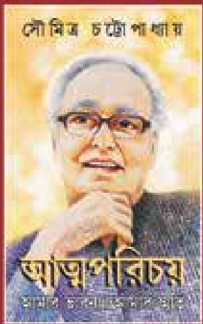

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

আত্মপরিচয় 395/-

'জার্নালের মতো করে নিজের ধ্যানধারণা ভাবনাচিন্তা এমনকি স্মৃতি সংলগ্ন কিছু বিষয় নিয়ে দৈনিকের রবিবারের পাতায় মাঝে মাঝে কিছু লেখা প্রকাশ পেয়েছিল। সেগুলি গ্রন্থরূপে প্রকাশ করার আগ্রহ কচিৎ কখনও আন্দোলিত হলেও অনেকদিন অবধি এটিকে গ্রন্থ হিসেবে প্রকাশ করা হয়ে ওঠেনি।'

সমরেশ মজুমদার

সরাসরি পাণ্ডুলিপি থেকে

হায় সজনি

চূড়ান্ত রোমান্টিক উপন্যাস 199/-

এখনও যেসব বই বেস্টসেলার!

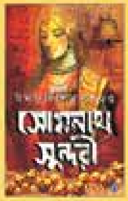

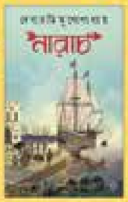

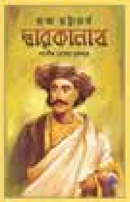

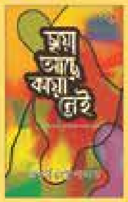

সুন্দরী সিরিজের শ্রেষ্ঠ বই! ঐতিহাসিক পটভূমিকায়

হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত **সোমনাথ সুন্দরী** 395/-

উনবিংশ শতাব্দীর মর্মস্পর্শী দলিল! অন্ধকারে আলোর মশাল

দেবারতি মুখোপাধ্যায় **নারাচ** 385/-

তিনি ছাড়া ঠাকুর পরিবার শিকড়হীন! পরাধীন দেশের রাজপুত্র

রাজা ভট্টাচার্য **দ্বারকানাথ** 349/-

তন্ত্র-অলৌকিক-অপবিজ্ঞানের গায়ে কাঁটা দেওয়া বই

অভীক সরকার **পেতবথু** 199/-

অন্যজগতের অতিথিদের অব্যক্ত কথা!

অপূর্ব চট্টোপাধ্যায় **ছায়া আছে কায়া নেই** 249/-

বইসাঁকোর নতুন বই

হুমায়ূন আহমেদ

নন্দিত নরকে 120/-

শঙ্খনীল কারাগার 135/-

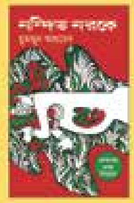

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়

গোপন প্রেম 175/-

মৃত্যুকে আমি দেখেছি 199/-

শেষ ছোবল 160/-

ষোলোজনের কলমে
ভয়াল ভুতুড়ে উপন্যাস
ভূমিকা অনীশ দেব

প্রকাশ আসন্ন

পানিঝোরা কটেজ

পত্রভারতী 3/1 কলেজ রো, কলকাতা 700 009 ফোন 22411175, 9433075550

বর্ধমান, কৃষ্ণনগর, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি

নতুন বই ও ক্যাটালগের জন্য bookspatrabharati.com

উত্তরবঙ্গে প্রাপ্তিস্থান: ডুয়ার্স বুকস ডট কম, সনাতন অ্যাপার্টমেন্ট, পাহাড়ি পাড়া, কদমতলা, জলপাইগুড়ি ৭৩৫১০১, **হোম ডেলিভারি** ফোন ৬২৯৭৭৩১১৮৮

এখন ডুয়ার্স

সপ্তম বর্ষ, ৪য় সংখ্যা, ডিসেম্বর২০২০

সম্পাদনা ও প্রকাশনা
প্রদোষ রঞ্জন সাহা

সাহিত্য বিভাগ সম্পাদনা
শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

সহকারী সম্পাদনা
শ্বেতা সরখেল

অলংকরণ
শান্তনু সরকার

সার্কুলেশন
দেবজ্যোতি কর
দিলীপ বড়ুয়া

মুদ্রণ অ্যালবাট্রস

ইমেল
ekhonduars@yahoo.com

সম্পাদকীয় দপ্তর সনাতন অ্যাপার্টমেন্ট, পাহাড়ি পাড়া, কদমতলা, জলপাইগুড়ি ৭৩৫১০১

প্রচ্ছদ সার্থক পণ্ডিত

এখন ডুয়ার্স পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর দায়িত্ব পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়। যে কোনও প্রকার আইনি ব্যবস্থা কলকাতা এলাকার মধ্যে হতে হবে। এই সংখ্যায় বেশ কিছু ছবি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

মূল্য ৩০ টাকা

সম্পাদকের চিঠি ২

ধারাবাহিক প্রতিবেদন
সার্জেন রেনী'র ডুয়ার্স যুদ্ধের ডায়েরি ৩

কভার স্টোরি। হারিয়ে গেছে পাঠশালা ২২

আসামের চিঠি
আসছে ভোটে বিরোধীরা জোট বাঁধছে, নাগরিক ছেড়ে কথা কইবে না ২৬

মুর্শিদাবাদ মেইল
বেলডাঙ্গার ঐতিহ্যবাহী গণ উৎসব কার্তিক লড়াই ৩০

এ ডুয়ার্স কি তোমার চেনা?
জলদাপাড়া কমলাভোগের মাদারিহাটে মা দাঁড়িয়ে ৩৪

পর্যটন
চা-বাগিচার জলসাঘর রংলি রংলিওট ৪০

এ নদী কেমন নদী
নদীর দিকে আর কবে নজর ঘুরবে কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে ৪৫

ধারাবাহিক উপন্যাস। ডাউন হলদিবাড়ি সুপারফাস্ট ৪৮

গল্প
ছাতিম ফুলের গন্ধ ৫৮, প্রাপ্তি ৬৩, যখন ভালবাসা নিষিদ্ধ ৬৯

ধারাবাহিক কাহিনি। তাজ্জব মহাভারত ৭৫

আমচরিত কথা। শখ-আহ্লাদ-নেশা ৮৭

রাজনগরের রাজনীতি
গোষ্ঠী বিবাদের আত্মঘাতী কংগ্রেসী বিষ ৯১

একুশের রাজনীতি
উত্তরীয় অভিমান প্রিয়রঞ্জন আজ বড় প্রাসঙ্গিক ৯৫

খুচরো ডুয়ার্স। নতুন বছর কেমন যাবে ১০২

শ্রীমতি ডুয়ার্স
বিজ্ঞানের দুনিয়ায় ভারতীয় নারী ১০৫, পুরাণের নারী সত্যবতী ১১০, পাতাবাহার ১১২

একটি অনাকাঙ্খিত বর্ষ বিদায় কালে

একটা গোলমেলে বছরের অবসান ঘটতে চলেছে। একটি বিদঘুটে বর্ষের সমাপ্তি ঘোষণা হতে চলেছে। একটা ভয়ংকর কালের শেষ লগ্নে উপস্থিত হয়েছি সবাই। সত্যিই কি শেষ পর্যন্ত জয়ী হল মানুষ? ইয়ার টোয়েন্টি টোয়েন্টিকে সভ্যতার এক অনাস্বাদিত মাইলস্টোন হিসেবে দেখতে চেয়েছিলাম যারা, তাদের গালে পড়েছে বিরাশি সিক্কার এক বিশাল থাপ্পড়— এ নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কুড়ি কুড়ি সাল তাই ছিল নিজেকে ফিরে দেখবার সংশোধনী কাল। সুস্থ শরীরে বেঁচে থাকাটা যে সর্বাগ্রে জরুরি এবং সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ, বিশ সাল তা মানুষকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে।

কোভিডের আক্রোশ ক্রমে নিস্তেজ হয়ে আসছে, তা টের পাওয়া যায়। কারণ এক, প্রতিষেধক পৌঁছে গিয়েছে প্রায় দোরগোড়ায়, অপেক্ষা কেবল তার বাণিজ্য পসরা সাজিয়ে বসার। দুই, কোটি কোটি পেটের দায় কোভিডের মারণ চেহারাকে এদেশে ‘বড়লোকের অসুখ’ বলে দেগে দিয়েছে। এবং সত্যি সত্যিই তা খেটে খাওয়া শ্রমিক কিষাণের গায়ে আঁচড় বসাতে পারে নি। আগামী দিনে প্রতিষেধক টিকাকরণের সরকারি আহ্বানে তারা আদৌ কতটা সাড়া দেবে সন্দেহ আছে। নিন্দুকেরা যদিও বলে, টিকার বাজার ধরে রাখতেই নাকি কোভিডের ভূত এখনও ঘাড় থেকে নামায় নি সরকার, সম্ভবত সে কারণেই ইস্কুল কলেজ আজও খোলে নি, দ্বিতীয় করোনা ঢেউ বা ফের লকডাউন নিয়ে এখনও গুজবের ঢেউ থামে নি। আবিষ্কৃত হচ্ছে করোনার নতুন নতুন উপসর্গ, কিন্তু বাজার এখনও শুয়ে, কবে জাগবে বোঝা ভার।

কুড়ি সালটা মানুষ কোনওমতে ঘরে বসে কাটিয়ে দিল, কিন্তু প্রকৃত জীবনযুদ্ধ যেটুকু চলছে তার আঁচ এখনও সেভাবে টের পাওয়া যায় নি। অজস্র সরকারি ভাতার আড়ালে দারিদ্র্য নতুন করে জনসমক্ষে ধরা দেয় নি। কিন্তু সবচেয়ে বেশি সর্বনাশ হয়েছে যে স্বনির্ভর মধ্যবিত্তের, যারা সঞ্চিত পুঁজি ভাঙিয়ে চালিয়ে গিয়েছে এই বছরটা, যাদের জন্য সরকার কোনও ডোলের বন্দোবস্ত করে নি, যারা হা পিত্যেশ করে তাকিয়ে আছে সুদিন ফিরে আসবে বলে, তাদের জন্য কী বার্তা নিয়ে আসছে নতুন বছর? নাকি প্রকৃত বেঁচে থাকবার লড়াই আমরা দেখতে পাব নতুন বছরেই? যোগ্যতমের উদবর্তন নামের বিতর্কিত ভাবনাকে কি সত্য বলে প্রমাণ করবে একুশ সাল?

অসংখ্য অনিশ্চয়তার মধ্যে দিয়েই আমরা প্রবেশ করতে চলেছি নতুন বছরে। তার উপর একুশ সাল আবার বাংলার মসনদ দখলের গণতান্ত্রিক যুদ্ধের কাল, আনঅফিসিয়ালি যে লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যেই। লক্ষ লক্ষ অলস কর্মহীন যৌবন হয় রোয়াকে বসে তামাশা দেখছে, নয়তো কিছু প্রাপ্তির আশায় ভিড়ছে ভোট দাদাদের দলে। সরকারি কর্মকাণ্ড যা যেখানে আছে সেখানেই দাঁড়িয়ে গেছে, যা ফের চালু হতে হতে জুনের আগে কোনওভাবেই নয়। রাজনীতি-সর্বস্ব রাজ্যে রাজনৈতিক স্থিরতা না এলে সামান্য যে শতাংশ মানুষের হাতে ক্রয় ক্ষমতা আছে তারা হাত গুটিয়ে বসে থাকবে বলাই বাহুল্য। সব অনিশ্চয়তা কাটিয়ে বাজার ফের কবে গমগম করবে তা সম্ভবত একমাত্র বিধাতাই জানেন। আমরা যারা নিমিত্তমাত্র তারা কেবল কামনা বা প্রার্থনাটুকুই করতে পারি।

প্রদোষ রঞ্জন সাহা

ধারাবাহিক প্রতিবেদন। সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়

সার্জেন রেনী'র 'ডুয়ার্স যুদ্ধের ডায়েরি'

ইঙ্গ-ভুটান যুদ্ধের ঐতিহাসিক লিপি

উমেশ শর্মা

যুদ্ধ শেষে সার্জেন রেনীর ভ্রামণিক পর্যবেক্ষণ

বিগ্রেডিয়ার জেনারেল টাইটলার ৬ এপ্রিল দার্জিলিংয়ের সৈন্যদের অবস্থা ও বসবাসের ধরন পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। ৮০ নং রেজিমেন্টের আবাসনের বিষয়টি সম্পূর্ণ হয়েছে। জলাপাহাড়ের কাছাকাছি অসামরিক বাড়িগুলি খালি করে ৫ কোম্পানি এবং জলাপাহাড়ের ঢালে দুই কোম্পানিকে স্ত্রী-সন্তানসহ সেনাদের বসবাসের উপযোগী করা হয়েছে। দমদম থেকে সৈনিকদের অপেক্ষারত স্ত্রী-পুত্রদের নিয়ে আসা হয়েছে।

৮ এপ্রিল সার্জেন রেনী কলকাতার বিখ্যাত চা-কর মি. ডেভিড উইলসনের চা-বাগান দেখতে গিয়েছিলেন। ওই সুযোগ ঘটিয়ে দিয়েছিলেন চা-বাগানের ম্যানেজার মি. ক্রুসম্যান। দার্জিলিং স্টেশনের উত্তর দিকে 'উলসন বস্তি'তে গড়ে উঠেছিল ওই চা-বাগান। দার্জিলিং থেকে বাগানের দূরত্ব ৪ মাইল এবং দু' থেকে চার হাজার ফুট উচ্চতায় পাহাড়ের গায়ে ছিল বাগানটি।

ওই বাগানে ঘুরে ঘুরে তিনি চা-বীজ থেকে শুরু করে যাবতীয় বিষয় বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছিলেন। জমি, বাগান, ফ্যাক্টরি থেকে চা-তৈরির প্রস্তুতিপর্বও বাদ যায়নি।

১৫ এপ্রিল তিনি লেবং-এ ৮০ নং রেজিমেন্টের এক কর্মকর্তার সঙ্গে তাদের মেসবাড়িতে হাজির হয়েছিলেন। ওই বাড়ি থেকে নেপাল, সিকিম, ভুটান ও তিব্বতের জনপদ এবং বহু দূরে কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্বত দেখতে পেয়েছিলেন।

ওই সময়ে বহুদিন পরে আবহাওয়া ছিল মনোরম। তবে সেদিন প্রথমভাগে ছিল সামান্য কুয়াশা। ম্যালেরিয়া জাতীয় ছোটখাট এবং বর্ষাকাল আগমন পূর্ববর্তী আবহাওয়া জনিত কিছু অসুখবিসুখে ভুগছিলেন সামরিক ও অসামরিক জনসাধারণ। সিঞ্চলের সেনা ছাউনি পরিদর্শন কালেও তিনি বহু রোগী দেখতে পেয়েছিলেন।

সার্জেন রেনী আবহাওয়ার সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন রোগ প্রসঙ্গে গলগন্ড রোগের কথাও বলেছিলেন। দার্জিলিং ও সন্নিহিত এলাকায় তিনি ওই রোগের ব্যাপক প্রাদুর্ভাব দেখেছিলেন। ওই রোগ সুইজারল্যান্ডে 'গোইত্রে' নামে পরিচিত। পারদ থেকে বীন-আয়োডিনের সঙ্গে শুয়োরের চর্বি মিশিয়ে ওষুধ তৈরি করলে এ রোগের উপশম হয় বলে ধারণা। দার্জিলিংয়ে কলেরাও প্রতি বছর দেখা দিচ্ছে।

২৫ এপ্রিল রুকভিল-এ থাকার সময়ে ক্যাপ্টেন উইলকিমসন একটা বর্বর বলিপ্রথা দেখেছিলেন এবং

সার্জেন রেনীকে দেখিয়েছিলেন। সেটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ—

লেপচাদের পূজাবেদীতে আগুন জ্বালান হয়েছিল। বেদীটি পাথর দিয়ে তৈরি। অদূরে একটি ছাগল ছানাকে বেঁধে রাখা হয়েছিল। ছাগলটি মনের আনন্দে ঘাস খেয়ে চলেছে। আগুনে এমন কিছু গাঢ় বস্তু (ধুনো?) নিক্ষেপ করা হচ্ছিল যার ফলে আগুনের লেলিহান শিখা আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছিল। একজন পুরোহিত গোছের লোক মন্ত্র পড়ছিলেন এবং অগ্নিবেদীতে চাল নিক্ষেপ করছিলেন। আর একজন পুরোহিত বেদীর কাছেই বসেছিলেন। প্রথম পুরোহিত একটা ডিম ভেঙে ডিমের পীতাভ অংশ একটি পাতায় ঢেলে খুব গভীর মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। তিনি হয়ত ওর মধ্যে কোনও মর্মোদ্ধারে নিমগ্ন ছিলেন। তারপর তা অন্য পুরোহিতকে দিয়ে উনুনে রান্না করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

এরপর ছাগলছানাটিকে বেদীর কাছে নিয়ে আসা হলে পুরোহিত সেটির গলা কেটে ফেলে। ফিনকি দিয়ে রক্ত এসে পড়ে জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডে। মন্ত্রোচ্চারণ চলতেই থাকে। তারপর ডিমের কুসুমটি যেভাবে রান্না করা হয়েছিল, ওই ছাগলছানাটির (পাঁঠা?) যকৃত বের করে সেটিকেও বড় কড়াইতে রান্না করা হতে থাকে। পূজার সমাপ্তি ঘটে।

ওই পূজাস্থলে কোনও লেপচা রমণী ছিলেন না এবং ওইভাবে দেবতুষ্টিতে বাধা দেবারও কেউ ছিলেন না। ওই সময়ে সন্নিহিত এলাকায় এবং এমনকি সেনা ছাউনিতেও যেভাবে নানা অসুখবিসুখের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল, তা নিরসনের জন্যই এভাবে দৈবতুষ্টির আয়োজন করা হয়েছিল বলে জানা যায়। যদিও বাংলার সমতলের চাইতে দার্জিলিংয়ের আবহাওয়া তুলনায় ভাল ছিল, তবুও দেবতার তুষ্টির জন্য সমাজে নিষ্ঠুরতা ছিলই।

লেপচা সমাজ ও সংস্কৃতি:

সার্জেন রেনী ওই ঘটনার দু'দিন পরে দার্জিলিংয়ের চৌরাস্তায় বেশ কয়েকজন স্থানীয় অধিবাসীর জটলা দেখে সেখানে হাজির হয়েছিলেন। ওঁরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা-গল্পগুজব করছিলেন। সার্জেন রেনী ওঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে বুঝতে পেরেছিলেন যে, ওঁরা কেউ সিকিমের ধর্মা, কেউ বা নেপালের ভুটিয়া এবং কয়েকজন পাহাড়িয়া ছিলেন। দু'জন তো নিজেদের পরিচয় সঠিকভাবে দিতেও পারছিলেন না। ওঁরা বলছিলেন যে, ওঁরা 'বোট-চিনকা মল্লিক'। হিন্দুস্থানী ভাষায় কথা বলবার চেষ্টা করলেও, ওঁদের কথা থেকে সার্জেন রেনী বুঝতে পেরেছিলেন যে, ওই লোকেরা চিন বা তিব্বত থেকে আগত লোকেদের বংশধর।

ওই দলে কোনও লেপচা ছিল না। কিন্তু তিনি জানান যে, পাহাড়িয়া ও তিব্বতি অধিবাসী ছাড়া ওই জনপদে প্রায় সকলেই লেপচা বলে পরিচিত। কিন্তু রেনী সাহেব লেপচাদের চিহ্নিত করণের সঠিক কোনও মানদণ্ড উপলব্ধি করতে পারছিলেন না।

['ল্যাপ' অর্থ তিব্বতি ভাষায় কথা বলা এবং 'চে' হল নির্বোধ। সহজ সরল লেপচারা 'রং' অর্থাৎ পর্বত বেষ্টিত মানুষ। এঁরা সিকিমের আদিম অধিবাসী। হান্টারের মতে The Lepchas are considered to be aboriginal inhabitants of the hilly portion of the district. At all events, they are the first known occupiers of this tract and of Independent Sikkim. They are a fine, frank race, naturally open hearted and free handed, fond of change and given to an out-door life; but they do not seem to improve on being brought into contact with civilisation? (A Statistical Account of Bengal, Vol-1, P-47)

ড. হুকার তাঁর 'হিমালয়ান জার্নাল' এ লিখেছেন, 'The Lepcha is the aboriginal inhabitant of Sikkim and the prominent character in Darjeeling, where he undertakes all sorts of out-door employment.' (Vol-1, P-136)

এঁরা মাতৃতান্ত্রিক। মহিলারা সুন্দরী, লাবণ্যময়ী, অলংকার ও পোশাক সচেতনা। মূল পোশাক হল কোকুন থেকে প্রস্তুত 'এন্ডি'। ইন্দো-বার্মা লিপি গোষ্ঠীর অন্তর্গত এদের ভাষা। পৌরাণিক কাহিনি থেকে জানা যায় যে, তারগে, সায়ুডুন, দুরিং তংরাম ও গোলে— এই পাঁচজন পণ্ডিতের দ্বারাই লেপচা ভাষার উৎপত্তি।

বহু বিবাহ প্রথা লুপ্ত হয়ে এঁরা এক বিবাহে অভ্যস্ত। ‘পিবো’ বা পুরোহিত বিয়েতে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে থাকেন।]

কলেরা প্রাদুর্ভাব

২৯ এপ্রিল সার্জেন রেনী জানতে পেরেছিলেন যে, ডুয়ার্সের জল্পেশের সেনা ছাউনিতে বিশেষত ইউরোপীয়ান গোলন্দাজ বাহিনীতে প্রচণ্ডভাবে কলেরা দেখা দিয়েছে। ডালিমকোটের সেনাশিবির থেকে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল টাইটলার টেলিগ্রাম করে জরুরি ভিত্তিতে চিকিৎসা পরিষেবার জন্য লোক পাঠাতে বলেছেন। তিনি আরও লিখেছেন যে, অসুস্থদের যদি দার্জিলিংয়ে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, তবে ভাল হয়। পাতলাখাওয়া, বল্লা, বক্সা, ডালিমকোটেও একইভাবে কলেরা দেখা দিয়েছে। অসুস্থদের কার্শিয়াং ও পাঞ্চেম-এ স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। ‘ক্যালকাটা ইংলিশম্যান’ পত্রিকায় ১৮৬৫ সালের ৯ আগস্ট পাতলাখাওয়ার কলেরা মহামারীর বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল। ৮ অক্টোবরেও অনুরূপ সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। একই সঙ্গে স্কার্ভি রোগের বাড়বাড়ন্তের কথাও বলা হয়েছিল।

দার্জিলিংয়ে প্রাকবর্ষার বর্ষণ

মে মাসে দার্জিলিংয়ে ‘ছোটা বরষাত’ শুরু হয়ে থাকে এবং ‘বড়া বরষাত’ শুরু হয় সেপ্টেম্বর মাসে।

৪ মে দার্জিলিংয়ের বাজার এলাকায় একজন চিনা লোককে দেখতে পান সার্জেন রেনী। তাঁর পোশাকে চিনের উত্তরাংশের অধিবাসীদের ছাপ লক্ষ্য করেন তিনি। তাঁকে তার পরিচয় জিজ্ঞেস করায় লোকটি জানিয়েছিলেন— ‘চিন কা বোট’ অর্থাৎ চিনের ভোট। লোকটি তিব্বতের যে এলাকা থেকে এসেছেন, ওই স্থানের ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক অবস্থান সঠিকভাবে না জানায়, এরূপ বিপত্তি। সম্ভবত এঁরা কাম্পা জেলার লোক। কারাগোলাতেও একই রকমের ব্যবসায়ী দলকে দেখতে পেয়েছিলেন সার্জেন রেনী।

ছেবু লামার সঙ্গে সাক্ষাৎকার

৮০ নং রেজিমেন্টের কয়েকজন অফিসারের সঙ্গে সার্জেন রেনী দশদিনের ছুটি নিয়ে ডালিমকোট সফরে গিয়েছিলেন। মে মাসের গোড়ার দিকে আশপাশের পাহাড় দেখাই ছিল তাঁর মূল আকর্ষণ।

দার্জিলিং থেকে ডালিমকোটের দূরত্ব ৬০-৭০ মাইল। মি. ইডেন যে পথে গিয়েছিলেন, ওই পথ ধরে তিনি ৬ মে বেডিং ও আনুষঙ্গিক জিনিষপত্র কুলিদের পিঠে চাপিয়ে যাত্রা শুরু করেছিলেন।

যাত্রার মুহূর্তে একদা মি. ইডেনের সফরসঙ্গী ডা. সিম্পসনের কাছে তিনি জানতে পেরেছিলেন যে, পুশকে তিস্তার উপরে যে বেতের সেতুটি ছিল, তা দু’দিন আগে প্রবল জলস্রোতে ভেসে গিয়েছে। নতুন করে বাঁশের সাঁকো তৈরি না হওয়া পর্যন্ত তিস্তা নদী

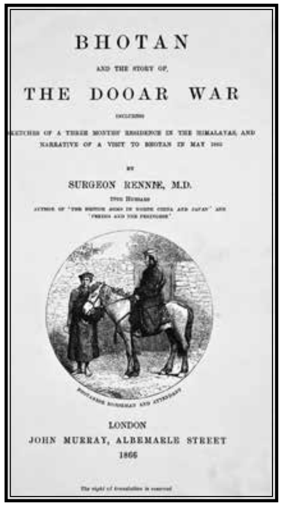
BHOTAN
AND THE STORY OF
THE DOOAR WAR
INCLUDING
SKETCHES OF A THREE MONTHS' RESIDENCE IN THE HIMALAYAS, AND NARRATIVE OF A VISIT TO BHOTAN IN MAY 1865
BY
SURGEON RENNIE, M.D.
LONDON
JOHN MURRAY, ALBEMARLE STREET
1866

পার হওয়া সম্ভব নয়। তাই ডা. সিম্পসন পরের দিন ডা. রেনীর সঙ্গে ছেবু লামার বাড়িতে গিয়ে ঘটনাটা সরেজমিনে তদন্ত করতে ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন। জনপদীয় ও প্রতিবেশী জনপদগুলি সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সংবাদ সংগ্রাহক।

৬ মে সকালে প্রচণ্ড বৃষ্টি শুরু হওয়ায় কুলিরা কেউ কেউ পালিয়ে গিয়েছিল। আবার অনেকে জানাল যে, আবহাওয়া পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত তারা যেতে ইচ্ছুক নন। দুপুরের দিকে বৃষ্টি একটু ধরে এলে সার্জেন রেনী ডা. সিম্পসনকে নিয়ে লেবংয়ের পথ ধরে ছেবু লামার বাড়িতে গিয়ে হাজির হন। ছেবু লামার

জীবনযাপন পদ্ধতি কিন্তু রাজদূতের মত নয়। ইউরোপীয় কায়দায় তাঁর একতলা বাড়িটি তৈরি হলেও যেমন নোংরা, তেমনই আসবাবশূন্য। ঘরে কয়েকটা তাক, একটি মাত্র তাকওয়ালা আলমারি, পুরনো দুটো আরামকেদারা। ব্যস, এছাড়া আসবাবপত্র নেই।

ছেবু কিন্তু উভয়কে আন্তরিকভাবে অভ্যর্থনা করে চেয়ার দুটিতে বসতে দিয়ে নিজে বিছানায় বসেছিলেন। ওই পালঙ্কটি মাটি থেকে ফুটখানেক উঁচু এবং ছেবুর পোশাকের মতই নোংরা ও তৈলাক্ত।

ছেবু লামা বুড়ো ও আপাতদৃষ্টিতে ভদ্রলোক। কিন্তু এককথায় স্নানের সঙ্গে ওই ভদ্রলোকের কোনও সম্পর্ক নেই। লোকটি দেখতে মোঙ্গলীয়ান চেহারার। তাঁর মাথার সামনের দিকটা ক্ষুর দিয়ে কামানো এবং পেছনে টিকি লম্বমান। চুল ছাঁটা। দাড়ি চৈনিক পদ্ধতিতে কামানো। তাঁর পোশাক নোংরা, তেল চিটচিটে ও দুর্গন্ধযুক্ত। হলদে সিল্ক কাপড় দিয়ে তৈরি। হাতা নেই। ভেতরেও কোনও পশমি পোশাক পরনে ছিল না। মাথায় হলদে সিল্ক কাপড়ের টুপি, শুয়োরের কানের মত দেখতে। টুপির প্রান্তদেশ মখমল কাপড়ে তৈরি। লেপচাদের পোশাকের সঙ্গে প্রচণ্ড মিল।

ছেবু লামা পুরোহিত হলেও, ব্রিটিশ রাজের কাছে একজন কূটনীতিবিদ হওয়ায়, মনে হয় বিয়েসাদিও করেছিলেন। পড়াশোনা করেছেন লাসায় এবং মাথাটা পরিষ্কার থাকায় অত্যন্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তি। ব্রিটিশ সরকারের কাছে তিনি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় লোক। তাঁকে বিশাল ভূ-সম্পত্তি অর্থাৎ একটা গোটা পাহাড় উপঢৌকন দেওয়া হয়েছিল। ওই সম্পত্তি চা-কর সাহেবদের কাছে বিক্রি করে নিজেও একটা বিশাল চা-কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি। আবার কিছু ভূ-সম্পত্তি দেশীয় প্রথা অনুসারে কিছু চাষীকে পত্তন দিয়ে কৃষিকাজের মাধ্যমে রোজগারপাতির ব্যবস্থাও করেছিলেন।

ডা. সিম্পসন তাঁকে হিন্দিভাষায় বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন যে, একদল ব্রিটিশ আধিকারিক ডালিমকোট ঘুরতে যেতে আগ্রহী। কিন্তু তিস্তার প্রবল স্রোতে সেতুটি ভেঙে যাওয়ায়, তিস্তা অতিক্রম করায় সমস্যা দেখা দিয়েছে। ওই কথা শুনে তিনি দিশি কাগজের একটা গোলাকার বান্ডিল থেকে এক দফা কাগজ বের করে সঙ্গে সঙ্গে একটা চিঠি লিখে তিস্তার ঘাটোয়ালের কাছে পুশকে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি ওই চিঠিতে তিনদিনের মধ্যে সেতুটি তৈরির নির্দেশ দিয়েছিলেন। চাঁদের হ্রাস-বৃদ্ধির দেশীয় গণনা পদ্ধতি অনুসারে তিনি গণনা করে বুঝেছিলেন যে, তিন দিনের মধ্যে আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটবে। অবশ্য সেটা প্রমাণিতও হয়েছিল। তিনি চিঠিতে তিব্বতি লেখ্য অনুসারে ডানদিক থেকে বাঁ দিকে লিখেছিলেন এবং অক্ষরবিন্যাসে তাঁর দ্রুততা দেখে সার্জেন রেনীর মনে হয়েছিল, তিনি লেখা বিষয়েও দক্ষ মানুষ।

সার্জেন রেনী ও ডা. সিম্পসন কথা প্রসঙ্গে ভুটানের যুদ্ধ মনোভাব নিয়ে দীর্ঘক্ষণ কথা বলে বুঝতে পেরেছিলেন যে, পশ্চিম ডুয়ার্সে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার দৃঢ় সংকল্প করলেও, ভুটান মনে হয় আর যুদ্ধে আগ্রহ দেখাবে না।

আলোচনা শেষে করমর্দন করে বাড়ির বাইরে এসে ছেবু লামা উভয়কে বিদায় জানিয়েছিলেন। তখনও তিনি চিন দেশীয় লোকের মত বেশ শান্ত ও ভদ্র ব্যবহার করেছিলেন। সেদিনই জলাপাহাড়ের সেনা ছাউনিতে গোলন্দাজ বাহিনীর একজন সৈনিক নিজের বুকে গুলি চালিয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন।

ডালিমকোট যাত্রা

৮ এপ্রিল ছেবু লামার চান্দ্রগণনা অনুসারে আকাশ পরিষ্কার থাকায় বিকেলের দিকে দশজন আধিকারিক কুলিদের কাঁধে মালপত্র চাপিয়ে ডালিমকোট যাত্রা শুরু করেছিলেন। প্রত্যেক কুলিকে যাত্রাসঙ্গী হবার খরচ বাবদ ৮ টাকা করে অগ্রিম দিতে হয়েছিল। কুলিদের দলপতি ছিলেন ফুল সিং এবং গেলঙ্। প্রথম জন সিকিমি এবং দ্বিতীয় জন ধর্মা ভুটিয়া। ফুল সিংয়ের ভাল নাম 'কিফ-য়্যু-গুল্লা' যার অর্থ হল হাসিখুশি পুতুল। তিনি ডালিমকোটের রাস্তা চেনেন। সেখানে ছিলেনও কিছুদিন।

সাতজন কুলির দরকার— তিনজন খাবারদাবার, রান্নার বাসনপত্র বহন করবে। বাকিরা অন্য জিনিসপত্র অর্থাৎ কাপড়-চোপড়, বিছানাপত্র বহন করবে। প্রত্যেকের কাঁধে আধমণের সমপরিমাণ বোঝা

থাকবে।

আধিকারিক দলে শেষপর্যন্ত ছিলেন মেজর মিলার, ক্যাপ্টেন সুল্লীভান, লে. হাওয়ার্ড এবং সার্জেন রেনী। ওই দলে তিনজন ভারতীয় কর্মচারীও ছিলেন— একজন মাদ্রাজি, একজন মুসলমান, একজন ভিস্তেওয়ালা এবং সঙ্গে ছিলেন দার্জিলিংয়েরই মি. টমাস ম্যাশন। লেবং-এ প্রথম রাত কাটালেন তাঁরা। সেখানে ১৭ নং দেশীয় পদাতিক বাহিনীর লে. বার্লো ও মি. ডাউসের আতিথ্যে রাতটা কেটেছিল।

রাতে বৃষ্টি হলেও সকালটা ছিল বেশ পরিষ্কার। ৬.৩০ মিনিটে যাত্রা শুরু হল। মি. ম্যাশনের ভুটানি কথ্যভাষার দখল দলকে খুব উপকৃত করেছিল। বৃষ্টিতে রাস্তাঘাট ভেঙে গেছে, রঙ্গীতের জলোচ্ছ্বাসও প্রবল। মি. হাওয়ার্ড ও মি. ম্যাশনের সাথে টাট্টু ঘোড়া ছিল। সেগুলিকে ফেরৎ পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়েছিল।

কয়েকজন দেশীয় লোক শালগাছ নদীতে ফেলে, সেগুলোকে বেঁধে কলার ভেলার মত করেছিল। ওই ভাসমান ভুরার উপরে উঠে তাঁরা তিস্তা ও রঙ্গীতের সঙ্গমস্থলে গিয়ে পৌঁছেছিলেন। তাঁরা দশটা নাগাদ যেখানে বেতের সাঁকোটি ছিল, সেখানে পৌঁছে গিয়েছিলেন। পেশকের ওই স্থানে এক ডজন লেপচা নতুন সাঁকো তৈরি করতে ভীষণ ব্যস্ত। তখনকার মত একজন একজন করে কোনও প্রকারে পার হওয়া যাবে বলে জানা গেল। সেজন্য একটা ভেলাও তাঁরা তৈরি করেছিলেন।

সার্জেন রেনী ওই ভেলা বানানোর দেশীয় কৃৎকৌশলের সুবিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। ওই ভেলাতে তিনিই প্রথম উঠেছিলেন এবং তারপর একে একে সবাই নদী পার হয়েছিলেন। কিফ্-য়্যু-গুল্লা কিন্তু মাঝিদের নির্দেশ সঠিকভাবে না মেনে চলায় জলে পড়ে গিয়েছিল। অবশ্য কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি। দক্ষ লোকটি নিজেকে বাঁচাতে পেরেছিল। দেড় ঘণ্টায় নদী পেরনোর পর্বটি সমাপ্ত হয়েছিল।

এরপর ভুটানের পাহাড়ি পথে আরোহণ করে বেলা দুটোর সময়ে সকলে শ্রান্ত ও ক্লান্ত হয়ে কালিম্পং-এ এসে হাজির হয়েছিলেন। সেখানকার কুড়ে ঘরগুলি মাটি থেকে চারফুট উঁচু খুঁটি দিয়ে তৈরি। মেঝেতে তক্তা পাতা। দেয়ালগুলি বাঁশের কাঠামোর উপর মাটি দিয়ে লেপা। খড়ের ছাউনি। ঘরে কোনও আসবাবপত্র নেই। অবশ্য ঘরের চাল থেকে তিন প্রস্থ নামানো তাক। সবচেয়ে নিচের তাকে ধূমপানের সরঞ্জাম। দ্বিতীয় তাকে শীতকালের জন্য সঞ্চিত কাঠ এবং উপরের তাকে ঘর গেরস্থালির জিনিসপত্র থাকে। ওইসব তৈজসপত্রের মধ্যে ঝুড়ি, মাটির হাড়ি ইত্যাদি প্রধান। ঘরের মাঝখানে ধুনি জ্বালিয়ে ঘর গরম রাখার ব্যবস্থা। মাটির চুল্লিতে ওই ধুনি থাকে। তিনটি পাথর বসিয়ে উনুন তৈরি করা হয়েছে। কাঠ জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এখানে পরিবারের সংখ্যা একদম কম। লোকগুলো নোংরা ও ধোঁয়ার আস্তরণে মলিন। এরা সবাই বেসরকারি লোক

ছেবু লামা পুরোহিত হলেও, ব্রিটিশ রাজের কাছে একজন কূটনীতিবিদ হওয়ায়, মনে হয় বিয়েসাদিও করেছিলেন। পড়াশোনা করেছেন লাসায় এবং মাথাটা পরিষ্কার থাকায় অত্যন্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তি। ব্রিটিশ সরকারের কাছে তিনি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় লোক। তাঁকে বিশাল ভূ-সম্পত্তি অর্থাৎ একটা গোটা পাহাড় উপঢৌকন দেওয়া হয়েছিল।

এবং আগত দলটির সঙ্গে আলাপ করতে আগ্রহী। ওই লোকেরা ডিম বা মুরগি দিতে রাজী নন, কিন্তু তাদের একটি পরিত্যক্ত ঘরকে ব্যবহারের অনুমতি দিতে দ্বিধা করেননি।

সূর্যাস্তের ঠিক আগের সময়ে গোটা আটেক গরু সারাদিন জঙ্গলে চরে ওই ক্ষুদ্র পল্লীটিতে চলে আসে। সন্ধেবেলায় শিঙে দড়ি পেঁচিয়ে একটা ছোট্ট খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখা হল। গাই গোরুকে দোয়ানো হল। গরুগুলোর স্বাস্থ্য বেশ চমৎকার।

কালিম্পং-এর পাহাড়ে ঢাল বেশ ফাঁকাই। অবশ্য কুটিরগুলোর পাশে কিছু কলাগাছ বেড়ে উঠছিল। এখানকার মাটি কালো ও দোঁয়াশ বলে বেশ উর্বর।

ছোট ছোট খেতে অল্প পরিমাণে ধান চাষ দেখা যায়। তিস্তার ওপারে যেমন আবাদি, এখানে তেমন আবাদ চোখে পড়ল না।

রাতে কুলিদের খাওয়াদাওয়ার পর ওই পল্লীর কুটিরে 'হাসিমুখ পুতুল' মদের খোঁজে হানা দিয়েছিল। অবশ্য ব্যর্থ হয়েছিল। লেপচাদের মদ্যাসক্তি মোঙ্গলীয়দের চাইতে অনেক বেশি। ওদের প্রিয় মদ মারুয়া থেকে তৈরি হয়। ওদের ভাষায় বলে চে। ভুটানিরা কিন্তু ততটা মদ্যাসক্ত নয়। ওদের প্রিয় পানীয় হল চা।

অস্বস্তিকর একটা রাত শুধু বাড়ি ঘরের চারপাশে অসংখ্য সাপখোপ, পোকামাকড় তাড়াতেই কেটে গিয়েছিল। পরদিন (১০ মে) ভোরবেলা পৌণে ছয়টা নাগাদ আবার যাত্রা শুরু হয়েছিল এবং ঢালু পথে নামতে নামতে একটা গভীর নালা বা ছোট নদী পেরিয়ে হাঁটতে শুরু করেছিলেন সবাই। তারপর কিছুদিন আগে পুড়িয়ে দেওয়া একটা জঙ্গল পেরিয়ে দুর্গম আরোহণ করতে হয়েছিল এবং পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছে গিয়েছিলেন। তখন সাতটা বাজে। ওই জায়গাটি আবার বাঁশ ঝোপে ভরা। ওই জঙ্গলে কিছু সোমরাজ, কিছু ফার্ণ জাতীয় উদ্ভিদও ছিল। বড় বড় গাছও ছিল দু'একটি। কালো দোঁয়াশ মাটি এবং ছোট ছোট ধান খেতও ছিল কিছু।

ওখানে জলজ উদ্ভিদের গায়ে অসংখ্য চিনে জোঁকের উৎপাত। সকলের পরিত্রাহী অবস্থা। অথচ সতর্কতা অবলম্বনের কোনও হদিশ জানা নেই। ওরা রক্ত চুষেই চলছে। এগুলো খুবই ছোট। ইংল্যান্ডে চিকিৎসার কাজে জোঁক ব্যবহার করা হয়। এখানে তো ওরা মোজার ভেতরে ঢুকে রক্ত চুষতে থাকে। রক্ত চুষে ওরা নিজেদের শরীর ছ'গুণ বাড়াতে পারে। টের পাওয়া যায় না।

পাহাড়ের চূড়ায় বুনো স্ট্রবেরি, লটকনা প্রচুর ফলে আছে। প্রথমটা খুব ছোট ও বিস্বাদ। পরেরটি কিন্তু সুগন্ধি ও হাল্কা পীতাভ।

বেলা বাড়লে দ্বিতীয় পাহাড়ের চূড়াটি স্পষ্ট হয়ে উঠল এবং সেখান থেকে তিব্বতের বরফ ঢাকা পাহাড়চূড়াগুলি ঝলমল করে উঠল। একটু এগিয়ে গিয়ে একটা ফাঁকা জায়গায় মারুয়ার চাষ দেখা গেল। ভুটিয়াদের ওই দানাশষ্যের ছাতু খুব প্রিয়। ওই দানাশষ্যকে পচিয়ে রোগ নিরাময়ের কাজেও লাগানো হয়। রেউচিনি গাছ ওষুধ হিসেবে এবং সবজি হিসেবেও ব্যবহার করা হয়। পর্যটকদল একটু এগিয়ে খোঁয়াড়ে আবদ্ধ একপাল গোরু দেখতে পান। অদূরে থালার মত চ্যাপ্টা একটা পাহাড়ও নজরে আসে। ওখানে ডোংগ্রা উপজাতির লোকেদের বাস।

দলটি এবারে তাসো গুমফা বৌদ্ধ মন্দিরে এসে পৌঁছায়। তখন আটটা বাজে। মন্দিরটি দোতলা। সুচারু ভাবে লেপানো দেয়ালের উপর খড়ের চাল। ঘরে দুটি ঢাউস জানলা। মন্দিরে ঢুকে তাঁরা দেখলেন যে একতলাটি ফাঁকা। সাদামাঠা কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠা যায়। সিঁড়ির রেলিং বাঁশের। ওই সময়ে উপরের একটি রান্নাঘরে ভিক্ষুণীরা রান্নাবান্নায় ব্যস্ত ছিলেন। পাশে প্রশস্ত ঘরে মূল মন্দিরটি। তিনজন লামা পুরোহিত তখন অগ্নিদেবীর সামনে বসে ছিলেন। ঘরের অপর প্রান্তে আর একটি অগ্নিবেদী। গাঢ় লাল রঙের পশমী পোশাক তাঁদের। দু'জন পুরোহিতের সামনে দুটো ঘণ্টা ছিল। একজন পুরোহিত তো এক সদ্য যুবক। ওঁরা সবাই চা পান করছিলেন। চা পানপাত্রটি কাঠের খোদাই করা বাটি। স্কটল্যান্ডের জমিদারেরা ওর চাইতে বড় বাটিতে হুইস্কি পান করে থাকেন। মন্দিরে দেওয়ালগুলি দেবদেবীর মূর্তিতে চিত্রিত। বড় বেদীর পরে ভগবান বুদ্ধদেবের বিরাট মূর্তি। মন্দিরের চূড়াটি পিকিংয়ের বৌদ্ধমঠগুলির মতই কিন্তু ছোট। বেদীর সামনে সবুজ রংয়ের ইউরোপীয়ান একটি গ্লাস ছিল। ঘরে ঝোলানো ছিল বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র। মানুষের উরুর হাড় দিয়ে তৈরি একটা রণভেরীর ফাঁপা অংশটি রুপোর পাতে ছিল মোড়া। সেখানে ঝোলান ছিল কিছু বেত। পুরোহিত নিজেকে অপরাধী মনে করলে স্বেচ্ছায় নিজের শরীরে বেত্রাঘাত করতে থাকেন। বৌদ্ধভিক্ষুরা সেখানে সেবা, দয়া, ক্ষমা, প্রেম নিবেদন ইত্যাদির মাধ্যমে বুদ্ধদেবের চরণে মানবকল্যাণে আত্মনিবেদন করে থাকেন।

রান্নাঘরে ভিক্ষুণীরা মাখন-চা করছিলেন এবং সেটাই ভুটানিদের প্রধান পানীয়। একটা বাঁশের চোঙায় চা-পাতা রেখে একটা লম্বা কাঠের সরু দণ্ড দিয়ে চা-পাতাগুলোকে প্রথমে গুঁড়ো করতে থাকেন।

গুঁড়ো হয়ে গেলে সেখানে তাজা মাখন ঢেলে দেন এবং কাঠের দণ্ডটি দিয়ে খোঁচাতে থাকেন ও চোঙাটি ঝাঁকাতে থাকেন। সম্পূর্ণ মিশে গেলে একটু নুন দিয়ে আবার খোঁচাতে থাকেন। চোঙার সরু ফুটো দিয়ে ফোটায় ফোটায় চা পড়তে থাকে। এ প্রক্রিয়ায়া তৈরি চা স্বাদে গন্ধে অপূর্ব এবং তা পান করে অতিথিরা মুগ্ধ।

দলটির মনে হচ্ছিল বিরল জনবসতির এ গ্রামটি সরকারি শোষণের শিকার। সামান্য গম চাষে উদরপূর্তি অসম্ভব মনে করে অনেকেই তিব্বতে, নেপালে কিংবা দার্জিলিঙে আশ্রয় নিয়ে বাঁচতে মরিয়া।

মঠ থেকে বেরিয়ে এসে পথে ছায়বু গোলাঙ নামে এক ভিক্ষাজীবী বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে। তিনিও ওই গুম্ফায় থাকেন। ভিক্ষুটি ভিক্ষাজীবী হলেও বেশ স্বস্তিদায়ক অবস্থায় ছিলেন বলে সকলের মনে হয়েছিল।

তাসো গুম্ফা থেকে আধ মাইল দূরে একটা ঝরনার ধারে সকলে সকালের জলখাবার খেয়েছিলেন। কিফ-য়্যু-গুল্লা ওই সাতসকালে কোনওভাবে দেশি হাড়িয়া মদ সংগ্রহ করেছিল। ওই মদ ওদের প্রিয়। আমেরিকানরা মদ তৈরিতে পারদর্শিতা না দেখালে, এভাবে দেশিয় পদ্ধতিতেই হয়ত চলত মদ্যপান। লেপচাদের 'চে'-র মতই এটি সাধারণ পানীয়। তবে তুলনায় 'চে' একটু উন্নত পানীয়।

এরপর চড়াই-উৎড়াই ভেঙে চলছিল চড়াই পর্ব। জঙ্গল ঘন নয়। কিছু উগ্র স্বভাবের গরু জঙ্গলে চরছিল। ওখান থেকে দার্জিলিংকে বেশ সুন্দর লাগছিল। দুপুর ১১টায় পাথরে গড়া একটি মন্দিরে এসেছিলেন তাঁরা। মন্দিরের গায়ে লেখা আছে 'ওঁ মণিপদ্মে হুম্'। তিব্বতেও এরূপ ঐশ্বরিক বাণী খোদাই করা মন্দির ছিল। তিব্বতি, লেপচা ও মোঙ্গলিয়ানদের মত ভুটানিরাও ওই মন্ত্রে বিশ্বাসী। কুলিরাও ওই মন্দিরের ডানদিকে ঘেঁষে যেতে যেতে ওই মন্ত্র উচ্চারণ করে চলেছিল ও ফুল-পাতা মন্দিরের গায়ে ছিটিয়ে দিচ্ছিল। ওই মন্ত্রের অর্থ হল— 'হে পদ্মস্থিত মণি, তোমাকে প্রণাম'। লেপচা ভাষায় মন্ত্রটিতে ছয়টি অক্ষরের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ছেবু লমা ভবিতব্যের ছয়টি অবস্থার কথা বলেছিলেন। প্রথম অক্ষর 'লাই' অর্থাৎ ঈশ্বরের অস্তিত্ব। দ্বিতীয় অক্ষর 'মী' অর্থাৎ মানুষের অস্তিত্ব। তৃতীয় অক্ষর 'লামাহয়ায়িন' অর্থ অপদেবতার অস্তিত্ব। ওদের সঙ্গে লড়াই করে হেরে গেলে মানুষ মারা যায়। চতুর্থ অক্ষর 'তেন্দ্রো বা দাদো' অর্থ হল পশুকুলের অবস্থান। অলস ও ধর্মে অনাসক্ত বৌদ্ধরা মৃত্যুর পর পুনরায় জন্ম গ্রহণ করেন। পঞ্চম অক্ষর 'এদাগ' অর্থে দানবদের অবস্থান এবং ষষ্ঠ অক্ষর 'ম্যালউর' অর্থ হল শান্তি।

ডা. হুকার লিখেছিলেন, 'যাঁরা এ পৃথিবীর জাতক, তাঁরা শীত, গ্রীষ্ম এবং ক্ষুধা-তৃষ্ণার অত্যাচারে নির্যাতিত। যাঁরা পুরোহিত তন্ত্রকে অবজ্ঞা করে থাকেন, তাঁদেরকে নানাবিধ অত্যাচার ভোগ করতে হয়। তাঁদের জিভ হয় লম্বা এবং লাঙলের ফলার মত চিরস্থায়ী মতকে ছিন্ন করবার চেষ্টা করে থাকেন। যদি কেউ অনবরত ওই ছয় অক্ষরযুক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করে থাকেন, তাঁরা আধ্যাতিকতার জগতে উন্নীত হন এবং নির্বাণের প্রতি প্রলুব্ধ হন এবং ভবিষ্যতের যাবতীয় আধ্যাত্মিক ভয়ভীতির আশংকামুক্ত হয়ে সম্পূর্ণভাবে অনস্তিত্বের জগতে উন্নীত হন।'

আরও ঘণ্টাখানেক এগিয়ে ওঁরা উচাকা নামে

দলটি এবারে তাসো গুমফা বৌদ্ধ মন্দিরে এসে পৌঁছায়। মন্দিরটি দোতলা। সুচারু ভাবে লেপানো দেয়ালের উপর খড়ের চাল। ঘরে দুটি ঢাউস জানলা। মন্দিরে ঢুকে তাঁরা দেখলেন যে একতলাটি ফাঁকা। তিনজন লামা পুরোহিত তখন অগ্নিদেবীর সামনে বসে ছিলেন। দু'জন পুরোহিতের সামনে দুটো ঘণ্টা ছিল। একজন পুরোহিত তো এক সদ্য যুবক। ওঁরা সবাই চা পান করছিলেন। চা পানপাত্রটি কাঠের খোদাই করা বাটি। স্কটল্যান্ডের জমিদারেরা ওর চাইতে বড় বাটিতে হুইস্কি পান করে থাকেন।

একটা জায়গায় পৌঁছেছিলেন। সেখানে ছিল মাত্র একটি বসতবাড়ি। পথে দুটো ছোট উপাসনালয় দেখা গিয়েছিল। ওই দুটি অতিক্রম করবার সময়েও কুলিরা আগের মতই মন্ত্রোচ্চারণ করেছিল। এর পরের রাস্তা ভীষণভাবে পাথুরে ও খারাপ। পাশের জঙ্গলে কেউ একটা হরিণ মেরেছিল। কাছে একটি ঝরনা। পথের দু'ধারে ঘন জঙ্গল। জোঁকের উপদ্রব আগের মতই। দুপুর একটায় দলটি একটি উপাসনাগৃহ দেখতে পেলেন।

প্রায় সাড়ে আট ঘণ্টার ক্লান্তিকর যাত্রার শেষে ওঁরা একটি মনোরম স্থানে পাহাড়ের সানুদেশে পাইয়ং-পুঙ-এ এসে পৌঁছেছিলেন। কয়েকঘর বসতি

একজন মহিলা একটা অসুস্থ শিশুর চিকিৎসা করছিলেন। আগের দিন মি. হাওয়ার্ড ও মি. ম্যাশন শিশুটির বাড়িতে গিয়ে শুনেছিলেন যে, শিশুটির উপর প্রেতাত্মা ভর করেছে। সেখানেই প্রেতসিদ্ধা ওই মহিলার ঝাড়ন-মারণ, নর্তন-কুর্দন দেখে এসেছিলেন। শিশুটিকে এনে সার্জেন রেনীকে দেখান হল। রেনীর মনে হয়েছিল, শিশুটিকে দ্রুত সারিয়ে তোলা যেতে পারে।

সেখানে। প্রথম বাড়িটি পাকাচুল এক ভুটানি ভদ্রলোকের। লোকটি বাড়ির গরুর দুধ দুইয়ে অভ্যাগত অতিথিদের সেবা করেছিলেন। সেখানে রাত কাটানোর মত কোনও ঘর না থাকায়, কয়েকশ' ফুট নিচে আর একটি বসতিতে হাজির হয়েছিল দলটি। গ্রামবাসীরা অচেনা আগন্তুকদের দেখে মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিচ্ছিলেন। শেষমেষ এক অল্পবয়স্কা ভদ্রমহিলা বিনীতিভাবেই জানালেন যে, রাতে কুলিরা তাদের শষ্যখেতের বেড়া পুড়িয়ে শীত কাটাবে, ওই ক্ষতির ভয়ে তারা থাকতে দিতে রাজী নন। আরও দু' একজনকে আশ্বস্ত করতে পারায় তাঁরা তাঁদের কাঠের বাড়িতে থাকতে দিতে রাজী হয়েছিলেন। ওই লোকেরা দলটিকে কিছু ডিম ও মাখন দিয়ে পয়সা নিতে রাজী হননি। উপহার হিসেবে প্রদান করেছিলেন।

সার্জেন রেনী দেখলেন, সন্ধেবেলা দুধেলা গাইগুলোকে দুইয়ে গোয়ালে ঢোকান হল। ইংল্যান্ডের মতই শুয়োরগুলোকে খোঁয়ারে বন্দি করা হল। গাঁওবুড়ো যেন একজন রোমান বুড়ো। তাঁর পোশাক ফরাসী বুড়ো 'গল'দের মত হাঁটু পর্যন্ত লম্বা। শক্ত জুরি দিয়ে কোমরবন্ধনি। কোমরে ঝুলছে লম্বা তরবারি। তরবারির বাটটা কিন্তু রোমানদের মত নয়। খালি পা। মাথায় পাকা চুল। চেহারা দেখে সম্ভ্রম জাগে। গাঁওবুড়োর পরিবারে ছিলেন বৃদ্ধা মা, স্ত্রী, শ্যালিকা ও তিনটি শিশু সন্তান।

রাতে খাবারদাবারের পর তাঁরা খামারবাড়িতে গিয়ে উঠলেন। মেঝেতে ভুটানি জীবনচর্যার নানা গৃহস্থালী জিনিসপত্র। ভদ্রলোকের শ্যালিকা রান্নায় ব্যস্ত। বৃদ্ধলোকটি নিজে শিশুদের যেমন করে যত্ন নিয়ে খাবার খাওয়ানো হয়, তেমনই যত্ন নিয়ে ডিনারের পর সাপারের ব্যবস্থাও করেছিলেন। তারপর শিশুদের পোশাক-পরিচ্ছদ যথাসম্ভব খুলে প্রায় খালি গা করে সবাইকে নিয়ে বাঁশের বেড়ার অন্তরালে ঘুমোতে গেলেন। ওদের বিছানাপত্র দেখবার সৌভাগ্য সার্জেন রেনীর হয়নি। সবার শোয়ার ব্যবস্থা করে, গোছগাছ শেষ করে মহিলারা অতিথিদের এক চোঙা করে হাড়িয়া দিয়ে বিদায় নিলেন। ভদ্রলোক নিজেও অতিথি আপ্যায়ণে মহিলাদের চেয়ে কমতি ছিলেন না। তিনি ভুটানের হুইস্কি বিলাতি মদের বোতলে ভরে সেটির স্বাদ গ্রহণের অনুরোধ জানালেন। স্বাদে গন্ধে অতুলনীয় ছিল না সেটি। বার্লি ও চালের গুঁড়ো দিয়ে তৈরি ওই 'চোঙ' মদ।

মারুয়া থেকে হাড়িয়া বানাতে প্রথমে মারুয়াকে ছাম-গাইনে কোটা হয়। তারপর জলে ভিজিয়ে ওই চাল ঝুরিতে ঢাকা দিয়ে রাখা হয় তিনদিন। এরই মধ্যে সেগুলি গেঁজিয়ে ওঠে। তারপর সেখানে পরিমাণ মত জল দিয়ে হাড়িতে রাখা হয় বলে 'হাড়িয়া' নাম। শস্তা মদ। মারুয়ার বর্জ্য পদার্থগুলো শুয়োরের খাদ্য। জনার বা বাজরা থেকে একই পদ্ধতিতে লেপচাদের 'চে' মদ তৈরি হয়। ভুটানিরা সেটিকে বলে 'বেন চোঙ' বা

মধুমাখা মদ।

এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে ভুটানে প্রচুর পরিমাণে মধু পাওয়া যায়। পথের ধারে প্রচুর মৌচাক দেখেছিলেন দলটি। ইংল্যান্ডেও অবশ্য এমন মৌচাক দেখা যায়। ভুটানিরা বাঁশের চোঙায় মধু সংগ্রহ করে থাকেন। ওই মধুর স্বাদ দারুণ। দার্জিলিংয়ের পথেঘাটে খাঁটি মধু বিক্রি হতে দেখা যায় কখনোসখনো।

মেঝের যে অংশে অগ্নিকুন্ড থাকে, কুলিরা তেমন অগ্নিকুন্ড রচনা করে নিজেদের রান্নাবান্না করতে থাকে। ভাত রাঁধে। মারুয়ার হাড়িয়া খেয়ে মাতাল হয়ে ওঠে 'হাসিমাখা পুতুল'।

প্রেতসিদ্ধা ডাইনি

১১ মার্চ ভোর পাঁচটায় রওনা দিয়ে সার্জেন রেনী অদূরে একটা বাড়ির সামনে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছিলেন। সেখানে একজন মহিলা একটা অসুস্থ শিশুর চিকিৎসা করছিলেন। আগের দিন মি. হাওয়ার্ড ও মি. ম্যাশন শিশুটির বাড়িতে গিয়ে শুনেছিলেন যে, শিশুটির উপর প্রেতাত্মা ভর করেছে। সেখানেই প্রেতসিদ্ধা ওই মহিলার ঝাড়ন-মারণ, নর্তন-কুর্দন দেখে এসেছিলেন।

ওই শিশুটিকে এনে সার্জেন রেনীকে দেখান হল। রেনীর মনে হয়েছিল, শিশুটিকে দ্রুত সারিয়ে তোলা যেতে পারে। সে মারাত্মকভাবে অসুস্থ ছিল না। তাই হয়ত ওই ধরনের চিকিৎসায় সুফল হতেও পারত। ওই ডাইনি চিকিৎসক তখনও ছিলেন। হিংস্র জিপসীদের মত দেখতে ওই মহিলার সঙ্গে স্থানীয় মহিলাদের কোনও তুলনাই চলে না।

পাইয়ং পুঙ্ থেকে ঘণ্টাখানেকের পথ অতিক্রম করে তাঁরা এসে পৌঁছেছিলেন রিনচিঙ সুঙ্ নামে এক বৌদ্ধ মঠে। গাছপালায় ঢাকা ওই মঠ। বহু দূর থেকে বড় বড় গাছের উপর থেকে টাঙানো পতাকা দেখে সেটি চেনা যাচ্ছিল। পাহাড়ে ওঠার পথও বেশ কষ্টকর। পাহাড়ি ঝরনার পথ বেয়ে ওঠা কিছুটা সহজ। আধ মাইল দূরে ধুমসুঙ যাবার পথ পাওয়া যাবে বলে জানা গেল। ওই পাহাড় থেকেও তুষারশৃঙ্গ দেখা যায়। এ পাহাড়ে ১২ ফুট চওড়া একটা চাতাল এবং লম্বভাবে গিরিসংকটে সেটির অবস্থান। চারদিকে দেয়ালের মত ঢাল। বাঁ দিকে তাকালে ধুমসুঙ চোখে পড়ে।

এবারের যাত্রাপথ কখনও চড়াই আবার কখনও উৎরাই। রাত ন'টা নাগাদ দলটি মিরিয়াম-এ এসে পৌঁছায়। খাড়াই আরোহণে সবাই ক্লান্ত। তাই সেখানে রাত্রিবাসের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কুলিরা ধূমপান সেরে, ছাতু খেয়ে কিছুটা তাজা হয়ে ওঠে। ওরা আগুন জ্বালানোর জন্য চকমকি পাথর ও লোহার টুকরো সঙ্গে এনেছিল। শুকনো লতাপাতা জোগার করে আগুন জ্বালিয়ে ছেড়া কাপড় বা শুকনো কাঠি দিয়ে আগুন হস্তান্তরিত করছিল।

অম্বইকের গ্রাম

ওই পাহাড়ের পাদদেশে একটি বসতি ছিল। গ্রামবাসীরা জানালেন যে ওখান থেকে ডালিমকোট ১২ মাইল দূরে অবস্থিত। গ্রামের কিছু লোকের পোশাক বাদামি রঙের, তবে পশমি। আবার কিছু লোকের পোশাক লেপচাদের মত ডোরাকাটা। সেখানে আধঘণ্টার মত থেকে অমসৃণ পথে উপরে উঠতে লাগলেন সবাই। পথে দু'জন লোকের সাথে দেখা। একজন নিয়মিতভাবে দার্জিলিঙে যাতায়াত করে থাকেন। মি. ম্যাশনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। তিনি ভুটানি ভাষায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আপনার শরীর ভাল আছে তো?'

লাভা

ন'টার সময় দেখা গেল চলবার পথটি বৃষ্টির কারণে বেশ কর্দমাক্ত। কিছুক্ষণ পরে সবাই ৬,৯২২ ফুট উচ্চতায় লাভাতে এসে পৌঁছেছিলেন। তারপর ঢালু পথে নিচে নামা। পথ খুব পিচ্ছিল। ঘণ্টাখানেক পরে জঙ্গলে ঘেরা এক ফাঁকা প্রান্তরে এসে তাঁরা হাজির হয়েছিলেন। স্থানীয় লোকেরা জানান যে, স্থানটির নাম চুঙভাসা গা। সেখানে একটি মাটির বাড়ি ছিল। ওই বাড়িতে পর্যটকেরা সাময়িকভাবে বিশ্রাম নিয়ে থাকেন। ওখানে ইংল্যান্ডের গরুর মত ৫০টি গরুকে মাঠে ঘাস খেতে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন সার্জেন রেনী।

সকালে আবহাওয়া ভালই ছিল। অম্বইকের কাছাকাছি আসতে আকাশ মেঘে ঢেকে গেল। মেঘ ডাকতে শুরু করল। কিছুক্ষণের মধ্যে চারদিক কালো হয়ে মুষলধারে বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। ওই বৃষ্টির মধ্যে দলটি অম্বইক পৌঁছে গেল। প্রবল বর্ষণে

জলস্রোতের আকার নদীর রূপ ধারণ করল। প্রায় পৌণে এক ঘণ্টা বহু কষ্ট করে অতিক্রম করার পর সূর্যের আলো দেখা গেল। এক জঙ্গলি উপত্যকা পেরিয়ে চোখের সামনে জেগে উঠল অম্বইক। পাহাড়ের বিপরীত দিকে হাজার ফুট উচ্চতায় সেটির নিচে কিছু বাড়িঘর চোখে পড়ছিল। ওই স্থানটিই হল ডালিমকোট। ডালিমকোট তখনও ঘন জঙ্গলে ঢাকা এবং তারপর আদিগন্ত সমতলভূমিকে সমুদ্রের মত মনে হচ্ছিল। ওটা ডুয়ার্সের সমতলভূমি।

ডালিমকোট

সামান্য বিশ্রাম করে দুটো নাগাদ আবার যাত্রা শুরু হল। আবার ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে রাস্তা। অবতরণের রাস্তাও অমসৃণ। চারদিকে নীরব স্তব্ধতা। আকাশ আবার মেঘাচ্ছন্ন। পথে একটি বিষধর সাপ নজরে পড়ায় সেটিকে পিটিয়ে মারা হল। অম্বইক থেকে তিনজন লামা পুরোহিত ওই পথে আসছিলেন। একজন কুলির পিঠে বাঁশের একটি চেয়ারে অল্পবয়স্ক এক অসুস্থ যুবক। ম্যালেরিয়ায় ভুগে শেষ পর্যায়ে এসেছে। লামারা তাকে বায়ু পরিবর্তনের জন্য উঁচু পাহাড়ি কোনও স্থানে নিয়ে যাচ্ছিলেন।

আর একটু এগতেই পুনরায় ডালিমকোট দুর্গটি দেখা গেল। এবার সেটিকে লম্বভাবে মাথার উপরে অবস্থিত বলে মনে হতে লাগল।

চারটে বাজার কয়েক মিনিট আগে দলটি পাহাড়ের বুক থেকে বেরিয়ে আসা একটি ঝরনার সামনে এসে হাজির হয়েছিল। সেখানে আধ ঘণ্টা বিশ্রাম নিয়ে পিছিয়ে পড়া কুলিদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন সবাই। নদীতে স্নান করতে গিয়েও বিপত্তি— জলস্রোতে প্রচুর জোঁক। নদী স্রোতও তীব্র ওই নদী বড় বড় পাথরে ভর্তি— কোনওটার আকার প্রচণ্ডতম। অতবড় প্রস্তরখণ্ড নদীবক্ষে সার্জেন রেনী আর কোথাও দেখেননি বলে জানান।

চেল নদীর পার থেকে আঁকাবাঁকা অমসৃণ পথ বেয়ে উপরে উঠতে উঠতে অম্বইক উপত্যকায় পৌঁছেছিলেন। সেখানকার গ্রামটি সমুদ্রতল থেকে ২,৯২২ ফুট উঁচুতে অবস্থিত ছিল। বাঁশ, খুঁটি ও মাটি দিয়ে লেপা ঘর ছিল মাত্র কয়েকটা। নদীতটের শুকনো পাথুরে মাটি দিয়ে ঘরগুলি তৈরি করা হয়েছিল। গ্রামের কাছাকাছি একটি বড় ঘরে কয়েকটি সরকারি হাতিকে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

বেশ কয়েকজন স্থানীয় লোক ওই দলটিকে দেখে এসে সমবেত হয়েছিলেন। কুলিদের সঙ্গে আলাপ জমিয়েছিলেন তারা। মহিলারা লাজুকভাবে সেখানে ছিলেন। ওই মহিলারা দার্জিলিঙের লেপচা মহিলাদের মতই দেখতে।

অম্বইক থেকে ডালিমকোটের দৃশ্যটি অত্যন্ত মনোরম। তাই বলে, ডালিমকোটের দুর্গটি কিন্তু অত সন্দুর ছিল না। পাঁচটা বেজে পঁচিশ মিনিটে পাহাড়ে উঠতে শুরু করে মিনিট পনেরো পরে একটা সমতল ভূমিতে এসে পৌঁছেছিলেন ওঁরা। রাস্তাটিও ছিল বেশ চওড়া। দুর্গের চারপাশে ঘিরে থাকা রাস্তাটি দিয়ে ওই স্থানের বিপরীত দিকে ডালিমকোটে প্রবেশের দরজা। এক সুশীতল, ক্লান্তি বিনাশী দখিনা পবনে সতেজ হয়ে উঠলেন সবাই। পাহাড় পৃষ্ঠের ওই উচ্চভূমি থেকে কামানের গোলা ছোড়া হয় এবং সংলগ্ন সমতলভূমিতে দুটি ঢিপির উপর ক্রুশ চিহ্ন দেখে কবর মনে হল। গত ৬ ডিসেম্বরে গোলাবর্ষণে যে তিনজন আধিকারিক ও চারজন সৈনিক নিহত হয়েছিলেন সম্ভবত তাঁদেরকে ওখানে সমাধিস্থ করা হয়েছিল।

দুর্গের যেদিক থেকে অম্বইককে সুচারু ভাবে দেখা যাচ্ছিল, তার বিপরীত দিকের প্রবেশদ্বার দিয়ে রেনীর দলটি ডালিমকোট দুর্গে প্রবেশ করেছিলেন। সরকারের পাঠানো সংগৃহীত কিছু প্রতিরক্ষা সামগ্রী দুর্গের দেওয়ালে ঝোলান ছিল। আধিকারিকেরা ওইসব দেখে নিজেদের হাসি চাপতে পারছিলেন না। কারণ, ভুটানি ওইসব সরঞ্জাম ব্রিটিশ বাহিনীর কাছে জঞ্জাল ছাড়া আর কিছু নয়। সেগুলো ছিল মাস্কেট বন্দুক। ওই বন্দুক কাঁধে ঠেকিয়ে গুলি করা হয়ে থাকে। আর ছিল সামনের দিকে নিক্ষেপ করার মত কিছু ছোট গোলা।

ওই দুর্গেই সেদিন রাত কাটানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ওই সময়ে দুর্গের ভেতরে এক ডিভিশন আমস্ট্রং মাউন্টেন ট্রেইন ব্যাটারি এবং এক ডিভিশন ২৫ নং ব্রিগেডের ব্রিটিশ গোলন্দাজ বাহিনীর ৬ নং ব্যাটারি, ৩১ নং পাঞ্জাব পদাতিক বাহিনী ও এক কোম্পানি সেবুন্দি, অর্থাৎ নির্মাণ কর্মী ছিলেন।

ডালিমকোট দুর্গের নির্মাণ কৌশল অন্যান্য দুর্গ অপেক্ষা নিঃসন্দেহে পৃথক। এটি একটি শক্তিশালী দুর্গ। এটির আকার ও গঠনকর্ম কোনও নিয়ম মেনে হয়নি। এর ছাদ থেকে বেরিয়ে ওঠা চূড়া সমতল ও সাধারণ মোটা দেয়াল দিয়ে ঘেরা। কোনও বরম লোহার সর্দর অর্থাৎ লিন্টেন না দিয়ে পাথর দিয়ে গাঁথা হয়েছে দেয়াল। এরকম পাকা বাড়ি অবশ্য সেখানে আরও ছিল। বিশেষত জুঙপেনের বাড়িটি, একটি বৌদ্ধ মঠ এবং একটি গোলাঘর ওভাবেই তৈরি করা হয়েছিল। দুর্গ দখলের সময়ে সেগুলি গোলাবর্ষণের ফলে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। টিকে আছে শুধুমাত্র দুর্গটি। আনুমানিক ৭৬,০০০ ফুট পরিসরে দুর্গটি শক্ত দেয়াল দিয়ে ঘেরা। দুর্গের ভেতরে আরও যে সব পাকা বাড়িঘর ছিল, সেগুলো সেনাদের বাসস্থান হিসেবে ব্যবহৃত হত এবং এখনও হতে দেখেছেন সার্জেন রেনী।

সাধারণ সেনারা অবশ্য মাটির ঘরেই থাকতেন বলে জানা গিয়েছিল। মাটির দেয়াল, বাঁশের খুঁটি, খড়ের ছাউনি ছিল সে সব। ভুটানিদের বাড়িঘরও তেমনই। দুর্গের কয়েকশ' ফুট দূরে ছিলেন ডালিম মউ। ক্যাপ্টেন ল্যান্স ছিলেন ডেপুটি কমিশনার। তিনি বসবাসের জন্য ওই মাটির বাড়ি তৈরি করেছিলেন।

গোটা ডালিমকোট সহ পশ্চিম ডুয়ার্সের সাব ডিভিশন জুড়ে ক্যাপ্টেন ল্যান্সের ছিল বিস্তৃত এলাকা। তিনি ওই এলাকায় জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন, এলাকার প্রধান কার্যালয় কিন্তু ডালিমকোট। খুনখারাপির মত ফৌজদারি অপরাধীদের তিনি যেমন দণ্ডবিধান করে থাকেন, তেমনই দেওয়ানি মামলারও তিনি বিচারক। তাঁর বিচারে দণ্ডিত ব্যক্তিরা দার্জিলিং কারাগারে দণ্ডভোগ করতে থাকে। যারা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপিল করতে চান, তাদেরকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পলিটিক্যাল এজেন্ট কর্ণেল হটনের কাছে আপিল করতে হত।

ডুয়ার্সের রাজস্ব আদায়ের পদ্ধতি ভুটানের রাজস্ব আদায় পদ্ধতি মেনেই হয়ে থাকে। ওই পদ্ধতির প্রশংসা করেছিলেন মি. ইডেন। রাজস্ব আদায় করে তা সরকারি ট্রেজারিতে জমা করতে হত। ওই সময়ে এরূপ সরকারি ট্রেজারি ছিল ময়নাগুড়িতে। ব্রিটিশ সরকারের ডুয়ার্সের প্রশাসনিক কেন্দ্রই হল ময়নাগুড়ি। জলপাইগুড়িতে ছিল ব্রিটিশ সেনাদের ক্যান্টনমেন্ট এবং অনুরূপ একটি ছোট সেনাশিবির ছিল জল্পেশে।

দুর্গের ভেতরকার কয়েকটি জিনিস ভ্রমণার্থীদের নজর কেড়েছিল। সে সবের মধ্যে একটি হল ভুটানি সেনাদের পাথর ছোড়ার কাজে ব্যবহৃত নিদর্শন এবং কয়েকটি দেশীয় তীরধনুক। চিনের সেনাদের মতই এঁরা ছিলেন পাথর ছুড়ে শত্রুকে ঘায়েল করতে ওস্তাদ। তীরধনুকগুলি ঢাকা দেওয়া ছিল একটা ঢাকনি দিয়ে এবং ঢাকনির উপরে নরম পেটি দিয়ে চাপা দেওয়া ছিল। ভুটানের তরবারিগুলি শিল্পকলার এক অপূর্ব নিদর্শন বটে। সাধারণ তরবারি ছ' ফুট লম্বা, ভারি এবং একদম সোজা। তরবাড়িটির ধারালো অংশ সোয়া ইঞ্চির মত চওড়া। এক ধরনের সবুজ পদার্থ দিয়ে সেটির হাতল তৈরি করা হয়। বলা হয়ে থাকে তিব্বতি বেজির চামড়া সেটি। ওখানে ব্যবহারের অযোগ্য কয়েকটি দেশীয় বন্দুক পড়ে ছিল। দুর্গ দখলের সময়ে একটি মাত্র বন্দুক পাওয়া গিয়েছিল। অবশ্য অম্বইকের উপত্যকায় লুকিয়ে রাখা আর একটি আধুনিক ও উন্নতমানের বন্দুকও পাওয়া গিয়েছিল। গত ডিসেম্বরে ব্রিটিশ সেনা ওই দুর্গে অভিযান চালালে

দুর্গের যেদিক থেকে অম্বইককে সুচারু ভাবে দেখা যাচ্ছিল, তার বিপরীত দিকের প্রবেশদ্বার দিয়ে রেনীর দলটি ডালিমকোট দুর্গে প্রবেশ করেছিলেন। সরকারের পাঠানো সংগৃহীত কিছু প্রতিরক্ষা সামগ্রী দুর্গের দেওয়ালে ঝোলান ছিল। আধিকারিকেরা ওইসব দেখে নিজেদের হাসি চাপতে পারছিলেন না। কারণ, ভুটানি ওইসব সরঞ্জাম ব্রিটিশ বাহিনীর কাছে জঞ্জাল ছাড়া আর কিছু নয়। সেগুলো ছিল মাস্কেট বন্দুক।

ওইসব জিনিসপত্র উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছিল। ওই জঞ্জালের স্তূপ থেকে সার্জেন রেনী ৫-৬ ফুট লম্বা রণভেরী আবিষ্কার করেছিলেন। চিনের প্রাচীর ঘেরা এলাকায় সন্ধ্যায় প্রাচীরের দরজা বন্ধ করবার সতর্কবাণী হিসেবে ওই রণভেরী বাজান হত।

সার্জেন রেনী ওই স্তূপের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে অজগরের চামড়া দেখতে পেয়েছিলেন। দু' একদিন আগে দুর্গের আশপাশের লোকেরা সাপগুলোকে মেরেছিল। চামড়াগুলি কোনও কোনওটি ১৫ ফুটের মত লম্বা এবং পরিধি এক ফুটেরও বেশি। দার্জিলিঙের সরকারি প্রশাসনিক ভবনের সন্নিহিত অঞ্চলেও সার্জেন রেনী প্রচুর বিচিত্র সরীসৃপ দেখেছিলেন। বিশেষত বার্চ হিল এলাকায় এদের বেশি দেখা যায়। ডালিমকোটের বনাঞ্চলে হিংস্র প্রাণীর ও হাতির সংখ্যাধিক্য লক্ষ্য করা যায়। রয়্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের লে. আর্মস্ট্রং দুর্গের জঙ্গলে যখন ঘুরছিলেন, তখন তিনি একটি বাঘের মুখোমুখি হয়েছিলেন। বাঘটি তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিল এবং তারপর পালিয়ে গিয়েছিল। সাধারণভাবে বলা যায় যে, বাঘেরা ক্ষুধার্ত বা আক্রান্ত না হলে সহজে কাউকে আক্রমণ করে না।

ডালিমকোট দুর্গটিকে সার্জেন রেনী 'ভৌগোলিক কবিতা' বলে অনন্যতা প্রদান করেছিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই বলেছেন যে, পার্বত্য অঞ্চলে ব্রিটিশ সরকারের এ রূপ দুর্গ গড়ে তোলা উচিত নয়। মি. ইডেন যেভাবে সমতল অপেক্ষা পার্বত্য সেনানিবাসকে গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন, সে ধারণা সঠিক নয় বলেই তিনি মনে করেন। ভারতের উত্তর সীমান্তে পেশোয়ারে সামরিক কর্তাদের মতানুযায়ী দেখা দিয়েছে বলে সার্জেন রেনীর ধারণা। তাই স্যার অ্যাসলে ইডেনের মত বা সুপারিশ অনুযায়ী পার্বত্য অঞ্চলে কিন্তু আর নতুন কোনও দুর্গ বা সেনানিবাস গড়া উচিত নয় বলেই তিনি মনে করেন।

ডালিমকোট পৌঁছানোর সাথে সাথে সার্জেন রেনীর পথশ্রমের ক্লান্তি দূর হয়ে গিয়েছিল। গায়ের ব্যথাও উধাও হয়ে গিয়েছিল। এর কারণ হিসেবে তিনি বলেছিলেন যে, পথে যেভাবে চিনে জোঁকগুলি তাঁর মোজার মধ্যে অনায়াসে ঢুকে রক্ত মোক্ষণ করেছিল—লাভা কিংবা অম্বইকের ওই জোঁকগুলি শরীরটিকে সতেজ করতে সাহায্য করেছিল। এটা যেন প্রকৃতিরই একটি অবদান। পথের পথিকের ক্লান্তি দূর করতে রক্ত শোষণের ব্যবস্থা জড় প্রকৃতির আনন্দধারা। ভবিষ্যতে যাত্রাপথে তিনি আর কোনওদিন রক্তমোক্ষণের ভয়ে ভীত হবেন না।

অষ্টম অধ্যায়

৩০ নং পাঞ্জাব পদাতিক বাহিনীর ক্যাপ্টেন হাক্সাম ডালিমকোটে থাকাকালীন সার্জেন রেনী ডালিমকোটে এসেছিলেন। ক্যাপ্টেন সাহেবকে ডালিমকোট থেকে জল্পেশের সেনা ছাউনিতে বদলি করা হয়েছে। তিনি জল্পেশে যাবেন। ওই খবর পেয়ে সার্জেন রেনী তাঁর যাত্রাসঙ্গী হতে চেয়েছিলেন এবং ক্যাপ্টেন হাক্সামের বদান্যতায় ওই সুযোগ পেয়েও গিয়েছিলেন। এতে সার্জেন রেনীর সুবিধে হবে যে ডুয়ার্সের তরাই ভূমি দেখা হবে, একই সঙ্গে দেখা হবে ময়নাগুড়ি ও জল্পেশও। ডুয়ার্স দর্শনের এ সুযোগ তিনি হাতছাড়া করেননি। তবে, যে পথে তিনি দার্জিলিং থেকে ডালিমকোটে এসেছিলেন এবং ফিরে যেতে পূর্বে মনস্থ করেছিলেন, ওই পথ ধরে আর দার্জিলিং ফেরা হবে না।

১২ মে বিকেলবেলা ক্যাপ্টেন হাক্সাম এবং সহকারী সার্জেনের কর্মীদল নিয়ে তিনি যাত্রা শুরু করেছিলেন। সবার মালপত্র হাতির পিঠে চাপিয়ে আগেই রওনা করে দেওয়া হয়েছিল। দশ মিনিটের মধ্যেই তিনি অম্বইকে পৌঁছাতে পেরেছিলেন। ঢালু পথে নামায় ঘণ্টায় চার মাইল অতিক্রম করা যায়। অম্বইকে তাদের জন্য হাওদা দেওয়া আর একটি হাতি অপেক্ষা করছিল। ওই হাতিই হবে এবার সফরের বাহক।

বিকেল আড়াইটার সময়ে অম্বইক ছেড়ে তাঁরা দক্ষিণ অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন। দু' একটা সমস্যা ছাড়া পাহাড় থেকে নামা খুব কঠিন নয়। খুব সম্ভবত চেল নদীতে পতিত কয়েকটি ঝোরা পেরিয়ে সাড়ে চারটার সময়ে তাঁরা এসে পৌঁছেছিলেন চেল নদীর তীরে। হাতির পিঠে চেল নদী অতিক্রম করে পাহাড়কে বিদায় জানিয়ে তাঁরা উপস্থিত হলেন সমতলে।

তরাইয়ের এই সমতলভূমি অত্যন্ত মনোরম। এরপরে গভীর জঙ্গল। প্রায় সোয়া ঘণ্টা ধরে হাতির পিঠে অরণ্যপথ অতিক্রম করে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন বাল্লাবাড়িতে। এটি মেচ অধ্যুষিত একটি গ্রাম। ডালিমকোট থেকে সরকারি আধিকারিকদের যাতায়াতের পথে বিশ্রামের জন্য সেখানে সরকার সম্প্রতি একটি বিশ্রামাগার তৈরি করে দিয়েছে। সেটি অবশ্য মাটির বাড়ি। কাছেই হাতিশালার জন্য নির্মিত হয়েছে একটি ছাউনি ঘর।

বাল্লাবাড়ি

বাল্লাবাড়ির কাছাকাছি জলাভূমি নেই তেমন। কিন্তু ভিজে স্যাঁতসেঁতে জায়গা। তবে এটি ম্যালেরিয়াপ্রবণ এলাকা। এখানকার গাছপালার উচ্চতা বেশি নয়। তবে ঘাসগুলো বেশ বড়সড়। ঝোপে ঝাড়ে পরিপূর্ণ এলাকাটি। এই ধরনের জঙ্গলে যে ভাবে ম্যালেরিয়া ছড়ায়, তা দেশীয় ও ইউরোপীয় ওই দলটির প্রায় প্রত্যেকে কিছুটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ক্যাপ্টেন হাক্সলিই তার বড় প্রমাণ। কারণ, ওখানে পৌঁছাতে না পৌঁছাতেই তাঁর জ্বর এসেছিল।

বাল্লাবাড়ির কয়েকটি মেচি পরিবারের কথা উল্লেখ করেছিলেন সার্জেন রেনী। মেচি, মেচিয়া ও মেচ সমার্থক হলেও, সার্জেন রেনী কিন্তু তাঁদের পৃথক সম্প্রদায় বলে উল্লেখ করেছিলেন। ওই ম্যালেরিয়া অধ্যুষিত স্থানে তাঁদের স্বাস্থ্য কিন্তু চমৎকার। যেখানে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষেরা, কালো বা ফর্সা যাই হোক না কেন, ওই রোগে আক্রান্ত হন ও পরিণতিতে মৃত্যু ঘটে। এই সম্প্রদায় কিন্তু রোগাক্রান্ত হলে ওই স্থানের বসতি ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যান।

স্বাস্থ্যকর স্থানে যাবার ওই সহজাত শিক্ষায় অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন তিনি। ওঁদের চেহারায় মালয় দেশীয়দের চেহারার ছাপ স্পষ্ট। কেউ কেউ তাদেরকে মোঙ্গলীয়ান বলে মনে করলেও, তাঁরা তা নন। সার্জেন রেনীর কাছে বরঞ্চ তাঁদেরকে বাঙালি বলে মনে হয়েছিল।

ম্যালেরিয়া সম্পর্কিত অন্যান্য রোগের ইতিহাসের ক্ষেত্রেও ঘটনা প্রায় একই রকমের। গোটা পূর্বাঞ্চলে এ দৃশ্য দেখা যায়। এ সম্পর্কিত বিভ্রান্তির কথা সাধারণভাবে বলাও হয়ে থাকে যে, দার্জিলিং থেকে ম্যালেরিয়ার উৎসগুলিকে নির্মূল করা হয়েছে কিন্তু রোগটি নির্মূল করা যায়নি। মেচদের (মেচি?) ক্ষেত্রে এটা প্রশ্নাতীত ঘটনা যে, গাছপালা কিংবা আদিম অরণ্যে তাঁরা স্বাস্থ্যবান ও সুঠামদেহী থাকেন। কিন্তু যখনই তাঁদেরকে সেখান থেকে সরিয়ে অরণ্যের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়, তাঁরা অসুস্থ হয়ে পড়েন। সমতলবাসীদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। জঙ্গলে তাঁরাও অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাই দ্রুত সিদ্ধান্তে আসাটা অবিধেয়।

সার্জেন রেনী জানান যে, তাঁদের তো

বাল্লাবাড়ির কয়েকটি মেচি পরিবারের কথা উল্লেখ করেছিলেন সার্জেন রেনী। মেচি, মেচিয়া ও মেচ সমার্থক হলেও, সার্জেন রেনী কিন্তু তাঁদের পৃথক সম্প্রদায় বলে উল্লেখ করেছিলেন। ওই ম্যালেরিয়া অধ্যুষিত স্থানে তাঁদের স্বাস্থ্য কিন্তু চমৎকার। যেখানে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষেরা, কালো বা ফর্সা যাই হোক না কেন, ওই রোগে আক্রান্ত হন ও পরিণতিতে মৃত্যু ঘটে। এই সম্প্রদায় কিন্তু রোগাক্রান্ত হলে ওই স্থানের বসতি ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যান।

চিকিৎসাবিদ্যার তত্ত্বকথার সঙ্গে দীর্ঘদিনের সুনিবিড় বন্ধন গড়ে উঠেছে। এমনকি ম্যালেরিয়া সম্পর্কেও তিনি বহু ব্যঙ্গাত্মক ব্যাখ্যাও তিনি পড়েছেন। বলা হয়ে থাকে, স্যাঁতসেঁতে মাটি থেকে পীড়াদায়ক শ্বাসগ্রহণের ফলে কিংবা গাছপালার পচা পাতা ইত্যাদির মাধ্যমে দূষিত গ্যাস দ্বারাও রক্ত দূষিত হয়ে ম্যালেরিয়া হতে পারে। মশক বাহিত হতে পারে। কিন্তু তিনি দৃঢ়ভাবে বলেন যে, তিনি বিভিন্ন পরিবেশে, নানারকম আবহাওয়ায় বহু ম্যালেরিয়া রোগী দেখেছেন। তাই কোনও একটি বিষয়ের সঙ্গে যোগ করে কোনও

উপলব্ধ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ঠিক নয়। এ বিষয়ে সবাই যে অন্ধকারে, সেকথাও জানান তিনি। তবে, পরিবেশগত বিষ শরীরের রক্ত সঞ্চালনের ফলে মানুষকে অসুস্থ করে তোলে, জ্বর-সর্দি-মাথাব্যথা, শরীর ব্যথার কারণ হয়ে বিভিন্ন উপসর্গ সৃষ্টি করে বলে বিশেষজ্ঞরা দাবি করে থাকেন।

সার্জেন রেনী তাঁর 'দ্য ব্রিটিশ আর্মস ইন নর্থ চায়না অ্যান্ড জাপান' গ্রন্থে উক্ত মতের সমর্থনে লিখেছিলেন, 'ব্রিটিশ নৌবাহিনীর একটি জাহাজে আমি সাংহাই থেকে পেইহো যাচ্ছিলাম। ১৮৬০ সালের ২২ অক্টোবরে জানা গেল যে, চার দিন আগে যে ২৬০ জন নৌসেনা ওই জাহাজে উঠেছিলেন, তাদের মধ্যে ৩০ জন ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়েছেন। জাহাজের মেডিক্যাল অফিসার আমাকে জানিয়েছিলেন যে, জাহাজে উঠবার সময়ে তারা যতটা অসুস্থ ছিলেন, চার দিন ধরে হাওয়া পরিবর্তেনর পরও তারা তার চাইতে বেশি অসুস্থ।'

সুতরাং মেয়াদি জ্বরের বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় না। তিনি বার্মা থেকে প্রকাশিত মি. গঘারের প্রকাশিত সাম্প্রতিককালের একটি রিপোর্ট উল্লেখ করেও তাঁর সিদ্ধান্তের যথার্থতা প্রমাণের চেষ্টা করেছিলেন।

বাল্লাবাড়ির মশা দেখে তো সার্জেন রেনীর পিলে চমকাবার দশা। বড় বড় ওই পেটনাদুরে রক্তচোষা মশাগুলি বিশেষত রাতের বেলা এমন তেড়ে আসে যে, ডাক্তারবাবুকেও বিছানার চাদর সারা শরীরে মুড়িয়ে নিয়ে রাত কাটাতে হয়েছিল। সারা শরীর ঢেকে শুয়ে থাকলে, তবেই ওদের হাত থেকে কিছুটা বাঁচা যায়। কিছুটা ঘুমানো যায়। তিনি এটাও দেখেছিলেন যে, এদেশীয় জনসাধারণ গরমের দিনে সারা শরীর, পাখিরা যেমন পালকে মাথা গুঁজে ঘুমোয়, তেমনই চাদরে ঢেকে ঘুমিয়ে থাকেন।

ক্রান্তি

১৩ মে সকালবেলা ৫.৩০ টার সময়ে বাল্লাবাড়ি ছেড়ে গভীর জঙ্গলের পথে সকলে রওনা দিয়েছিলেন। সাতটা বেজে দশ মিনিটে একটা ছোট্ট নদী পেরিয়ে তাঁরা উন্মুক্ত তরাই অঞ্চলে প্রবেশ করেছিলেন। সামনে আদিগন্ত সবুজের গালিচা পাতা। এরকম পরিবেশেই ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি। ভিজে ঘাস, বড় গাছপালা কম, মাটিতে ভেজা ভাব। সঙ্গী দলের অনেকেই ম্যালেরিয়ার কবলে পড়েন। সার্জেন রেনীর সে এক ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে যাত্রা।

সকাল ন'টা নাগাদ গ্রামের বসতি, চাষবাস চোখে পড়তে থাকে। বেশিরভাগই মেচ বসতি। আরও আধঘণ্টা পর তাঁরা ক্রান্তিতে এসে পৌঁছেছিলেন। ক্রান্তিতে বাল্লাবাড়ির মত পর্যটকদের জন্য সরকারি আবাসন ছিল। ওই দুই জায়গার দূরত্বের ব্যবধান ১৪ মাইল এবং ডালিমকোট থেকে বাল্লাবাড়ির দূরত্ব ১৩ মাইল।

ক্রান্তির চারপাশের সবুজ চারণভূমি সত্যিই সুন্দর। ভুটানের গবাদি পশুদের তুলনায় ক্রান্তির গবাদি পশুদের আকৃতি ছোট। মেচ অধ্যুষিত জনপদ। লোকজন নানারকম উপহার সামগ্রী এনে দলটিকে সম্মান জানাতে থাকে। এঁরা সবাই ডালিমকোটের জুঙপেনের অধীনে শাসিত হতেন। জুঙপেনের প্রতিনিধি ছিলেন কাঠামেরা।

যদিও বলা হয়ে থাকে যে, পশ্চিমের মেচি নদী থেকে এঁরা মেচ নামে পরিচিত, কিন্তু এঁরা জানান যে, তাঁরা তরাই ও ডুয়ার্সের আদিম জনজাতি। তাঁদের বক্তব্যের সারবত্তা প্রমাণ করা বিদেশি সার্জেন রেনীর পক্ষে সম্ভব নয় বলেই তিনি স্বীকার করেন। কিন্তু তিনি বলেন যে, ওরাই একমাত্র জনজাতি যাঁরা ওই অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস করে থাকেন। তাঁরা ৮০০-১০০০ ফুট উচ্চতায় বসবাস করেন না। এঁরা সমতলের ঝাড় ঝোঁপ পরিষ্কার করে চাষাবাদ করেন এবং সংলগ্ন কিছুটা উঁচু স্থানে বসবাস করে থাকেন। এই কৃষিজীবী মানুষেরা প্রধানত ধান, তুলা, তামাক প্রভৃতি চাষ করে থাকেন। কুমারী মৃত্তিকার বুকে এঁরা কয়েক বছর ভালরকম ফসল ফলিয়ে আবার নতুন কৃষিভূমির সন্ধান করেন। সেখানকার জঙ্গল পরিষ্কার করে চাষাবাদ করেন। (জুম চাষ?) একদা চাষ করা হত এমন বহু পতিত জমি তাই সর্বত্র লক্ষ্য করা যায়। ভুটানের শোষণের ফলেও ওঁরা স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হতেন। তবে এঁরা দলবদ্ধভাবে বসবাস করতে

ভালবাসেন এবং স্থানান্তরী জনজাতির পর্যায়ে পড়েন।

মেচ ভাষা মুখ্যত বাংলা ভাষা থেকে উৎপত্তি বলে মনে করেছিলেন রেনী সাহেব। ওই ভাষার কোনও লেখ্য রূপ নেই। নিম্নবর্গীয় হিন্দুদের আচার-আচরণের মতই ছিল তাঁদের ধর্মীয় সংস্কার। এঁরা মাটির থানে কালীমূর্তি কল্পনা করে পূজা করে থাকেন। তাঁদের নির্দিষ্ট কোনও পুরোহিতও নেই, মন্দিরও নেই। (জাতি বৈশিষ্ট্য, ভাষা বৈশিষ্ট্যের বিষয়গুলি হয়ত একদিনের সফরে সার্জেন রেনীর নজরে পড়েনি।) এঁরা হাতি ছাড়া অন্যান্য সব পশুর মাংস খেয়ে থাকেন। হাতির প্রতি এঁদের শ্রদ্ধা-ভক্তি অসীম।

ঘর-গেরস্থালীর কাজকর্ম মহিলারাই সারেন এবং মহিলারা কৃষিকাজে পুরুষদের সহায়তা করে থাকেন। সন্নিহিত গ্রামের মাঝখানে সপ্তাহান্তে যে হাট বসে, ওই হাটে মহিলারাও গিয়ে থাকেন। সেখানে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বিনিময় প্রথায় সংগ্রহ করে থাকেন। মালয় দেশের ও বাংলাদেশের মহিলাদের সঙ্গে এঁদের চেহারায় মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

ময়নাগুড়ি

পরদিন অর্থাৎ ১৪ মে তাঁরা ৪.৩০ টায় ক্রান্তি পরিত্যাগ করেছিলেন। আগের দিন ছিল প্রচণ্ড গরম। চেল নদীর তীরে গিয়ে পাঁচটা নাগাদ চেল নদী পেরোলেন তাঁরা। এপারেও অপূর্ব চারণভূমি। প্রচুর পরিমাণে গবাদি পশু মাঠে চরছে। সাতটার সময়ে আর একটা নদী (নেওড়া/ধরলা) পেরিয়ে তাঁরা সাড়ে আটটার সময়ে ময়নাগুড়িতে এসে হাজির হয়েছিলেন। ময়না নামে গ্রামেই এই নবগঠিত সরকারি প্রশাসনিক কেন্দ্রটি গড়ে উঠেছিল। এটি বেশ চওড়া ও উঁচু জায়গা। সেখানে যে সব সরকারি বাড়িঘর তৈরি হয়েছিল, সেগুলির মধ্যে সামান্য কয়েকটি তখনও বর্তমান। বাঁশের খুঁটি, মাটির বেড়া, খড়ের ছাউনি দিয়ে তৈরি সে সব। এখানকার ভুটানি সেনানিবাসটি বিনষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। এর পাশেই গড়ে উঠেছে বাজার। ওই বাজার স্থানটি বেশ বড় এবং বর্গাগার।

জল্পেশ

সকাল ন'টার সময়ে ওঁরা জল্পেশ সেনা নিবাসে হাজির হতে পেরেছিলেন। ৫ নং বাংলার অশ্বারোহী বাহিনী এবং ৩০ নং পাঞ্জাব পদাতিক বাহিনীর ওই সেনানিবাস। শেষোক্ত বাহিনী রাত পোহালে চলে যাবে কানপুরে। ওই বাহিনী পাঁচ মাস ধরে নানা অসুখে বিসুখে ভুগছে বলেই, ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তাদের স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

জল্পেশ সেনানিবাসে দু'সারি ছাউনির প্রত্যেকটিতে চারটি করে ভিন্ন ভিন্ন সারিতে ঘরগুলি সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। মাটি থেকে পাঁচ ফুট উঁচু বাঁশের খুঁটিতে খড়ের ছাউনি। বাঁশের বাতার বেড়ার উপরে মাটি দিয়ে লেপা ছিল প্রতিটি ঘর। ঘরের মেঝে বাঁশের বাতা দিয়ে গাঁথুনি করা এবং বাতাস চলাচলের সুবন্দোবস্ত ছিল এই মেঝেতে। ভেজা স্যাঁতসেঁতে মাটির ঠান্ডা থেকেও এরূপ মেঝেতে রক্ষা পাওয়া যায়। ব্রিটিশ গোলন্দাজ বাহিনী এই ব্যারাকটি তৈরি করার দিন তিনেকের মধ্যে সেখানে কলেরা শুরু হয়েছিল। আক্রান্ত লোকেদের স্থানান্তরিত করা হয়েছিল দার্জিলিঙে। এরপর পঞ্চম অশ্বারোহী বাহিনী ও ৩০ নং পাঞ্জাবি পদাতিক বাহিনীর সেনারা তাঁবুর পরিবর্তে ওই ঘরগুলো ব্যবহার করতে থাকে। এ ছাড়াও বাইরের দিক থেকে অতিথিশালা এবং ঘোড়াদের জন্য আস্তাবল নির্মাণ করা হয়েছিল। সেনারা সবাই একটা ছাউনির ভেতরেই থাকেন।

ক্রান্তির চারপাশের সবুজ চারণভূমি সত্যিই সুন্দর। ভুটানের গবাদি পশুদের তুলনায় ক্রান্তির গবাদি পশুদের আকৃতি ছোট। মেচ অধ্যুষিত জনপদ। লোকজন নানারকম উপহার সামগ্রী এনে দলটিকে সম্মান জানাতে থাকে। এঁরা সবাই ডালিমকোটের জুঙপেনের অধীনে শাসিত হতেন। জুঙপেনের প্রতিনিধি ছিলেন কাঠামেরা।

দুপুরবেলা গোলন্দাজ বাহিনীর ঘরগুলি দখল করে আস্তানা গেড়েছিলেন কমান্ডান্ট মেজর ঘগ। তখন

থার্মোমিটারে ৯০ ডিগ্রি এবং বিকেলে ৯৫ ডিগ্রি তাপমাত্রা। জল্পেশের মাটি বালুকাময় ও দুর্বাঘাসের আস্তরণে আচ্ছাদিত। বিবেচনায় মনে হয় স্থানটি বসবাসের জন্য স্বাস্থ্যকর হওয়া উচিত। ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হবার আপাতদৃষ্টিতে কোনও কারণ নেই। (মনে হয় স্থানটি জল্পেশ মোড় সন্নিহিত ভুস্কাডাঙ্গা। স্থানটি জড়দা নদীর পশ্চিম তটে অবস্থিত।) পাতলাখাওয়ার মতই এ স্থানটি স্বাস্থ্যসম্মত বলেই নির্ধারিত হয়েছে। এখানে একটি বড় নদী (জড়দা) বয়ে চলেছে এবং সন্নিহিত অঞ্চলে একটি ঘন সন্নিবদ্ধ জনপদও আছে। চারদিকটা দেখে মনে হয়েছিল, স্থানটি স্বাস্থ্যপ্রদ। কিন্তু পাতলাখাওয়ার মতই এখানে কলেরা ব্রিটিশ সেনাদের সর্বনাশ করেছিল। সার্জেন রেনীর ধারণা, নদীর ধারে সেনাছাউনি হলে কলেরা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি হতে পারে। এ প্রসঙ্গে তিনি বহু যুক্তিও উত্থাপন করেছিলেন।

জল্পেশের সেনা ছাউনিতে থাকাকালীন সার্জেন রেনীর দুটি পর্যবেক্ষণ এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে।

রেনী সাহেব ক্যাপ্টেন হাক্সাম-এর কাছে শুনেছিলেন যে, ডুয়ার্সে ভুটানি অত্যাচারের হাত থেকে ডুয়ার্সবাসীকে রক্ষা করায় তরাই ও ডুয়ার্সের প্রজারা অত্যন্ত আনন্দিত। তাঁরা ব্রিটিশ শাসনকে বার বার ধন্যবাদ দিয়ে স্বাগত জানিয়েছেন। সার্জেন রেনী ১৮৬৪ সালের ৭ মে ভারত সরকারকে প্রদত্ত মি. ইডেনের স্মারকলিপি থেকেও জেনেছিলেন যে, বেঙ্গল ডুয়ার্স দখল করার প্রয়াসকে জনপদবাসী অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। সার্জেন রেনী নিজেও এরূপ প্রশংসা সাধারণের কাছে শুনেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও এরূপ ধারণার একটা বিপরীত প্রতিক্রিয়াও তিনি লক্ষ্য করেছিলেন।

জল্পেশে বসবাস করবার সময়ে যে কলেরা রোগের মহামারির কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, ওই কলেরা নিবারণের জন্য জেনারেল টাইটলার জনসাধারণের উদ্দেশে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন। জনসাধারণকে বলা হয়েছিল, তাঁরা যেন নিকটবর্তী জড়দা নদীতে গো-মহিষাদিকে স্নান না করান, নিজেরাও কাপড় কাচা ও স্নানাদি কর্ম না করেন। তিনি কলেরা নিয়ন্ত্রণের জন্য গ্রামবাসীদের ওভাবে নদীর জল দূষিত করতে নিষেধাজ্ঞা জারি করে দেন। তিনি পুলিশ মোতায়েন করে, অমান্যকারীকে গ্রেপ্তারের ভয় দেখান।

জল্পেশের স্থানীয় মানুষেরা এমনিতেই সেনাদের ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত ও ক্ষুব্দ। তার উপরে এ যাবৎকালের স্বাধীনতায় এরূপ হস্তক্ষেপ, বাপ-ঠাকুর্দার আমল থেকে প্রচলিত সংস্কারে বাধা প্রধান, জল্পেশ মন্দিরে পুজো দেবার সময়ে পুণ্য নদীতে স্নানাদি সম্পন্ন করার প্রচলিত প্রথায় ব্যাঘাত সৃষ্টিকে সুনজরে দেখেননি। তাঁদের মধ্যে দ্রুত ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব জেগে উঠতে থাকে। বিক্ষুব্দ হয়ে ওঠেন গ্রামবাসীরা, হয়ে ওঠেন প্রতিবাদী। স্বাদেশিকতার অভিমানে ফুঁসতে থাকেন জনগণ। হিতে ঘটে বিপরীত।

সার্জেন রেনীর সঙ্গে একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির আলাপ হয়েছিল। মি. ইডেন ভুটানের প্রজা, ডুয়ার্সের প্রজা এবং এমনকি কোচবিহারের প্রজাদের উপর ভুটিয়াদের যে অত্যাচারের কথা উল্লেখ করেছিলেন, তার বিপরীত কথা শোনা গিয়েছিল এই দেশীয় ভদ্রলোকটির কাছে। তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়েছিলেন, ভারত-ভুটান সীমান্তে কিংবা ডুয়ার্সে ভুটিয়াদের বিরুদ্ধে স্থানীয়দের কোনও অভিযোগ নেই। বরঞ্চ তদপেক্ষা বেশিভাবে তাঁরা ব্রিটিশ শাসনাধীন এলাকায় অত্যাচারিত হয়ে চলেছেন।

দ্বিতীয় ঘটনাটি জল্পেশ সংলগ্ন একটি মন্দির প্রসঙ্গে। জল্পেশ ও ময়নাগুড়ির মাঝামাঝি পূর্বোক্ত নদীটির পশ্চিম তটে একটি প্রাচীন মন্দির মাটি চাপা দেওয়া ছিল। তিনি মেজর ঘগের কাছে ওই ভগ্ন মন্দিরটির কথা শুনেছিলেন। তিনি গোলন্দাজ বাহিনীর সেনাদের বর্ণনাও শুনেছিলেন। তিনি জেনেছিলেন যে ভুটানি সৈন্যরা প্রথম আক্রমণের সময়ে ভয়ে দ্রুত স্থান ত্যাগ করেছিলেন বলে হয়ত সোনাদানা সঙ্গে করে নিয়ে পালাতে পারেননি। মন্দিরটির মধ্যে তা লুকিয়ে রেখেছিলেন। ওই সম্ভাবনার কথা জল্পেশে স্থিত সেনারা শুনেছিলেন। গোলন্দাজ বাহিনীর সেনারা ওই মন্দিরটি ভেঙেচুরে তছনছ করে সোনা খুঁজেছিলেন। কিন্তু কিছু না পাওয়ায় মন্দিরটিকে মাটি চাপা দিয়ে রেখে দিয়েছিলেন। বহু শতাব্দী প্রাচীন ওই

বটেশ্বর মহাদেবের মন্দিরটি মাটি চাপা অবস্থায় আছে শুনে শঙ্কিত হয়ে সার্জেন রেনী তা পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। সার্জেন রেনী লিখেছেন—

'আমি মন্দিরস্থানে গেলাম ও দেখলাম। গ্রানাইট পাথরের ১৪ বর্গ ইঞ্চি ইট, কোনওটা বা ১০ ফুট থেকে ১৬ ফুট পর্যন্ত লম্বা। ওই পাথর দিয়ে দেয়াল গ্রথিত। মধ্যভাগে একই পাথরের চারটি স্তম্ভের উপর মন্দিরের পরিকাঠামো। গ্রীসিয়ান, ডরিক এবং করিন্থিয়ান শিল্পকলার অপূর্ব নির্মাণ কৌশল। প্রত্যেক কলামের প্রতিটি শর একটার সঙ্গে অপরটি অপূর্বভাবে গ্রন্থিত। স্তম্ভের উপরিভাগ এমন অদ্ভুত গোলাকার এবং একটির সঙ্গে অপরটি সুন্দরভাবে আলিঙ্গনবদ্ধ। তারপর একটার উপর আর একটা ক্রমশ ছোট ছোট বৃত্ত তৈরি করে করিন্থিয়ান কায়দায় চূড়ার আকার প্রদান করেছিল। বৈকুণ্ঠপুরের রায়কত বংশীয় জমিদারদের পারিবারিক সম্পত্তি এটি। ডুয়ার্স হস্তান্তর করবার সময় (১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে বৈকুণ্ঠপুরের ৭৭টি মৌজা ভুটানকে হস্তান্তর করেছিল ব্রিটিশ সরকার) এই বিতর্কিত মন্দিরটি হস্তান্তরিত হয়েছিল।'

(যা হোক সার্জেন রেনী সেটিকে মাটি চাপা দিয়ে ব্রিটিশ লজ্জা ঢেকে রাখতে উদ্যোগী হয়েছিলেন।)

জলপাইগুড়ি

১৫ মে ভোর চারটের সময়ে ৩০ নং পাঞ্জাবি সেনাদের সাথে সার্জেন রেনীও জলপাইগুড়ির উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন। দূরত্ব ৯ মাইলের মত। সারিবদ্ধ হাতিরা মালপত্র ও অসুস্থদের নিয়ে শুরু করেছিল পথচলা। যারা অসুস্থ তাদের বহন করা হচ্ছিল ডুলিতে। অসুস্থদের প্রতি শিখ সেনাদের একটা উন্নাসিক মনোভাব কাজ করছিল। কারণ, অসুস্থদের পরনের কোট ছিঁড়ে গেছে। নিম্নমানের নোংরা জামাকাপড়ের দিকে তাকানো যাচ্ছিল না। তাই শিখ সেনারা ওদের পাশাপাশি হেঁটে যেতেও অনীহা প্রকাশ করতে থাকে।

তিস্তার অপর পারে জলপাইগুড়ি। তিস্তায় পৌঁছাতে সাতটা বেজে গিয়েছিল। নদীটি বিস্তৃত ও স্রোতস্বিনী। প্রবল স্রোতের জন্য অন্যান্য নদী থেকে সেটিকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা যায়। চওড়া পাটাতনের নৌকায় চড়ে ওঁরা নদী অতিক্রম করেছিলেন। নদী পেরিয়ে আরও মিনিট পনেরো লেগেছিল তিস্তার অপর পারে পৌঁছাতে।

জলপাইগুড়ি একটি গ্রামীণ জনপদ, তবে অত্যন্ত সুন্দর ও মনোরম। তিস্তা নদীর মাইল দুয়েক দূরে জনপদটির অবস্থান। দেশীয় ও ইউরোপীয়ানদের বাড়িঘর একই কায়দায় বাঁশের কাঠামোয় তৈরি। এ অঞ্চলে মজবুত কাঠামোর বাড়িঘর করা বিপজ্জনক। কারণ, এখানকার মাটি খুবই নরম। তাছাড়াও এ অঞ্চলে মাঝে মাঝেই ভূমিকম্প হয়ে থাকে।

এই জলপাইগুড়িতেই সার্জেন রেনী পূর্বোক্ত দেশীয় ভদ্রলোকটির নিকট থেকে নির্ভরযোগ্য কিছু তথ্য পেয়েছিলেন। যে তথ্যে বলা হয়েছিল যে, ব্রিটিশ শাসন অপেক্ষা ভুটানের শাসনকে তিনি বেশি গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছিলেন। কারণ, তাঁরা ব্রিটিশ শাসনাধীন এলাকার সীমান্তে বেশি অত্যাচারিত হয়েছিলেন।

মি. ইডেনের মেমোরেন্ডামে বলা হয়েছিল, শুধুমাত্র সরকারি নির্দেশ জারি করে ডুয়ার্সকে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণাধীন করলে চলবে না। তার চাইতেও শক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নতুবা আগের চাইতেও অবস্থা খারাপ হবে। ভুটান সরকার তাদের দখলিভুক্ত এলাকা থেকে যেভাবে রাজস্ব ইত্যাদি সংগ্রহ করে থাকত, বিনা প্রতিরোধে তাঁরা তাঁদের ওই অধিকার ছাড়বে না। তাই ডুয়ার্স যদি ভুটিয়াদের কাছে লুণ্ঠনের খোলা ময়দান হয়ে পড়ে থাকে, তবে ডুয়ার্স হয়ে উঠবে আরও জনশূন্য, আরও ধ্বংসাত্মক।

সার্জেন রেনী কিন্তু মি. ইডেনের ওই রিপোর্টটিকে পক্ষপাতশূন্য বলে মনে করেন না। তা প্রমাণের জন্য তিনি বিভিন্ন যুক্তিবিন্যাসও উপস্থাপিত করেছিলেন। একই সুরে তথ্য পরিবেশিত হয়েছিল ১৮৬৫ সালের ২৯ মার্চ তারিখে 'ক্যালকাটা ইংলিশম্যান' পত্রিকাতেও। রেনী সাহেব তা তুলে ধরেছেন।

'আমাদের সংবাদদাতা এক কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনার বিষয়ে মন্তব্য করেছিলেন। ব্রিটিশদের হাতে বন্দি ভুটিয়ারা কোনও মিথ্যা তথ্য প্রদান করেননি। তারা যা বলেছিলেন, তা সবই প্রমাণিত, সত্য। আমাদের সংবাদদাতা মনে করেন যে, ভুটিয়াদের মধ্যে যদি এমন সাধারণ প্রবণতা থাকে, তবে আমরা

স্বাভাবিক ইতিহাসের একটা ধারণা পাব। সেটি হল, এশিয়া মহাদেশের জনজাতির লোকেরা প্রকৃতই সত্যসন্ধ এবং পারত্রিক গুণাবলীর প্রতি আনত।'

তাই সার্জেন রেনী মনে করেন যে, ভুটান সরকারের 'জনশূন্য করা ও উচ্ছেদ করা' নীতির যে কথা ইডেন সাহেব বলেছেন, তা সমর্থন করা যায় না। সত্য এটাই যে, ভুটান ও সন্নিহিত এলাকায় জনবসতি খুবই কম। তাছাড়া তিনি নিজেও দেখেছেন যে, মেচ জনজাতি কোথাও থিতু ভাবে বসবাস করেন না। এঁরা যাযাবর শ্রেণির কৃষিজীবী মানুষ।

সার্জেন রেনী জলপাইগুড়িতে এসে জনসাধারণের কাছে যে সব কথা শুনেছিলেন, ওই প্রসঙ্গে তাঁর একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তা হুবহু উল্লেখ করা হল— 'at the period of my visit to Julpigorie, those in the neighbourhood of the frontier in that direction would rather have remained as they were then come under our rule' মর্মার্থ হল, 'ওই সময়ে অর্থাৎ আমার জলপাইগুড়িতে ভ্রমণকালে ভুটান সীমান্ত সন্নিহিত সব দিকের জনপদবাসীরা আমাদের শাসনাধীনে আসা অপেক্ষা, তাঁরা যে অবস্থায় ছিলেন, ওই অবস্থাতেই থাকতে বেশি আগ্রহী।' অর্থাৎ ব্রিটিশ শাসনাধীনে থাকা অপেক্ষা দেশীয় ভুটানরাজের শাসনই তাদের কাছে বেশি পছন্দের ছিল।

এরূপ মনোভাবের অবশ্য আর একটা কারণ সার্জেন রেনী উদাহরণ হিসেবে প্রদান করেছিলেন। সেটি জড়দা নদীর জলদূষণ সংক্রান্ত ঘটনা। পূর্বোক্ত ওই ঘটনা তাঁকে অন্য আর এক উপলব্ধির দিকে আকৃষ্ট করেছিল।

তিনি বলেছিলেন যে, ডুয়ার্সে পর্যাপ্ত পরিমাণে ধান ও তামাক উৎপন্ন হয়ে থাকে। এগুলো গোলাজাত ফসল। ডুয়ার্সে যখন বড় মেলা বসে, তখন গোলা থেকে ওইসব কৃষিজাত পণ্যাদি বিক্রির জন্য মেলায় নিয়ে যাওয়া হয়ে থাকে। হাট বাজারও সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে বসে। পাহাড়ের পাদদেশে প্রচুর পরিমাণে তুলাও উৎপন্ন হয়। ওই তুলার বীজের আবরণও বড় এবং তুলার মানও উন্নত। এ সব ফসলের বাণিজ্যিক চাবিকাঠি থাকত বাঙালি বাবুদের হাতে। ভুটানি লোকেরা বিনিময় প্রথার মাধ্যমে তাঁদের চাহিদা মত জিনিসপত্র সংগ্রহ করে থাকেন। ধানের বিনিময়ে কার্পাস তুলা সংগ্রহ করে বাঙালি ব্যবসায়ীরা প্রচুর লাভবান হয়ে থাকেন। ১৮৫৮ সালে জাপানের সাথে ব্রিটিশদের চুক্তি হওয়ার সময়েও দেখা গিয়েছিল যে, রূপার বিনিময়ে সোনা ওজন দরে কিনতেন ব্যবসায়ীরা। ওই বিনিময় প্রথা ভুটানের সঙ্গে বজায় রাখার জন্যই হয়ত জলপাইগুড়ির ব্যবসায়ী লোকেদের পছন্দ ভুটানি শাসন। ব্রিটিশ সরকারের আধিপত্য তাদের না পসন্দ্।

আমবাড়ি ফালাকাটা

জলপাইগুড়িতে কুলিদের ছেড়ে দিয়ে সার্জেন রেনী একজন ভারবাহী লোককে পরবর্তী যাত্রাপথের সঙ্গী করে নিয়েছিলেন। এবার দলে মাত্র তিনজন— সার্জেন রেনী নিজে, ওই ভারবাহী লোকটি এবং সাহেবের খাস আর্দালি একজন মাদ্রাজি কর্মী।

সব ব্যবস্থাদি সেরে বিকেলবেলা তিনি আমবাড়ি ফালাকাটার উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন। জলপাইগুড়ি থেকে আমবাড়ি ফালাকাটার দূরত্ব ১৫ মাইল। ওই স্থানটি জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ির মধ্যবর্তী স্থান।

মাদ্রাজি লোকটি বেশ রঙ্গপ্রিয়। সে তার নিজের নামের পরিবর্তে একটা শ্রুতিমধুর নাম গ্রহণ করেছিল। নামটি হল 'রাঙ-গো-স্বামী' (রঙ্গস্বামী)। খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ না করেও সে কখনও নিজেকে 'জেমস' নামেও পরিচয় দিত। এ জন্যে সে কোনওদিন মন খারাপ করেনি। কোনও মাদ্রাজি খ্রিস্টানই হোক বা একজন ইউরোপীয় খ্রিস্টানই হোক— কোনও খ্রিস্টানের অনুচর হলে সে নিজের পরিচয় দিত 'খ্রিস্ট-ওয়ান' (খ্রিস্টান)। আসলে কিছু লোকের ধারণা ছিল, যদি কেউ নিজের ধর্মমত যথাযথ ভাবে পালন করতে না পারে, তবে সবাই তেমন লোককে 'খ্রিশ্চান' বলে থাকে। অবশ্য এ ধারণার জন্য তাকে দোষ দেওয়া যায় না। সে মদ পান করে, ইংরেজি ভাষায় শপথ গ্রহণ করে এবং প্রভুর দেখাদেখি বা সঙ্গে থাকার দরুণ প্রভুর ধর্মীয় আচরণগুলি পালনেরও চেষ্টা করে।

আমবাড়ি ফালাকাটার রাস্তা অত্যন্ত জটিল। কারণ, অনেক উপপথের সাহায্য নিয়ে মূল পথে ফিরতে হয়। ভারবাহী লোকটিও দীর্ঘক্ষণ ভারবহনে

অভ্যস্ত নয়। অন্ধকারে সে সঠিকভাবে অনুসরণও করতে পারে না। গাঁয়ের লোকজনদের জিজ্ঞেস করতে করতে যেতে হচ্ছিল। ফলে, দেরিও হচ্ছিল। আমবাড়ি পৌঁছাতে মাঝরাত হয়ে গিয়েছিল।

সার্জেন রেনী মাঝরাতে যে জায়গাটিতে রাত কাটানোর ব্যবস্থা করতে পেরেছিলেন, সেটি মনে হয় জলপাইগুড়ি রাজার ঘোড়াশালা। পাশে রাজার শখের বাড়িতে অনেক সময়ে নিশিযাপন করতেন। (জলপাইগুড়ির রায়কত রাজাদের এমন শখের বাড়ি ছিল রংধামালী, বেলাকোবা, আমবাড়ি ফালাকাটা, রাজগঞ্জ, ল্যানটঙ্ বা চুমুকডাঙ্গিতে।)

রাজা ওই সময়ে সেখানে ছিলেন না। গরমের দিনে তিনি দার্জিলিঙে একটি কেনা বাড়িতে থাকতেন। ভারতের বহু দেশীয় রাজা ব্রিটিশ সরকারের আশ্রয়ে রাজ্য চালাতেন। জলপাইগুড়ির নাবালক রাজাও তাই। ব্রিটিশ সরকার তাঁর লেখাপড়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। যতদিন তিনি সাবালক না হবেন, ততদিন তাঁর ও তাঁর রাজ্যের দায়িত্ব পালন করবে সরকার। এই রাজা পূর্বাপর ইউরোপীয় শিক্ষা গ্রহণ করে চলেছেন। তাঁর শিক্ষার নমুনা তিনি দার্জিলিঙে পেয়েওছিলেন। সার্জেন রেনী সেখানে একটি চারপাই (খাটিয়া) পেতে শুয়ে পড়েছিলেন এবং পরদিন রোদ ওঠা না পর্যন্ত ঘুমিয়েই ছিলেন।

পরদিন ভারবাহী কুলিটিকে ছেড়ে দিয়ে দুপুরবেলা পাঙ্খাবাড়ির উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েছিলেন। তবে আমবাড়ি ফালাকাটা তাঁর খুব মনপসন্দ জায়গা। জায়গাটি উর্বর। অনেকগুলো গ্রাম ঘন সন্নিবদ্ধ। তিনি অবাক হয়ে ভাবছিলেন, ব্রিটিশ সীমান্ত সংলগ্ন ওই স্থানটি ব্রিটিশরা কেন স্বেচ্ছায় ভুটানকে প্রদান করেছিলেন!

এবার তিনি টাট্টু ঘোড়ার সওয়ারি। সেটি ভাড়া করা। ওই ঘোড়ার পিঠে চেপে তিনি বিকেল পাঁচটার সময়ে কার্শিয়াং ব্যারাকে পৌঁছেছিলেন। জল্পেশ থেকে যে অসুস্থ সেনাদের ওখানে পাঠানো হয়েছিল, সেনা ব্যারাকে গিয়ে তিনি তাদের খোঁজ নিয়েছিলেন। ওই সেনারা জানান, জল্পেশে বাঁশের বাতা দিয়ে বোনা মেঝে বাতাস চলাচলের জন্য ফাঁকা ফাঁকা রাখা হয়েছিল। কিন্তু ওটাই ছিল কাল। ওই ফাঁক দিয়ে ঠান্ডা উঠত, জামাকাপড় ভেজা ভেজা লাগত। অসুস্থতার ওটাও কারণ। আর ওই সমস্যা সমাধানের জন্য ভুটানে বা অন্যত্র কাঠের পাটাতন মেঝে হিসেবে ব্যবহারের ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়।

১৮ মে ভোর হতে না হতেই রাত সাড়ে তিনটের সময়ে তিনি কার্শিয়াং থেকে দার্জিলিঙের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েছিলেন। দীর্ঘ পথ। দার্জিলিং পৌঁছাতে রাত ৯টা বেজে গিয়েছিল। রাস্তা ভালই ছিল। যতক্ষণ জলাপাহাড়ে না যাওয়া যায়, ততক্ষণ উপরে ওঠার অর্থাৎ আরোহণের কষ্ট উপলব্ধি করা যায় না। জলাপাহাড় থেকে পায়ে হেঁটে, পাল্কিতে বা টাট্টুঘোড়ার পিঠে চড়ে উপরে ওঠা যায়। জলাপাহাড় থেকে একটা চওড়া রাস্তা দার্জিলিং অভিমুখে গিয়েছে। ওই পথের মাইল তিনেক অংশ সে সময়ে ব্যবহারের উপযোগী ছিল না। ওই রাস্তাটি সমতলের কার্ট রোডের সঙ্গে যুক্ত। শিলিগুড়ি থেকে কার্শিয়াং এবং কার্শিয়াং থেকে দার্জিলিংগামী ওই পথটি চালু হলে পাঙ্খাবাড়ি রোডের গুরুত্ব কমে যাবে।

সার্জেন রেনী মাঝরাতে যে জায়গাটিতে রাত কাটানোর ব্যবস্থা করতে পেরেছিলেন, সেটি মনে হয় জলপাইগুড়ি রাজার ঘোড়াশালা। পাশে রাজার শখের বাড়িতে অনেক সময়ে নিশিযাপন করতেন।

দার্জিলিঙে পৌঁছানোর কয়েকদিন পরে রেভারেন্ড মি. নইবেল নামে একজন জার্মান ব্যাপটিস্ট মিশনারীর সঙ্গে সার্জেন রেনীর দীর্ঘ ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। ভদ্রলোক দীর্ঘ ২২ বছর ধরে লেপচা সমাজের সঙ্গে একাত্ম ছিলেন। তাঁর কাছেই সার্জেন রেনী লেপচাদের সমাজজীবন, রীতিনীতি, ধর্ম ও ভাষা বিষয়ে নতুনভাবে আলোকিত হয়েছিলেন। সার্জেন রেনীর এ যাবৎ জানা বিষয়গুলির পুনর্মূল্যায়ন করে, তাঁর নবলব্ধ চেতনার বর্ণনাও করেছিলেন দীর্ঘ পরিচ্ছদে। আমরা এই ভ্রমণ ও পর্যবেক্ষণ বৃত্তান্তে সেটিকে সংযোজন করবার লোভ সংবরণ করলাম।

(সমাপ্ত)

ঘরে বসে মাইনে নেওয়ার
গ্লানি ঘোচাতে
উদ্যোগী হতে পারতেন
সরকার ও শিক্ষকরা

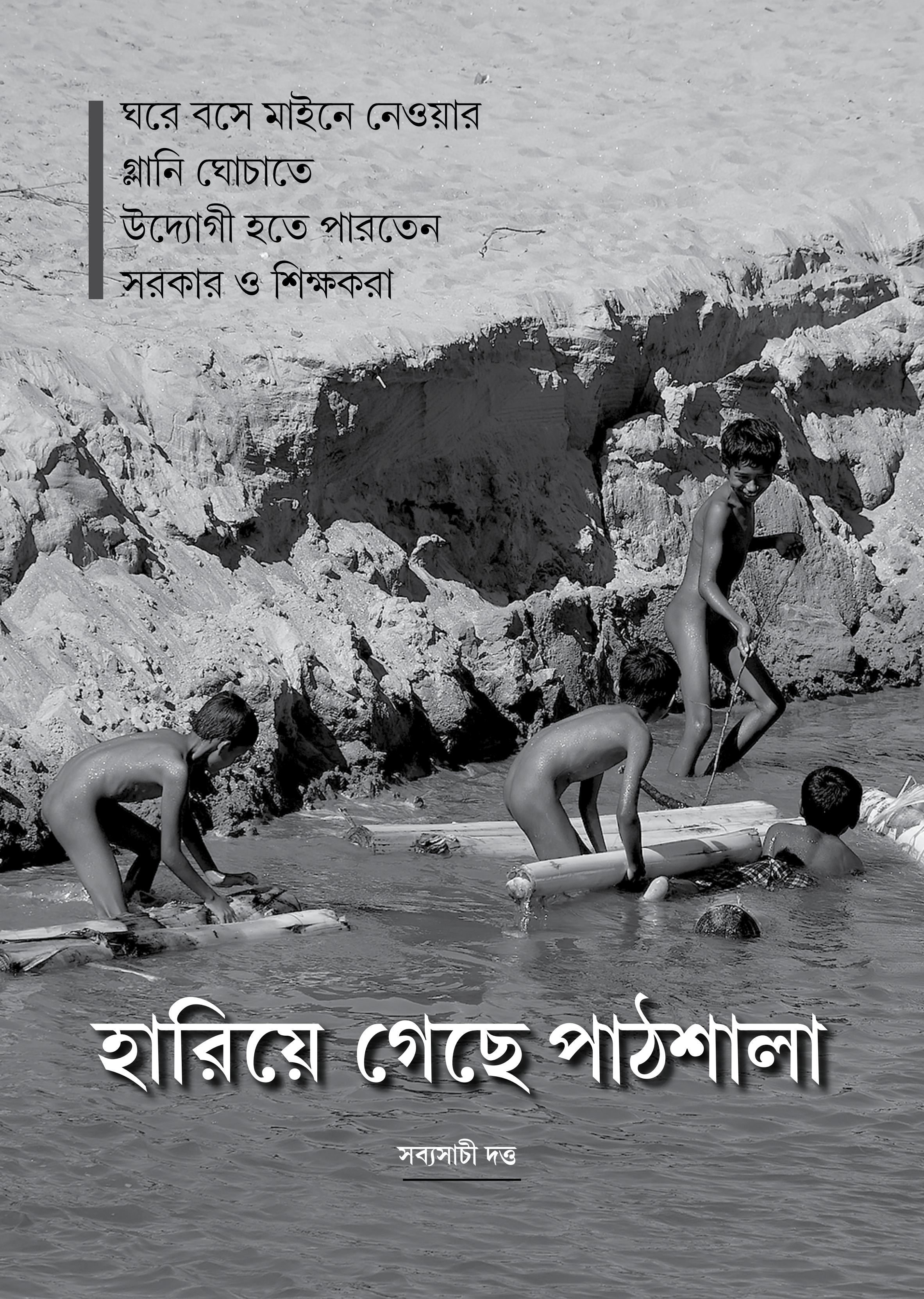

হারিয়ে গেছে পাঠশালা

সব্যসাচী দত্ত

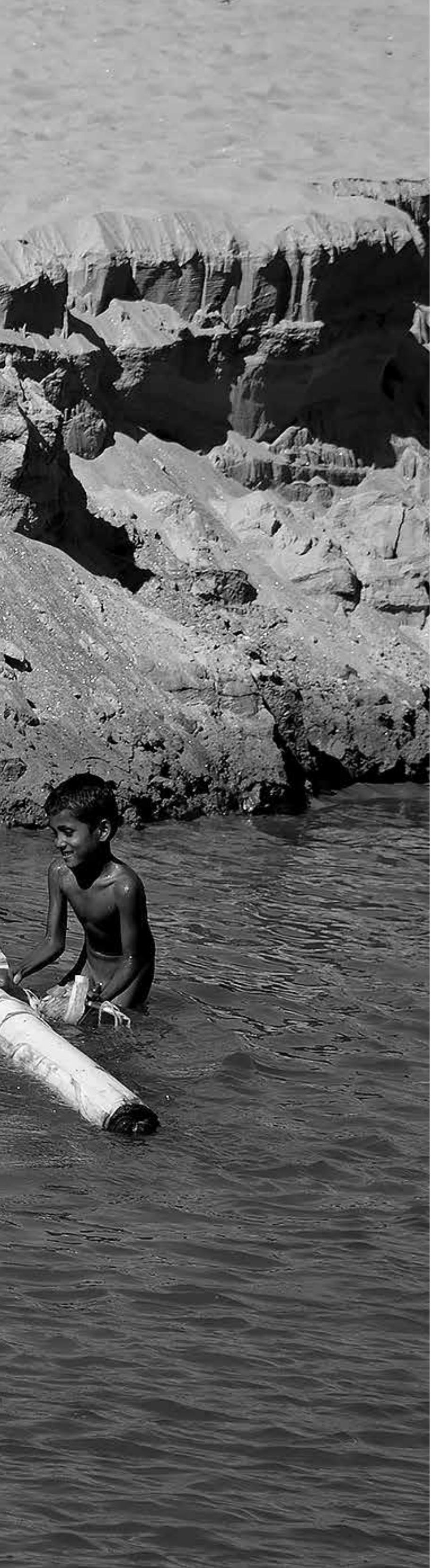

ছেলে-মেয়েগুলি ছোট ছোট মাপে কাটা কলাগাছের খোল নিয়ে উঠে গেল নদীর বাঁধের মাথায়। তারপর তাতে চেপে সেখান থেকে নেমে এল মসৃন গতিতে। আবার উঠে নেমে আসা। আবার, বারবার। সঙ্গে উদ্দাম হাসি, উচ্ছল উদ্দীপনা। এই ছিল গাঁয়ের মাটি মেখে দলবেঁধে বেড়ে ওঠা ওই শিশুদের 'স্লিপ'। এ কেউ শিখিয়ে দেয়নি তাদের। নিজেদের আবিস্কার।

প্রবল বর্ষণে জল-কাদায় এলোমেলো খেলার মাঠ। সে কাদায় বাতাবিলেবু দিয়ে ফুটবল খেলছে একদল ছেলে। চামড়ার বল নেই তো কী হয়েছে, মগজাস্ত্র তো আছে! জলে দাপিয়ে চোখ রাঙিয়ে হাতের তালু পায়ের পাতা সাদা করে ফেলেছে ছেলেমেয়েরা। পারে দাঁড়িয়ে উঠে আসতে বলছেন বাড়ির গুরুজন। কিন্তু কে কার কথা শোনে!

এমন ছোট ছোট দৃশ্য আমাদের মনে লেগে আছে। সে দৃশ্য চোখের আনন্দ, মনের ঔজ্জ্বল্য বাড়ায়। ক্রমশ মিশে যেতে হয় প্রকৃতির সাথে। ওরা প্রকৃতির কোলে বেড়ে ওঠে আলো হাওয়া মেখে। রোদে জলে পুষ্ট হয়ে। তার পাশে পাঠশালা গুরুমশাই স্কুল দিদিমনি মাস্টারমশাই।

"আমাদের ছোট গাঁয়ে ছোট ছোট ঘর
থাকি সেথা সবে মিলে নাহি কেহ পর
পাড়ার সকল ছেলে মোরা ভাই ভাই
একসাথে খেলি আর পাঠশালে যাই"

বন্দে আলি মিঞা তাঁর কবিতায় ছোটদের যে আনন্দ উচ্ছলের কথা লিখেছেন তা আজ অন্তর্হিত তাদের জীবন থেকে। প্রায় ছ'মাস পাঠশালা বন্ধ। সকলের মনে ধন্ধ, কেউ জানে না কবে খুলবে তা। বিপন্ন শৈশব গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত। আর উদয়ন পন্ডিতরা আত্মগ্লানি বুকে নিয়ে বয়ে বেড়াচ্ছেন। ঘরে বসে মাইনে নিতে তাঁদের ভাল লাগছে না মোটেই। মন ভাল নেই। মাইনে না নিলেও যে সংসার চলে না।

ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে বিদ্যালয় উদার আকাশের স্বাধীনতা। বন্ধুদের সঙ্গে বেঞ্চে বসা নিয়ে মান অভিমান। ছুট্টে যাওয়া খেলার মাঠে। অকারণ হেসে ওঠা। অথবা বেঞ্চ বাজিয়ে সমবেত গান। লেখাপড়ার পাশাপাশি তুমুল অক্সিজেন। প্রাণকে তাজা করে।

দখিনের নরম বাতাস মনে এসে জ্বালিয়ে দেয় প্রদীপ শিখাটি। আলোয় উজ্জ্বল হয় মুখজ অভিব্যক্তি। সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ে সে আলো।

আমাদের অধিকাংশ বিদ্যালয় গ্রামে। সেখানকার শিশুদের বেড়ে ওঠবার অনেকটাই বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে। আরও স্পষ্ট করে বললে শিক্ষিকা ও শিক্ষক মহাশয়দের আদরে আহ্লাদে। পিতা-মাতার পরেই ছোটদের অত্যন্ত ভালবাসা ও ভরসার জায়গা তাদের বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ের বন্ধু, ক্লাশের স্যার ও ম্যাডামরা। মনের সঙ্গে মনের যোগ। নিজেকে উন্মুক্ত করবার নির্ভার ঠিকানা। সে আজ কতদিন বন্ধ!

ছোট্ট অসুস্থ অমল তার কল্পনার পাখায় ভর করে দইওয়ালার পাঁচমুড়া পাহাড়ের তলায় শ্যামলী নদীর ধারে সেই গাঁয়ে অবিকল পৌঁছে যায়, বড় বড় গাছের তলায় লাল রঙের রাস্তার ধারে সেই গ্রামে।

এই কল্পনা আজ হারিয়ে যাচ্ছে না তো তাদের জীবন থেকে? কার সঙ্গে ভাগ করে নেবে সে নিজের ভেতর থেকে উঠে আসা বুরবুরিগুলোকে। আজ যে অমলের সাথে সাথে দইওয়ালারাও গৃহবন্দী। তাই হয়ত হারিয়েও যাচ্ছে সেসব। বিদ্যালয় তো শুধু শিক্ষালয় নয়। আত্মবিশ্বাসের গঙ্গোত্রী।

আর লেখাপড়া, সেতো বিদ্যালয়ের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ক্লাশে এলেই যা কিছু পড়াশুনো হয়। অধিকাংশ বাড়িতেই সে পরিবেশ না থাকা খুব স্বাভাবিক। উদয়াস্ত পরিশ্রম মাতা-পিতা ও বাড়ির বড়দের। ছোটদেরও সে শ্রমের সাথ দিতে হয়। বিদ্যালয় বন্ধ, তাই বই-পত্রের সঙ্গে সে সম্পর্কও চুকেছে। এর পাশে খেলার স্বাভাবিক প্রকৃতিও তো গেছে বদলে। এ এক ভয়ঙ্কর সময়।

সমস্যা আরও বেশি প্রাথমিক বিভাগের শিশুদের। অনলাইন ব্যবস্থা শুরু হয়েছে। স্মার্টফোন, ইন্টারনেট কানেকশন তার স্পীড, সব মিলে অধিকাংশ পরিবারের ছেলেমেয়েদের কাছেই ব্যবস্থাটা চাঁদ ছোঁওয়ার মতই প্রায় অসম্ভব একটি ঘটনা। একটু উঁচু ক্লাশের শিক্ষার্থীরা চেষ্টা করে চলেছে লেখাপড়াটা চালিয়ে নেওয়ার। কিন্তু প্রাক প্রাথমিক থেকে শুরু করে ষষ্ঠ-সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত শিশু-কিশোররা সবথেকে বেশি সঙ্কটে। ২০২০ শিক্ষাবর্ষে জানুয়ারী থেকে মার্চ পর্যন্ত কিছুদিন ক্লাশ হয়েছিল। কিন্তু এসময়টা বিদ্যালয় গুলিতে বিভিন্ন শিক্ষা সমন্বিত কর্মকান্ড চলতে থাকে। ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, তার মহড়া, সরস্বতী পুজো ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচি ব্যাহত হয়। পাঠের বাইরের এই বিষয়গুলি শিক্ষা বহির্ভূত নয় বলেই এই কাজগুলোকে সমান গুরুত্বের সঙ্গেই করা হয়। এইগুলো মিটে গেলে ফেব্রুয়ারীর মধ্য সময় থেকেই পাঠ্যসূচির কাজ শুরু হয়ে যায়।

এবার সে সম্পর্কও চুকেছে। কোভিড-১৯ সবকিছু এলোমেলো করে দিয়েছে। শিশু-কিশোরদের স্বাভাবিক বেড়ে ওঠা, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মন, বিদ্যালয়ের পরিবেশ, তাকে ঘিরে জনমানসের ছবি, সব। বিদ্যালয়ের বন্ধ দরজার এপাশে শিক্ষা এসে পৌঁছচ্ছে না। ছোটদের অনেকেই ভুলে গেছে পাঠ্যসূচির প্রায় সবটা। প্রাক প্রাথমিকের ক্লাশ যেহেতু শুরু হয় নি তাই তাদের ক্ষতির পরিমাণ কিছু কম। কিন্তু ফাইভ-সিক্সের বাচ্চারা যে পাঠের অনেকটা ভুলে যাচ্ছে তাদের পুনরায় আগের সিঁড়িতে তুলে আনবো কীভাবে! একটা বছর লেখাপড়া না করেই যারা পরের ক্লাশে প্রমোশন পেয়ে যাবে (সরকারী সিদ্ধান্ত তেমনই হতে পারে) তারা কীভাবে সামলে উঠবে! এই সঙ্কটে মনগুলি যে নষ্ট হয়ে গেল সব, তার মেরামত করবে কোন পদ্ধতি।

শিক্ষক-শিক্ষিকারা আজ মরমে মরে আছেন। তাঁদের মানসিক অবস্থা আরও শোচনীয়। একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষক অরিন্দম। বাড়ির কিছু কাজ করতে হবে বলে একজন দিন মজুর নিয়েছেন। সে পরিচিতও বটে। দুপুরে খাওয়ার অবসরে সে মজুর উদ্দেশ্যহীন ভাবেই অরিন্দমকে প্রশ্ন করে, মাস্টার স্কুল খুলিসে?

অরিন্দম উত্তর দেয়, না।

কতদিনে খুলিবে?

কে জানে!

তোমাক ব্যাতন দিয়া যাছে না!

এক অপ্রত্যাশিত অবস্থার মুখোমুখি হয় জাতীর মেরুদন্ড গড়ে তোলার কারিগর। প্রায় অনুচ্চারিত ভাবে উত্তর এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেও অরিন্দমের মনের ভেতরে একদলা অন্ধকার ঘনিয়ে

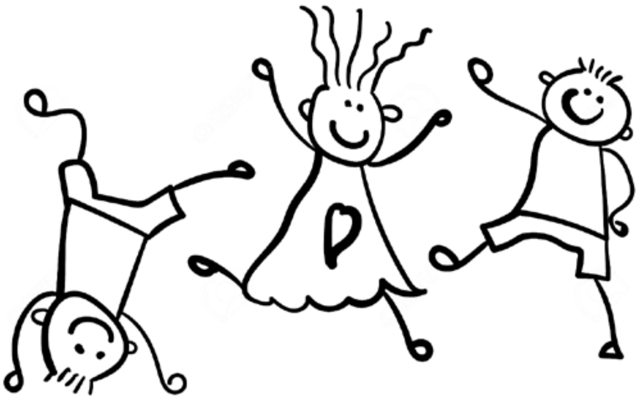

বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ছোট ছোট দল তৈরি করে মহল্লায় মহল্লায় গেলেই হত। হপ্তায় দু'তিনদিন সেখানে গিয়ে একটু দূরে দূরে বাচ্চাদের বসিয়ে গল্প করা যেত। মাসে একদিন চাল-আলু-ছোলা দিলেই শরীর মন পুষ্ট হয় না।

ওঠে। সে অন্ধকার গ্লানির। সে অন্ধকার অব্যক্ত যন্ত্রণার। কাজ না করে বেতন নেওয়ার মধ্যে এক ধরণের অসহায়তা আছে। তাকে অতিক্রম করা খুব কঠিন।

ছাত্র-শিক্ষকের অম্ল-মধুর সম্পর্কের পরিবেশ স্বাভাবিক জীবনকে সুন্দর করে, উভয়েরই। দুজনার প্রাণভরা ভালবাসা একে অপরের কাছে বন্ধক রাখা আছে যেন। তার প্রভাব প্রতিদিনকার জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জীবনকে সুন্দর করে, পূর্ণতার দিকে নিয়ে যায়। সেই স্বাভাবিক অবস্থা না থাকার কারণে মনের বিনিময়ের সৌন্দর্য আজ মুহ্যমান অবস্থায় হয়ে রয়েছে দীর্ঘ সময়। তার কুপ্রভাব তো পড়বেই শিক্ষাক্ষেত্রে।

মিড-ডে-মিলের গরম রান্না করা খাবার যে তারা পাচ্ছে না। তার তো একটা অন্য আগ্রহ ছিল। দলবেঁধে হইহই ক'রে পঙতি ভোজনের অমোঘ আকর্ষণ তো রয়েইছে। সব মিলিয়ে স্কুলে ড্রপ আউট বন্ধ করা গিয়েছিল। কোভিড-১৯ পরিস্থিতি ও সরকারের সিদ্ধান্তহীনতার ফলে আজ আবার শিক্ষক্ষেত্র আবার গভীর সংকটে।

আমাদের শিক্ষা এমনিই চলছিল অনেক নেই-এর হাত ধরে। সেই নেই সাম্রাজ্যের মানুষেরা (শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষার্থী, অভিভাবক-অভিভাবিকা) সকলে মিলে নেই-গুলিকে অতিক্রম করবার নিজস্ব রাস্তা খুঁজে নিয়েছিল। সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করবার পথ ও পদ্ধতি একরকম ভাবে ব্যবহার করা হচ্ছিল। হারিয়ে গেল সে পথ। আবার নতুন পথ খোঁজার পালা শুরু হবে। সে হবে আগের চেয়ে অনেক কঠিন। মানুষে মানুষে দূরত্ব আরও বেড়েছে। অবিশ্বাসের বাতাবরণ আরও ঘন হয়েছে।

অথচ অন্যরকম হতেই পারত শিক্ষাক্ষেত্র। এর জন্য প্রয়োজন ছিল সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের। খুব সহজ ও সাধারণ কিছু উপায় গ্রহণ করলেই শিক্ষার্থী-শিক্ষকের দূরত্ব এত বেড়ে যেত না। বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ছোট ছোট দল তৈরি করে মহল্লায় মহল্লায় গেলেই হত। হপ্তায় দু'তিনদিন সেখানে গিয়ে একটু দূরে দূরে বাচ্চাদের বসিয়ে গল্প করা যেত। একই এলাকায় বসবাসকারী বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়েও ছোট ছোট দল গড়ে সিলেবাসের বিষয়, সিলেবাসের বাইরের বিষয়, খোশগল্প অথবা এলোমেলো কথা বলে ঘণ্টা দু'তিন কাটানোই যেত বা এখনও যায়। শুরু করে দিলেই হয়। মাসে একদিন চাল-আলু-ছোলা দিলেই শরীর মন পুষ্ট হয় না। এগিয়ে আসতে হবে শিক্ষা দপ্তরকে। শিক্ষক সংগঠনগুলিকে। সরকারী নির্দেশ পেলেই হল। আর শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উদ্ভাবনী মন ও মগজাস্ত্রে বিশ্বাস রাখতে হবে। অল্প ভালবাসা, বিশ্বাসের অভিব্যক্তি আর আস্থার হাত বদলে দিতে পারে সময়। ঘটে যেতে পারে ম্যাজিক। এখনও আছে সময়।

আসামের চিঠি

বাঘের গোমাংস খাওয়ায় আপত্তি! আসছে ভোটে বিরোধীরা জোট বাঁধছে, নাগরিক ছেড়ে কথা কইবে না

সমর দেব

পাঁচ বছরের মেয়াদ প্রায় শেষ হতে চলল। ২০২১ সালেই ফের আসামে বিধানসভা নির্বাচন ঘনিয়ে এসেছে। আর, বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে আগে প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যর্থতার অভিযোগ উঠছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন আসাম সরকারের বিরুদ্ধে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে ছিল বিজেপি শিবিরের সবচেয়ে সোচ্চার প্রচার এবং দাবি। বাস্তবিকই গত নির্বাচনে দুর্নীতি খুব বড় ইস্যু হয়ে উঠেছিল। কিন্তু নির্বাচনে বিপুল জয়ের পর ক্ষমতাসীন হয়ে দুর্নীতির বিষয়ে তেমন পদক্ষেপ তো দূরের কথা, মুখ খুলতেই দেখা যায় নি। আর, কংগ্রেস আমলে যে দুর্নীতি অবাধ হয়ে উঠেছিল সেটা অস্বীকার করতে পারে না খোদ কংগ্রেস শিবিরও। ফলে, এতদিন দুর্নীতি নিয়ে যেন তেমন সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছিল না কোনও পক্ষেই। রাজ্যের কয়েকজন মন্ত্রী যে দারুণ দক্ষতা ও সক্রিয়তায় প্রশাসনকে সচল রাখতে চেয়েছেন সেকথা শত্রুরাও স্বীকার করতে বাধ্য। কিছু কিছু দফতরে কাজ হয়েছে নির্দিষ্ট মন্ত্রীর তৎপরতায়। কিন্তু দুর্নীতি নিয়ে কেউই সেভাবে মুখ খোলেননি। পাঁচ বছরের মেয়াদ ফুরোতেই অবশ্য ফের আলোচনায় উঠে এসেছে দুর্নীতি। এবং মাত্র কদিন আগেই জাতীয় স্তরের এক জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় বহু লক্ষ টাকার বিনিময়ে শীর্ষস্থান প্রাপ্ত এক প্রার্থী গ্রেপ্তারও হয়েছে। গ্রেপ্তার হয়েছেন তার চিকিৎসক বাবাও। এই একটি মাত্র ঘটনাই জানান দিচ্ছে রাজ্যে দুর্নীতির শেকড় অনেক গভীরে। এবং বলাই বাহুল্য, এটা একটি মাত্র ঘটনা। রাজ্য জুড়েই নানা স্তরে নানা দুর্নীতি প্রায় রোজকার সংবাদ।

তবে, এসব দুর্নীতি গত কয়েক দশকে এমন লাগামছাড়া হয়ে উঠেছে যে, আজকাল সাধারণ মানুষও যেন তাতে তেমন আমল দিতে চাইছে না। একধরনের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে এসব তথ্যপাতি। ফলে, দুর্নীতির সংবাদে সাধারণ মানুষ আর চমকে উঠছে না। প্রতিদিনের অন্ধকারে জীবন যাপনের পরিণামে গড়ে উঠেছে অভ্যাস। সাধারণ মানুষের আর যেন কোনও চাওয়াপাওয়া নেই। মানুষ চাইতেই ভুলে গেছে। নাগরিক অধিকার এই রাজ্যে এক অলীক কল্পনামাত্র হয়ে উঠেছে। ফলে, নাগরিকের করের টাকায় সামাজিক নানা কর্মকাণ্ডে বরাদ্দ টাকার সদ্ব্যবহার হচ্ছে না, তাতেও কারও কিছু যায় আসে বলে মনে হয় না! তবে, বিরোধী রাজনৈতিক শিবির থেকে বিজেপির 'অপশাসনের' যে অভিযোগ ক্রমশ জোরালো হয়ে উঠছে তাতে যেন ফের দুর্নীতির মত গুরুতর অভিযোগ জনমানসে ভিত্তি পেতে শুরু করেছে বহুদিন পর। এই অভিযোগ জনমানসে জোরালো ভিত্তি পেয়ে গেলে এবারের নির্বাচনে দেখা যেতে পারে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির অশুভ বাতাস। নানা মহল থেকে এনিয়ে অভিযোগও পাওয়া যাচ্ছে, তবে তা এখনও তেমন সোচ্চার হয়ে ওঠে নি। বিরোধীরা সরকারের ব্যর্থতা নিয়ে যত সোচ্চার হয়ে উঠতে চাইছে ততই যেন সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ঘনিয়ে উঠতে চাইছে আত্মরক্ষার কৌশল হিসেবে।

মানুষের আহার তথা খাদ্যাভ্যাস নিয়ে ঘোরালো রাজনীতি দেখেছে এই দেশ। সেটা বেশ পুরনো হয়ে গেছে। তবু দেশের নানা প্রান্তে গত কয়েক দশকে মানুষের খাদ্যাভ্যাস নিয়ে আপত্তি বেশ কিছু নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ঘটনা অবধি গড়িয়েছে। এসব হয়ত পুরনো কথাই। তাই বলে বুনো জানোয়ারের খাদ্যাভ্যাস নিয়েও যে আপত্তি তোলা যেতে পারে সেটা সম্ভবত কারো কল্পনাতেও ছিল না। সমগ্র প্রকৃতিতে প্রাথমিক স্তরে জল-অক্সিজেন-সূর্যের আলো নিয়ে খাদ্য প্রস্তুত করে উদ্ভিদ। তারপর সেই খাদ্য ধাপে ধাপে উন্নততর প্রাণ তথা জীবের কাছে পৌঁছয়। আর, উদ্ভিদ সহ সমস্ত প্রাণের শেষ পরিণতি প্রকৃতির মৌলিক উপাদানে পরিণত হওয়া, অথবা বলা যায় সেই আদি উৎসে ফিরে যাওয়া। এভাবেই অবিরত বয়ে চলেছে জীবনচক্র। গড়ে উঠেছে এক নিখুঁত শৃঙ্খলা, যাকে বলা হচ্ছে বাস্তুতন্ত্র। বাস্তুতন্ত্রের নিয়মই এই যে, প্রাণের রক্ষা, ধারণ এবং নতুন প্রাণের জন্ম নিশ্চত হতে পারে তার পুষ্টিকে নিশ্চিত করাতেই। এভাবে গড়ে উঠেছে এই সবুজ গ্রহের খাদ্যশৃঙ্খল। সমগ্র ঘটনাটিই সম্পূর্ণতই প্রাকৃতিক। তাতে খোদার ওপর খোদকারি চলে না। যেখানে মানুষ এমন খোদকারি করতে চেয়েছে সেখানেই নেমে এসেছে বিপর্যয়। তো, খাদ্য শৃঙ্খলার ধরন অনেকটা এরকম ঘাস মাটি থেকে জল, বায়ু থেকে অক্সিজেন আর সূর্যের আলো নিয়ে নিজের ক্লোরোফিলকে কাজে লাগিয়ে আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষা করবে, সেই ঘাস খেয়ে একই ভাবে আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষা করবে হরিণ, হরিণ শিকার করে বেঁচে থাকবে মাংসাশী প্রাণী। সেই মাংসাশীরাও একসময় প্রকৃতিতে নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে যাবে। এভাবেই জড়পদার্থের অণুগুলি নানা স্তর পেরিয়ে অবশেষে উৎসে ফেরে। এই নিয়ম জলের চক্রাকার আবর্তনেও। মেঘ থেকে বৃষ্টি, সেই বৃষ্টির জল নদী বেয়ে সাগরে, সাগর থেকে ফের জলের বাষ্পীভবনের মাধ্যমে আকাশে উঠে গিয়ে মেঘের সৃষ্টি এবং ফের বর্ষণের মাধ্যমে মাটিতে নেমে আসা।

তো, বিজেপি কি তাদের পছন্দ মত এরকম এক অলঙ্ঘ্য প্রাকৃতিক নিয়মকেই অস্বীকার করতে চাইছে? প্রাকৃতিক নিয়মকে অস্বীকার তথা লঙ্ঘনের ফল কী হতে পারে সেটা কি তাদের জানা নেই? অবশ্যই তারাও সব জানে। কিন্তু ভোট বড় বালাই। সেটা শুধু বিজেপি কেন, ভারতের প্রতিটি সংসদীয় রাজনৈতিক দলই জানে। ফলে, নির্বাচনের মুখে অনেক কথাই শোনা যায়। যেমন শোনা যায় বিচিত্র সব আশ্বাস, অসম্ভব সব প্রতিশ্রুতি। সংশ্লিষ্ট দল নিঃসংশয়েই জানে অস্বাভাবিক, উদ্ভট প্রতিশ্রুতি ও আশ্বাস কোনওদিনই বাস্তবায়িত হবে না। কারণ, সেরকম প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন স্বয়ং ঈশ্বরেরও হাতে নেই! যেমন, কালো

অসমে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন বিজেপির পক্ষে মোটেই সহজ হবে না। একদিকে সাম্প্রদায়িক তকমা, তার সঙ্গে নানা সমস্যার সমাধানে ব্যর্থতা এবং সর্বোপরি নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন(কা) ক্ষমতাসীন বিজেপিকে জটিল সঙ্কটের আবর্তে ঠেলে দিয়েছে। তার মধ্যে রাজ্যের বিরোধীরা খুব দ্রুত কাছাকাছি আসছে ছোটখাটো ব্যবধান সরিয়ে রেখে।

টাকার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন এবং সকলের অ্যাকাউন্টে পনেরো লক্ষ টাকা দেবার আশ্বাস! যেমন, সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলায় বিমুদ্রাকরণ! এরকম অসংখ্য উদাহরণ।

তাই বলে, বর্তমান ক্ষমতাসীন দলই যে এমন প্রতিশ্রুতি নিয়ে নির্বাচনে হাজির হচ্ছে, তা কিন্তু নয়। ভারতের রাজনৈতিক দলগুলোর কাণ্ডকারখানার তুলনা মেলা ভার। যেমন, পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘ ৩৪ বছর ক্ষমতায় ছিল সিপিএম নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট। এক দশক ক্ষমতাসীন থাকার পরেই তারা বুঝতে পারে বেকারত্ব এক ভয়াবহ চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে। অতএব, সরকারি উদ্যোগে পালিত হতে শুরু করলো বেকারি বিরোধী দিবস! সরকার কার বিরোধিতা করছে? দায়িত্ব তো খোদ সরকারেরই। অথচ, সাধারণ মানুষকে বোকা বানাতে এবং নিজের ঘাড় থেকে দায় ঝেড়ে ফেলতে সরকারই নেমে পড়েছে বেকারি বিরোধী দিবস

সৌজন্য: আসাম ডেইলিও

পালনে! এবং, তারা এই ভয়ানক জনবিরোধী ষড়যন্ত্রে প্রাথমিকভাবে সফলও হয়েছে।

ঠিক একই কায়দায় নেমে পড়েছে অসমের ক্ষমতাসীন বিজেপি। তাদের বাড়তি সুবিধা এই যে, কেন্দ্রেও তাদেরই সরকার। কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের সুর, তালে অমিল না হলে তেমন সমস্যা নেই। আর কে না জানে, যে কোনও অসত্যকে একশোবার সোচ্চারে উচ্চারণ করা হলে সেটা অর্ধেক সত্য বলে প্রতীতি জন্মে যায়। আচ্ছা, বাঘ তো হিংস্র মাংসাশী প্রাণী এবং যে-কোনও তৃণভোজী পেলেই তার চলে যায়। বাঘের ধান খাওয়া তো একটা বাকভঙ্গি মাত্র। বাস্তবে ঘাস বা ধান কোনওটাই বাঘের খাদ্য নয়। তাছাড়া, ধর্ম, সংস্কৃতি, সভ্যতা ইত্যাদি সবটাই তো মানুষের প্রেক্ষিতে। প্রকৃতিতে এর অস্তিত্বই নেই। তো, বাঘের গোমাংস খাওয়া নিয়ে আপত্তি তোলার মানে কি দাঁড়ায়? অথচ, গুয়াহাটি চিড়িয়াখানার বাঘেদের গোমাংস ভক্ষণে আপত্তি তুলেছেন একাংশ হিন্দুত্ববাদী। চিড়িয়াখানায় বাঘেদের জন্য গোমাংস-বাহী কয়েকটি গাড়ি রাস্তায় আটকে দেন। বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে তাঁরা চিড়িয়াখানা-অভিমুখী রাস্তা অবরোধ করে রাখেন।

অসমে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন বিজেপির পক্ষে মোটেই সহজ হবে না। একদিকে সাম্প্রদায়িক তকমা, তার সঙ্গে নানা সমস্যার সমাধানে ব্যর্থতা এবং সর্বোপরি নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন(কা) ক্ষমতাসীন বিজেপিকে জটিল সঙ্কটের আবর্তে ঠেলে দিয়েছে। তার মধ্যে রাজ্যের বিরোধীরা খুব দ্রুত কাছাকাছি আসছে ছোটখাটো ব্যবধান সরিয়ে রেখে। দুই শক্তিশালী রাজনৈতিক পক্ষ কংগ্রেস এবং এআইইউডিএফ হাত মিলিয়েছে। আরও নানা পক্ষ একটু একটু করে কাছাকাছি আসতে শুরু করেছে। বিজেপি দল তথা সরকারের প্রতি আসামের জাতীয় সংগঠনগুলি তীব্র অসন্তুষ্ট। 'কা' ইস্যুতে অসমিয়া হিন্দুরা প্রকাশ্যেই বিরোধিতা করেছেন। 'কা' প্রসঙ্গেই বিজেপির বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করার অভিযোগ উঠেছে। অসমের বিপুল সংখ্যক মুসলিম বাসিন্দার একাংশ বাঙালি, অন্য অংশটি অসমিয়া। এদের কেউই বিজেপির সঙ্গে নেই কোনও কালেই। বাগিচা অঞ্চলে এখনও বিপুল মানুষ কংগ্রেসের সাবেক অটল ভোটব্যাংক। অন্যদিকে, বাঙালি মুসলিমদের এক বড় অংশ মৌলানা বদরুদ্দিন আজমলের এআইইউডিএফের প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই বিশ্বস্ত সৈনিক। আর, এই দুই গুরুত্বপূর্ণ দল এবারে হাত মিলিয়েছে। তাছাড়া, আছে, কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি। উজান অসমে তাদের শক্তিশালী গণভিত্তি রয়েছে। এবং বিজেপির সাম্প্রদায়িক রাজনীতির

কঠোর সমালোচক তারা। অসম গণ পরিষদ বিজেপির সঙ্গে জোট বাঁধতে গিয়ে প্রায় মুছে যাবার দশা। তাদের সম্পূর্ণ অবলপ্তি এখন সময়ের অপেক্ষা মাত্র। আসন্ন নির্বাচনে তাদের কোনও ভূমিকা থাকার কথা নয়। অন্যদিকে, সদ্য গঠিত অসম জাতীয় পার্টি (এজেপি) এবং রাইজর দল হাত মেলাতে পারে এবারের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপিকে ক্ষমতাচ্যুত করার লক্ষ্যে। এজেপি গঠনের পেছনে সক্রিয় ভূমিকা ছিল সারা অসম ছাত্র সংস্থার (আসু)। আবার কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির নেতৃত্বে গঠিত হয়েছে রাইজর দল। দুই পক্ষের নানা বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে ঠিকই, তবে, তারা বিজেপিকে ক্ষমতাচ্যুত করতে সমস্ত মতপার্থক্য ভুলে যেতেই পারে। সেরকম ইঙ্গিত ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে। আবার, কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, এজেপি, রাইজর দলের জন্য দরজা খোলা রাখা হয়েছে। মানে, বিরোধী জোট আরও ব্যাপক, আরও শক্তিশালী হয়ে উঠতেই পারে। সেরকম সম্ভাবনা প্রবল।

এদিকে, বিজেপির 'অপশাসনের' বিরুদ্ধে যৌথ প্রতিবাদী আন্দোলনে নামবে বিরোধী জোট। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রিপুন বরা ঘোষণা করেছে, এই আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে জোটের বৈঠকে। তাতে অংশ নিয়েছে সিপিআই, সিপিআই (এম-এল) এবং এআইইউডিএফ।

রাজ্য জুড়ে বিরোধী রাজনৈতিক শিবিরের তৎপরতার প্রেক্ষিতে বিজেপি কিন্তু স্বস্তিতে নেই। ফলে, এমন আশঙ্কা প্রবল হয়ে উঠেছে যে, তারা সঙ্কটের মোকাবিলায় ব্যর্থ হয়েই সাম্প্রদায়িক লাইনে নির্বাচনে নামতে পারে। কারণ, বিজেপি সমর্থকদের একটি অংশে ইতিমধ্যেই মোহভঙ্গ ঘটে গেছে। নইলে বাঘ-সিংহের গোমাংস ভক্ষণ নিয়ে হাওয়া গরমের চেষ্টা হতো না। তবে, মাংসাশী প্রাণীদের খাদ্যাভ্যাস নিয়ে আপত্তি তথা প্রতিবাদের খেলাটা শেষ অবধি জমে ওঠে নি। কারণ, বালকও বোঝে জানোয়ারের ধর্ম, সংস্কৃতি বলে কিছু নেই, থাকতে পারে না। তাদের সভ্যতা বলেও কিছু নেই। অতএব, ফের নতুন কোন খেলা শুরু হবে তা নিয়ে জল্পনার অবকাশ থেকে যাচ্ছেই।

ল্যাব ডিটেকটিভ

সাহিত্যে ডিটেকটিভদের রহস্যভেদ পড়তে ভালো লাগে। বাস্তবে অপরাধী খুঁজে বের করতে পুলিশকে পরিশ্রম করতে হয়। তদন্তে নামার পর অনেক সময় ক্লু হারিয়ে যায়। সেই ক্লু খুঁজে বের করেন ফোরেনসিক বিশেষজ্ঞরা। এমন কিছু কেস এখানে তুলে দেওয়া হল, যেগুলির অপরাধী ফোরেনসিক ল্যাবরেটরিতেই ধরা পড়েছে। এ ছাড়াও থাকছে একাধিক ইন্টারেস্টিং কেস। আগামী জানুয়ারি ২০২১ সংখ্যা থেকে শুরু হবে এই ধারাবাহিক। লিখছেন **নিখিলেশ রায়চৌধুরী**।

করোনা আবহে এবার হল না
বেলডাঙ্গার ঐতিহ্যবাহী গণ উৎসব কার্তিক লড়াই

জাহির রায়হান

বাড়ি যাওয়ার পথেই পড়ে বুড়োশিবতলা। মন্দির এবং পাশে একটা ছোট পুষ্করিণী। এখানেই দাপট দেখান বাথান গোড়ের বুড়োশিব। সারা বছর নির্ঘন্ট অনুযায়ী সব পুজোর আয়োজন হলেও, বুড়োশিবের কদর আলাদা বেলডাঙ্গায়। কাঠামো গড়া থেকে লড়াইয়ের দিন অগ্রদূতের ভূমিকায় তিনি অনবদ্য।

আনত নয়নে, ভাঁজ করে রাখা হাঁটুর ওপরে এক হাত রেখে আমেজ নিয়ে ভাবগম্ভীর বসে থাকেন তিনি। অমায়িক প্রশান্তি তাঁর সমগ্র মুখমন্ডলে। স্কুল যাওয়া আসার পথে দেখতাম আর ভাবতাম, ভক্তকুলের পূজার্চনায় সন্তুষ্ট হয়ে এই পাহাড় প্রমাণ শরীর নিয়ে গা ছাড়া দিয়ে যদি তিনি উঠে দাঁড়ান হঠাৎ, তাহলে কী হবে!

মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গা শহরে, বুড়োশিব ও কার্তিক লড়াই স্থানীয় লোক উৎসব। প্রতি বাংলা বছরের ১লা অগ্রহায়ণ বহু মানুষের সমাগমে অনুষ্ঠিত হয় এই পার্বণ। বুড়োশিব, হাতি কার্তিক, বাবু কার্তিক এবং অন্যান্য বহুবিধ ঠাকুর দেবতা পূজিত হন একযোগে কার্তিক সংক্রান্তির দিন। বিসর্জনের দিন ভক্তবৃন্দের কাঁধে চেপে তাঁরা বের হন নগর পরিক্রমায়।

কাতারে কাতারে লোক রাস্তার দু'ধারে, বাড়ির ছাদে, এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে উপভোগ করেন দেবতাদের রক্তপাতহীন সেই লড়াই। স্থানীয় প্রশাসন সব ধরণের প্রস্তুতি সেরে রাখে নির্দিষ্ট এই দিনটির জন্য। রাস্তার দখল নেন নানান আকৃতির ও নানা প্রকৃতির দেব-দেবী। কখনও কখনও সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে পড়েন তাঁরা। হয়ত রাস্তা আগলে কোন কারণে দাঁড়িয়ে গেছেন কোনও ভগবান, কাজেই অন্যান্য দেবতাদের তখন অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় থাকে না।

বুড়োশিবের শহর পরিক্রমা শেষ হলে, ধীরে ধীরে পাতলা হতে থাকে ভিড়। বিদ্যুৎ ফিরে আসে শহরে। বাড়িমুখো হয় সমাগত হাসিখুশি জনতা। সব ভালয় ভালয় মিটলে প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিদের মুখে ধরা পড়ে চওড়া হাসি। অপেক্ষা শুরু হয় পরের বছরের জন্য।

অগ্রহায়ণ মাসের এই গণ উদ্দীপনার সর্বজন পরিচিতি 'কার্তিক লড়াই' হলেও, এই উৎসবের মূল আকর্ষণ বাবা বুড়োশিব যা বাথান গোড়ের শিব নামে অতীব জনপ্রিয় জেলাজুড়ে। বেলডাঙ্গায় বুড়োশিব পুজোর প্রচলনের ইতিহাস ঘাঁটলে জানা যায়, এই অঞ্চলে মৃন্ময় প্রতিমায় শিব পুজো সর্বপ্রথম শুরু হয় গো-পালক ঘোষ সম্প্রদায়ের হাত ধরে। আরও জানা যায় যে, সত্তরের দশক পর্যন্ত বেলডাঙ্গার ঘোষেরা মাঘ থেকে চৈত্র এই তিন মাস তৃণভূমির খোঁজে ইতিউতি গমন করত। গবাদি পশুর পাল নিয়ে গো-চারণের

উদ্দেশ্যে স্থানান্তরে গিয়ে বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে এইরূপ অবস্থান করাকেই বলা হত 'বাথান'। 'গোড়ে' বলতে মূলত সুগভীর পুকুর বা জলাশয়কে বোঝানো হয়। ঘোষেরা নিজেদের প্রয়োজনে অথবা গরু-মহিষের জলপান বা স্নানকার্যের জন্য হয়ত বা পুকুর অর্থাৎ গোড়ের খনন করেছিল। বাথান পার্শ্ববর্তী গোড়ে তাই একত্রে 'বাথান গোড়ে' বলে উচ্চারিত হয়। বাড়িঘর থেকে দূরে নির্জন এই বাথান বা গো-চারণ ভূমিতে অবস্থান কালে নিজেদের আনন্দদান বা আত্ম মনোরঞ্জনের অভিপ্রায়েই শিব পুজোর প্রচলন হয় সম্ভবত। নিজেদের স্বতঃসিদ্ধ কল্পনা প্রবণতা থেকেই তাদের আরাধ্য শিব ঠাকুরের গঠন শৈলীতে শিথিল ভঙ্গিমার নির্মাণ হয়ে থাকবে। বাম হাতে পিছন পানে ঠেস দিয়ে, ডান হাঁটু খাড়া এবং তার উপর ডান হাত লম্বা করে রাখা। তাগড়াই গোঁফ, চোখ দুটি নির্মীলিত, তন্দ্রাচ্ছন্ন। অতীত থেকে আজকের বর্তমান সময়েও বুড়োশিবের আদল ও অবয়ব একই রকম, অপরিবর্তনীয়।

এ কথা আমরা কম বেশি সকলেই জানি যে, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ মতে ছয়জন ধাত্রী বা কৃত্তিকা শরবনস্থিত সদ্যজাত কার্তিককে স্তন্যদান সহযোগে লালন পালন করে। কৃত্তিকা লালিত বলে নবজাতকের নাম হয় 'কার্তিকেয়'। বঙ্গে অতীতের বাবু সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় কার্তিক পুজোর সূচনা হয় বারনারীদের মাধ্যমে। ধীরে ধীরে তা অন্যান্যদেরও আকর্ষণ করে।

বেলডাঙ্গায় বুড়োশিব পুজোর প্রচলনের ইতিহাস ঘাঁটলে জানা যায়, এই অঞ্চলে মৃন্ময় প্রতিমায় শিব পুজো সর্বপ্রথম শুরু হয় গো-পালক ঘোষ সম্প্রদায়ের হাত ধরে। আরও জানা যায় যে, সত্তরের দশক পর্যন্ত বেলডাঙ্গার ঘোষেরা মাঘ থেকে চৈত্র এই তিন মাস তৃণভূমির খোঁজে ইতিউতি গমন করত। গবাদি পশুর পাল নিয়ে গো-চারণের উদ্দেশ্যে স্থানান্তরে গিয়ে বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে এইরূপ অবস্থান করাকেই বলা হত 'বাথান'।

প্রকাশিত হল

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

আত্মপরিচয় 395/-

'জার্নালের মতো করে নিজের ধ্যানধারণা ভাবনাচিন্তা এমনকি স্মৃতি সংলগ্ন কিছু বিষয় নিয়ে দৈনিকের রবিবারের পাতায় মাঝে মাঝে কিছু লেখা প্রকাশ পেয়েছিল। সেগুলি গ্রন্থরূপে প্রকাশ করার আগ্রহ ক্বচিৎ কখনও আন্দোলিত হলেও অনেকদিন অবধি এটিকে গ্রন্থ হিসেবে প্রকাশ করা হয়ে ওঠেনি।'

সমরেশ মজুমদার

সরাসরি পাণ্ডুলিপি থেকে

হায় সজনি

চূড়ান্ত রোম্যান্টিক উপন্যাস 199/-

উত্তরবঙ্গে প্রাপ্তিস্থান: ডুয়ার্স বুকস ডট কম, সনাতন অ্যাপার্টমেন্ট, পাহাড়ি পাড়া, কদমতলা, জলপাইগুড়ি ৭৩৫১০১, হোম ডেলিভারি ফোন ৬২৯৭৭৩১১৮৮

বিসর্জনের শোভাযাত্রা ও ঠাকুর নিয়ে জাঁক-জমকের সাথে নগর পরিক্রমা এই পুজোর অঙ্গ হয়ে ওঠে অচিরেই। তবে কার্তিক সংক্রান্তিতে কার্তিকের আরাধনা হবে এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা কিন্তু ঐ দিন বেলডাঙ্গায় শিব পুজো কীভাবে এবং কবে থেকে হয়ে আসছে তা সঠিকভাবে জানা যায় না। আবার এ শহরে কার্তিক লড়াই কীভাবে প্রচলিত হল তার সঠিক ব্যাখ্যাও পাওয়া মুশকিল। কেউ কেউ মনে করেন পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়ার কার্তিক লড়াইয়ের অনুকরণেই শুরু হয়েছে বেলডাঙ্গার এই গণ উৎসব। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গে হুগলি জেলাস্থিত চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজা বা নদিয়া জেলার নবদ্বীপ ও শান্তিপুরের রাসের মতই কাটোয়ার কার্তিক লড়াই সুবিদিত। মূলত কার্তিক ঠাকুরের ভাসান বা বিসর্জনের শোভাযাত্রাকেই লড়াই বলা হয়। শোভাযাত্রা দর্শনে আসা অগণিত মানুষের ঠেলাঠেলি, দোকান পসার, লোক লস্কর, হাঁক ডাক, ভিড়ভারাক্কা তৈরি করে লড়াই সদৃশ আবহ। আবার ধুমধামের শোভাযাত্রায় বিভিন্ন পুজো উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার ও অগ্রগমনের তৎপরতায় প্রায়শই যে ঝঞ্ঝাট বেঁধে যায় নিজেদের মধ্যে, তার কারণেও 'কার্তিক লড়াই' শব্দ যুগলের প্রচলনও হয়ে থাকতে পারে।

পুজোর প্রচলন, উদ্দেশ্য এবং সূচনা পর্বের সময় নিয়ে মতভেদ থাকলেও, এই পুজো এবং বিসর্জনের শোভাযাত্রায় গণ মানুষের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহন, জমায়েত ও উদযাপনের প্রসঙ্গটি অনস্বীকার্য। দুর্গাপুজোর পরিসমাপ্তির পর পরই বেলডাঙ্গার ছোট বড় পুজো কমিটিগুলি লড়াইয়ের দিনের প্রস্তুতি শুরু করে। স্থানীয় বাসিন্দাদের আলাপ আলোচনায় বুড়োশিব ও কার্তিক লড়াই আসতে থাকে ঘুরে ফিরে। আত্মীয় পরিজন বা শ্বশুরঘরে থাকা বেলডাঙ্গা জাত বিবাহিতা কন্যারত্নের দল বাপের বাড়ি ফেরার দিন গুনতে থাকে। আত্মীয় অনাত্মীয় অনেকেই ঐ দিন বেলডাঙ্গায় আসার আগ্রহ প্রকাশ করে। সকলের আগ্রহ ও যোগদানে কার্তিক লড়াই পরিণত হয় মিলন উৎসবে। তবে নামে 'কার্তিক লড়াই' হলেও ঐ দিনের লড়াইয়ে দেখা যায় শিব মূর্তিরই আধিক্য। ছোট বড় নানা আকৃতির, নানা আদলের, ভৈরবসহ নানা রূপের

শিব দখল নেয় জনপথের। তার সঙ্গে পথের শোভা বাড়ায় হাতির পিঠে উপবিষ্ট হাতি কার্তিক। সৌম্যদর্শন বাবু কার্তিকও আসে খোকাবাবুদের কাঁধে চড়ে। এছাড়াও অন্য দেব-দেবীরও দেখা মেলে লড়াইয়ের ময়দানে। কমলা কামিনী, ভারত মাতা, নটরাজ, নবদুর্গার পাশাপাশি উৎসাহীদের দ্বারা লড়াইয়ে সামিল হন গণেশ, রাম, চৈতন্যদেব এমনকি ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও। সব মিলে বৈচিত্র্য বাড়ে উৎসবের, উপভোগ্য হয়ে ওঠে আনন্দযাপন।

গণ উন্মাদনার কবলে পড়ে বেলডাঙ্গা শহরের অলিগলিতে তিল ধারণের জায়গা থাকে না সেদিন। এতদ্বঞ্চল ও পার্শবর্তী গ্রামগুলির ছেলে বুড়ো, নর-নারী পিল পিল করে ভিড় জমায় শহরে। মেলা বসে। খই মুড়কি ও জিভে গজার দোকানে দোকানে চলে দেদার বেচাকেনা। মেজাজে ও মাতোয়ারায় ধর্ম ভুলে, সম্প্রদায় ভুলে আগত দর্শনার্থী ও স্থানীয় বাসিন্দারা মেতে ওঠে আনন্দ উৎসবে। হঠাৎই দেখা যায় ভক্তদের কাঁধে চড়ে ছুটে আসছে বাবা ভোলানাথ। হইহই রব ওঠে, রাস্তা ছেড়ে দেয় জনগণ। ওদিকে কখনও কখনও কোন প্রতিমা বসে পড়ে মাঝ রাস্তায় ফলে রাস্তা জুড়ে লেগে যায় মূর্তির পর মূর্তির অগাণিতিক জট। কে আগে যাবে, কে যাবে পরে তা নিয়ে দড়ি টানাটানি চলতে থাকে যুযুধান ভক্তকুলের মধ্যে। শেষে প্রশাসনিক হস্তক্ষেপে, আব্দার অনুরোধে একটু একটু করে জট ছাড়ে। ইতিমধ্যেই মাইকে ঘোষিত হয় নেতাজি পার্ক বা বাজার পাড়া পার করেছে বাথান গোড়ের বুড়োশিব। ঘোষণা শুনেই মা মাসীরা কপালে হাত ঠেকায় ভক্তিভরে। উপস্থিত সকলের দৃষ্টি তখন বুড়োশিবের অপেক্ষায়। দাপটের সঙ্গে রণাঙ্গনে আবির্ভূত হন বাবা বুড়োশিব, অন্য প্রতিমা বাহকরা তাঁর রাস্তা ফাঁকা করে দেওয়ার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বাথান গোড়ের বুড়োশিব চলে যাওয়ার পর স্তিমিত হতে থাকে মানুষের উৎসাহ। ক্রমশ কমতে থাকে হাঁকডাক, ঠেলাঠেলি। ঘর মুখো হয় জনস্রোত। উৎসব শেষ হয়, শুরু হয় পরের বছরের আকুল অপেক্ষা।।

করোনা মহামারির কারণে এই বছরে কার্তিক লড়াইয়ের জন্য প্রশাসনিক অনুমতি মেলে নি। উৎসব না হওয়াটা বেলডাঙ্গাবাসী হিসেবে বড়ই দুঃখের। চলো আসছে বছর আবার হবে!

জলদাপাড়ার ধারে তোর্ষা

এই ডুয়ার্স কি তোমার চেনা?

শৌভিক রায়

একটেরে মিষ্টির দোকানটির সামনে দাঁড়িয়ে একটিবারও মনে হয় না যে, এই দোকানের কমলাভোগের জন্য দূরদূরান্ত থেকে লোকজন ছুটে আসে। দুপুর গড়াতে না গড়াতেই শেষ হয়ে যায় সেই মিষ্টি। অবশ্য শেষ হওয়ার কারণ শুধুমাত্র ব্যাপক চাহিদাই নয়, স্বল্প সংখ্যাও অন্যতম কারণ। দোকানের বর্তমান মালিক জানাচ্ছেন যে, গুণমানের সঙ্গে কোনও আপোষ করতে তারা রাজি নন। প্রয়োজনে ওই মিষ্টি বানাবেন না, কিন্তু লোকে যেন বলতে না পারে যে, কমলাভোগের স্বাদ বদলে গেছে। তাই প্রয়াত ননী পাল মহাশয়ের আমল থেকে টোটোপাড়ার কমলালেবুর খোসা দিয়ে এই বিশেষ মিষ্টি বানানোর সেই চল আজও রয়ে গেছে। কিন্তু কমলালেবু তো পাওয়া যায় একমাত্র শীতকালে। বাকি সময়? জানা গেল যে, শীতকাল থেকেই খোসা বাক্সবন্দী করা হয় এবং সে জন্য কেনা হয় সারা বছর চলে যাবে এরকম সংখ্যক কমলালেবু। তবে মাথায় রাখতে হয় নষ্ট হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটিও। ফলে চাহিদা বা ইচ্ছে থাকলেও প্রচুর সংখ্যক মিষ্টি তৈরি করা সম্ভব না। প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মিষ্টিই তৈরি হয়। যে খায় তার মুখে কাঠ ফাটা গ্রীষ্মেও লেগে থাকে

টোটোপাড়ার কমলালেবুর স্বাদ। পর্যটনের পাশাপাশি, এই কমলাভোগের জন্যও আজকাল লোকজন ভীড় জমাচ্ছে ডুয়ার্সের এই ছোট্ট জনপদে।

একসময় কমলালেবুর বিরাট বাজার বসত এখানে। বিশেষ করে টোটোপাড়া থেকে প্রচুর পরিমাণ কমলালেবু আসত সেই বাজারে।

ওয়েস্টার্ন ডুয়ার্স ফান্ড মার্কেট ছিল বিক্রির জায়গা এবং তা স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে এই জনপদ ধীরে ধীরে বদলাতে শুরু করেছিল। বাড়তে শুরু করেছিল জনসংখ্যা। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আজ একটি অত্যন্ত পরিচিত নামে এই জায়গাটি। একটা সময় প্রখ্যাত লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি কিশোর উপন্যাসে এখানে গল্পের ক্লাইম্যাক্স ঘটেছিল। উপন্যাসের ছোট্ট ছেলেটি স্বপ্ন দেখেছিল যে, ব্যাংক ডাকাতের গুলিতে নিহত দ্বাররক্ষী তাকে বলছে, সেই দুষ্কৃতীরা 'মা দাঁড়িয়ে' নামের কোনও একটি জায়গায় লুকিয়ে রয়েছে। পরবর্তীতে সেই ব্যাংক ডাকাতদের ধরা হয় উত্তরের বিখ্যাত 'মাদারিহাট' থেকে।

লেখকের কল্পনায় স্থানটির নাম 'মা দাঁড়িয়ে' থেকে এলেও, স্থাননামের ইতিহাস অবশ্য বলছে অন্য কথা। একসময় মাদারী সম্প্রদায়ের মানুষদের দেখা যেত এই অঞ্চলে। ফকির সুফি সম্প্রদায়ের এই মানুষেরা নানা ধরণের খেলা দেখাতেন। সম্ভবত তার থেকেই নামটি এসে থাকবে। আবার মাদার গাছ বা মন্দার গাছ থেকেও স্থানটির নাম এসে থাকতে পারে বলে অনেকে মনে করেন। ওয়েস্টার্ন ডুয়ার্সের ফান্ড মার্কেট তৈরি হওয়ার আগে থেকে এই অঞ্চলে মাদার বা মন্দার গাছের নিচে বসা হাট থেকে আজকের মাদারিহাট- এই তথ্যটিও গুরুত্বপূর্ণ। যতই মহাকবি বলুন না কেন 'নামে কী এসে যায়', অন্তত স্থাননামের পেছনে লুকিয়ে থাকে কোনও না কোনও ইতিহাস। ডুয়ার্সের খাসতালুক মাদারিহাট সেটাই যেন প্রমাণ করছে। শুধু মাদারিহাট কেন, কাছের রাঙ্গালিবাজনার নামের পেছনে রয়েছে জোতদার রাঙ্গালি মেচের নাম। মেচ সম্প্রদায়ের জাঁকজমক বোঝাতে বাজনা শব্দটি যুক্ত হয়েছে। সংলগ্ন পৃথিবীবিখ্যাত জলদাপাড়ার নামও এসেছে প্রাচীন জলদা গোষ্ঠীর মানুষদের থেকে। কালের নিয়মে তারা আজ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়লেও একসময় তাদের আধিপত্য ছিল এই অঞ্চলে। একইভাবে টোটোপাড়ার পেছনে আছে টোটো সম্প্রদায়ের মানুষদের বাসস্থানের কথা।

আজকের মাদারিহাট বীরপাড়াকে সঙ্গী করে ৩৮০.৯৬ বর্গ কিমির ব্লক হলেও জনসংখ্যার দিক থেকে বেশ কিছুটা পিছিয়ে। খুব স্বাভাবিক সেটি। কেননা এই

ননী পালের দোকান

ব্লকের অনেকটাই ডুয়ার্সের সবুজ অরণ্যে ঢাকা। তার মধ্যে রয়েছে ভুবনবিখ্যাত জলদাপাড়া অভয়ারণ্য। একশৃঙ্গ গন্ডারের আবাসভূমি জলদাপাড়ার ৯৯.৫১ বর্গ কিমি বক্সা বন বিভাগের অধীনে, ১৯৪১ সালে, গেম স্যাংচুয়ারির মর্যাদা পায়। একশৃঙ্গ গণ্ডারকে তখন থেকেই সংরক্ষণের জন্য আইন করা হয়েছিল। ১৯৫১ সালে বনবিভাগের কোচবিহার ডিভিশন তৈরি হলে জলদাপাড়া সেই ডিভিশনের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৭৬ সালে অরণ্যের বৃদ্ধি হয় ১১৫.৫৩ বর্গ কিমি পর্যন্ত। ১৯৯০ সালে আরও ১০০ বর্গ কিমি নেওয়া হয়। ২০১২ সালে জলদাপাড়া ন্যাশনাল পার্ক হিসেবে ঘোষিত হয়। ২০১৯ সালের গণনায় জলদাপাড়া ও লাটাগুড়ি মিলে পশ্চিমবঙ্গে ২৮৯টি গন্ডার রয়েছে, সারা পৃথিবীতে এই সংখ্যাটি ৩৫৫০। মাদারিহাট সংলগ্ন জলদাপাড়ার পাললিক তৃণভূমি ও নদী বনভূমি জিআইওএইচ প্রজাতির গন্ডারের জন্য আদর্শ বলে, জলদাপাড়ায় গন্ডারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২১৬ বর্গকিমির এই বনভূমির ভেতর দিয়ে প্রবাহিত তোর্ষা, মালঙ্গী, হলং, চিড়াখাওয়া, শিশামারা, ভালুকা, বুড়ি তোর্ষা। রয়েছে হাতি, হরিণ, হগ ডিয়ার, বাইসনের মত প্রাণী, ক্রেইত, কোবরা, পাইথনের মত সরীসৃপ। জলদাপাড়ায় দেখা যায় হর্নবিল, ক্রেস্টেড ঈগল, ফ্লোরিক্যান, কাঠঠোকরা, ময়ূর ইত্যাদি প্রায় ২৪০ প্রজাতির পাখি।

বিভিন্ন দিক থেকে প্রবেশ করা যায় এই বনাঞ্চলে। তবে মাদারিহাট দিয়ে হলং টুরিস্ট লজে পৌঁছনোটাই রেওয়াজ। অন্যদিকে পূর্ব জলদাপাড়া দেখতেও আজকাল শালকুমার অঞ্চলে ভিড় জমাচ্ছেন পর্যটকেরা। বিশেষ করে শালকুমারের দিক থেকে প্রবেশ করে, শিশামারা নদী ও তার পার্শ্ববর্তী অরণ্যভূমি দেখা যেন 'ভার্জিন স্পট'কে প্রত্যক্ষ করা।

মুজনাই শিবমন্দির

আর্যমান চা-বাগান

মাদারিহাট কিন্তু আলিপুরদুয়ার জেলার একদম ভরকেন্দ্রে দাঁড়িয়ে যেন! এখান থেকে ডুয়ার্সের সব কিছুই যেন হাতের নাগালে। জগৎবিখ্যাত টোটোপাড়ার দূরত্ব ২৫কিমি। হাসিমারা হয়ে ভুটানের ফুন্টশেলিংও ৩০কিমি। একদিকে ফালাকাটা ২৪কিমি, অন্যদিকে বীরপাড়াও খুব কাছে। বীরপাড়া পথে সামান্য এগোতে রাঙালিবাজনা বা শিশুবাড়ি থেকে উত্তরমুখী ডান দিকের পথে, উত্তরের পর্যটন মানচিত্রে রহস্যময় বলে পরিচিত মুজনাই নদী ও চা-বাগান।

এখানে প্রায়শই দেখতে পাওয়া যায় অরণ্যচারীরা হাতি, বাইসন, গন্ডারদের। জলদাপাড়ার পশ্চিমে খয়েরবাড়িও অফবিট একটি জায়গা। মাদারিহাট থেকে ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে দশ-বারো কিমির বনপথে দক্ষিণ খায়েরবাড়ি চলা এক অসামান্য অভিজ্ঞতা। যদিও হাতি-সহ অন্য বন্যপ্রাণের জন্য মাদারিহাট-ফালাকাটা রাজ্যসড়ক পথটি সুরক্ষিত। জলদাপাড়ার দক্ষিণেই রয়েছে কুঞ্জনগর নামের ছিমছাম নেচার পার্কটি। অবশ্য কুঞ্জনগর ও দক্ষিণ খয়েরবাড়ি ফালাকাটার কাছাকাছি বলে, ফালাকাটা থেকে যাওয়াই সুবিধে। জলদাপাড়ায় এলিফ্যান্ট সাফারি বা কার সাফারিতে দেখা যায় গন্ডার-সহ নানা প্রাণী। হলং টুরিস্ট লজের সামনের ঝোরায় রাতের বেলায় জল খেতে আসে নানা প্রাণী। চাঁদনী রাতে জলদাপাড়া যে সুন্দর রূপোলি

মাদারিহাট

পোশাক পরে তাতে এক অনির্বচনীয় অপার্থিব আনন্দে তিরতির করে সমস্ত মনপ্রাণ।

জলদাপাড়ার মাঝে বয়ে চলা তোর্ষার পুবে চিলাপাতা রেঞ্জও কিন্তু কম আকর্ষক নয়। অতীতে চিলাপাতা এতটাই গভীর ছিল যে, এখানকার মাটিতে সত্যিই আলো পড়ত না। গা ঘেঁষাঘেষি করে দাঁড়িয়ে থাকত বৃক্ষেরা। তাদের জাপটে ধরত বনজ লতারা। অরণ্যে বিপদ তো ছিলই, অরণ্য চিরে চলে যাওয়া পথও ছিল বিপদসঙ্কুল। এখন বন্য প্রাণীদের দেখা অকস্মাৎ মিললেও, হালকা হয়েছে অরণ্য। তবু জঙ্গল পথে গিয়ে তোর্ষার তীরে দাঁড়ালে বড় বড় ঘাসের মাঝে, বিশেষ করে নদীর ওপারে, দেখা মিলতে পারে গন্ডারের। হাতি তো রয়েইছে। চিতাবাঘ, হরিণ যেমন মাটিতে তেমনি আকাশে মেলে নানা প্রজাতির পাখির দেখা। চিলাপাতার অরণ্য মাঝে নলরাজার গড় সেরা আকর্ষণ। মেন্দাবাড়ি, কোদালবস্তি, পোরো বনবস্তিরও হাতছানি কম নয়। আর অরণ্যের ভেতর পাড়ি দেওয়ার এত দীর্ঘ পথ উত্তরে বোধহয় আর নেই। জঙ্গলের নিস্তব্ধ ভাবটি আজও যায় নি। দিনের বেলাতে ঝিঁঝিঁর আর রাতে বন্যপ্রাণের ডাক সেই নিস্তব্ধতাকে আরও বাড়িয়ে দেয়। ছমছম করে ওঠে গা।

আর জলদাপাড়ার নিজের শহর ছোট্ট মাদারিহাট ছবির মতই সুন্দর। ডুয়ার্সের কসমোপলিটান পরিবেশ এখানেও। বাঙালি, বিহারী, মারোয়ারি, পাঞ্জাবি, নেপালি সম্প্রদায়ের মানুষের পাশাপাশি রয়েছে আদি জনজাতির মানুষ। উল্লেখ্য, নৃতত্ত্ববিদরা ডুয়ার্সের জনজাতি মানুষকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন- ব্ল্যাক ট্রাইবাল ও হোয়াইট ট্রাইবাল। আসলে ডুয়ার্সে যখন একের পর এক চা-বাগান পত্তন হচ্ছিল তখন এখানকার গভীর আদিম অরণ্য কেটে চা-বাগান তৈরির কাজে বাইরে থেকে শ্রমিক শ্রেণীকে আনা হয়েছিল। ছোটনাগপুর অঞ্চল থেকে আসা শ্রমিকদের গায়ের রং কালো ছিল বলে তারা ব্ল্যাক ট্রাইবাল বলে পরিচিত, অন্যদিকে নেপাল থেকে আসা শ্রমিকেরা তুলনায় ফর্সা হওয়ায় তাদের সাদা রঙের জনজাতি বা হোয়াইট ট্রাইবাল বলা হয়ে থাকে। এখানে আর একটি কথা বলা যেতে পারে যে, ডুয়ার্স-সহ উত্তরের স্থানীয় মানুষদের কিন্তু চা-বাগানে অন্তত শ্রমিকের কাজ করতে দেখা যায় না। পৃথিবীর আর কোনও জায়গায় এরকমটি হয় নি। যেখানেই চা-বাগান প্রতিষ্ঠা হয়েছে সেখানেই স্থানীয় মানুষেরা চা-বাগান তৈরির কাজে হাত লাগিয়েছেন। কিন্তু কেন উত্তরের রাজবংশী, মেচ, রাভা ইত্যাদি জনজাতির মানুষেরা চা-বাগানের কাজে যোগ দিলেন না, তার কারণ নির্দিষ্ট করে বলা না গেলেও, মনে করা হয় যে, অরণ্যভূমি ধ্বংস করে চা-বাগান এবং তৎসহ জনপদ প্রতিষ্ঠাকে সম্ভবত তারা ভাল চোখে দেখেন নি। ফলে চা-বলয় থেকে তারা দূরে সরে ছিলেন। মাদারিহাটকে ঘিরে আর্যমান, বাঙ্গাবাড়ি, মুজনাই ইত্যাদি যেসব চা-বাগান দেখা যায়, সেখানেও এই একই কথা প্রযোজ্য।

মাদারিহাট কিন্তু আলিপুরদুয়ার জেলার একদম ভরকেন্দ্রে দাঁড়িয়ে যেন! এখান থেকে ডুয়ার্সের সব কিছুই যেন হাতের নাগালে। জগৎবিখ্যাত টোটোপাড়ার দূরত্ব ২৫কিমি। হাসিমারা হয়ে ভুটানের ফুন্টশেলিংও ৩০কিমি। একদিকে ফালাকাটা ২৪কিমি, অন্যদিকে বীরপাড়াও খুব কাছে। বীরপাড়া পথে সামান্য এগোতে রাঙালিবাজনা বা শিশুবাড়ি থেকে উত্তরমুখী ডান দিকের পথে, উত্তরের পর্যটন মানচিত্রে রহস্যময় বলে পরিচিত মুজনাই নদী ও চা-বাগান। অবশ্য মাদারিহাট টোটোপাড়া পথে বাঙ্গাবাড়ি থেকেও আসা যায় এখানে। চা-বাগানটি অত্যন্ত প্রাচীন। সম্ভবত এই চা-বাগানের চা অন্যত্র পাঠানোর জন্য ১৯০৫ সালে ব্রিটিশ ডুয়ার্স রেলওয়ের সম্প্রসারণের সময় শিশুবাড়িতে যে স্টেশন তৈরি করা হয়, তার নাম দেওয়া হয় মুজনাই। উঁচু টিলার ওপর অবস্থিত এই চা-বাগানটি চা-বলয়ে বিশেষভাবে পরিচিত ক্রমাগত তার মালিকানা হাতবদলের জন্য। মুজনাই চা-বাগানের কুলি লাইন পার করে, উঁচু টিলার ঠিক পাশেই, রয়েছে বেশ কিছু প্রস্রবণ। মাটির তলা থেকে অনবরত বেরিয়ে আসা জল স্থানীয় মানুষদের যেমন জলের উৎস, তেমনি জলঢাকার প্রধান উপনদী মুজনাইও এই জলেই সারা বছর পুষ্ট। মুজনাইয়ের উৎস নিয়ে বিতর্ক থাকলেও, নিঃসন্দেহে এই কথা বলা যায় যে, এই প্রস্রবণগুলির জল মুজনাইকে সারা বছর জলের যোগান দেয়। একথা জোর দিয়ে

বলা যায়, কেননা মুজনাই চা-বাগান বা টোটোপাড়া যেতে আজও এমন কিছু নদী পার হতে হয় যেগুলি সারা বছর জলহীন শুকনো খাত ছাড়া আর কিছু নয়। শুখা নদী নামেও এদের পরিচয় রয়েছে। মুজনাইয়ের যাত্রাপথে পরবর্তীতে কিছু নামহীন প্রবাহ ও অন্যান্য ছোট নদী অঙ্গীকৃত হলেও প্রাথমিক জলের উৎস কিন্তু এই প্রস্রবণগুলি। ডুয়ার্সের আরও কিছু জায়গায় এরকম প্রস্রবণ দেখা যায়, যেগুলি ছোট ছোট নদীর স্মৃতি করেছে। দুর্ভাগ্য আমাদের যে, এখনও সে সমস্ত প্রস্রবণ ও নদীগুলি নিয়ে সেভাবে কোনও সমীক্ষা হল না। মুজনাইকে রহস্যময় বলা হয়ে থাকে এই কারণেই।

আবার এক সময়ে ঘড়িয়ালের কিংবা বর্তমানেও বাতাগুড় বাসকা নামের বিরল প্রজাতির কচ্ছপের উপস্থিতিও এই নদীকে আর পাঁচটা নদীর থেকে আলাদা করেছে। প্রস্রবণের পাশেই টিলার ওপর রয়েছে শিবমন্দির। ফেব্রুয়ারি মাসে মন্দির ঘিরে বিরাট মেলাটিও এখানকার অন্যতম আকর্ষণ। সত্যি বলতে মুজনাইয়ের যাত্রাপথে বিভিন্ন স্থানে শিব বা মহাকালের উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়। এই নদীর খুব কাছে জটেশ্বর জায়গাটির নামের মধ্যেই যেমন মহাদেবকে পাওয়া যায়, তেমনি এখানকার প্রাচীন মন্দির বা ফালাকাটায় নদীর তীরে মহাকাল মন্দির সবই যেন একটি দিক নির্দেশ করে যে, এই নদী যেন মহাদেবের একান্তই নিজস্ব। মাদারিহাট থেকে রাঙালিবাজনা পার করে মুজনাই যেতে পথের দুধারে যে মানুষদের দেখা যায় তারাও অনেকেই শৈব ধর্মে বিশ্বাসী। সব মিলে মুজনাইয়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর রহস্যময়তা আজকের মাদারিহাটকে অন্য পরিচয় দিচ্ছে। একসময় মুজনাই থেকে মাদারিহাট সড়ক পথে মোটর যোগাযোগ ছিল। খুব কাছের রাঙালিবাজনায় ১৯৪৮ সালে হীরালাল ভগতের দান করা জমিতে প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব মোহন সিং-এর নামে গড়ে উঠেছিল বিদ্যালয়। অন্যদিকে মাদারিহাটে ১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় উচ্চ বিদ্যালয়।

জাতীয় সড়কের ধারে অরণ্য আর পাহাড়ের রূপরেখা নিয়ে মাদারিহাট অদ্ভুত সুন্দর একটি জায়গা। নগর বিস্তার, ক্রমাগত পর্যটকদের আগমন এবং জলদাপাড়াকে কেন্দ্র করে চতুর্দিকে গড়ে ওঠা রিসর্ট, হোম স্টে আর হোটেলের ভিড়ে সেই আরণ্যক মাদারিহাট আজ অনেকটাই ম্লান। কিন্তু এখনও যে সম্পদ রয়েছে এই জনপদ ও তাকে ঘিরে কম নয় তাও। আসলে উন্নয়নের সঙ্গে পরিবেশের বিরোধ সভ্যতার একদম শুরু থেকেই। এটা মেনে নিয়ে যতটুকু দরকার ততটা বাস্তবায়িত করাটাই শ্রেয়। মাদারিহাট সেটা প্রমাণ করেছে। তাই আধুনিকতার ছোঁয়া নিয়েও সে নিজের মত ডুয়ার্সের বুকে একদম আলাদা, অনন্য। এখানে এলে সত্যিই মনে হয় যে, মা দাঁড়িয়ে আছে তার ক্লান্ত শ্রান্ত সন্তানকে শীতল স্পর্শ দিতে।

ছবি: লেখক

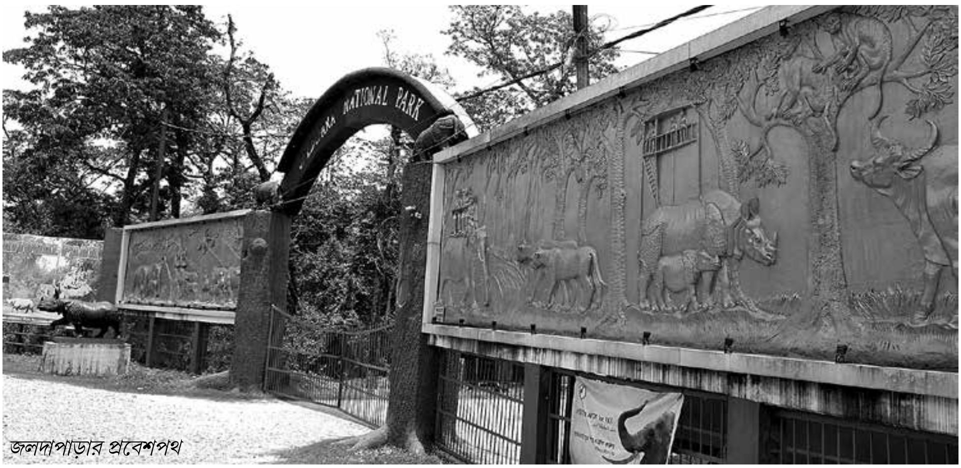

জলদাপাড়ার প্রবেশপথ

চা-বাগিচার জলসাঘর রংলি রংলিওট

মধুছন্দা মিত্র ঘোষ

এখানে আছে পাহাড়। আছে চা-বাগিচার ঝোপে মেঘ গুঁজে থাকা, মেদুর সবুজের জলসাঘর। আছে সহজ পাহাড়িয়া জনজীবন। আছে সবুজ আঁচল বিছানো চায়ের খেত। আর আছে সম্ভ্রম জাগানো নীরবতা। এখানে সবুজের কাছে শিখে নেওয়া যায় নীরবতার পাঠ। সবুজ হয়ে থাকে নিরহঙ্কারী, তেজদীপ্ত, গভীর। আরও কত কী যে আছে। পাহাড়ঢালে খেলনাবাড়ি ঘর-বসত, পাখির এন্তার কিচিরমিচির, চা-বাগানের ছায়া-গাছেদের মায়াভরা আচ্ছাদন, খুনসুটি-প্রবণ মিঠে হিমেল বাতাস, পশলা কয়েক আধভেজা ভোরের কুয়াশা, চা বাগিচার প্রকৃতি প্রাপ্তি, অন্যরকম ভাললাগা। প্রতিশ্রুতিময়। এইসব নিয়েই রংলি রংলিওটের চেনা সংসার। এখানে সন্ধ্যা নামলে, চা-বাগান চাঁদের আলো মাখে। সেই দূরের চাঁদের আলো চুঁইয়ে অবোধ চা অরণ্যের উঠোনে, শ্যামল বর্ণেও যে এমন রৌণক ধরা থাকে।

এখানে এসেই বুঝে গেছি, সবুজে ও নীলে কাড়াকাড়ি করছে প্রকৃতি। মেঘেরা হেলায় ছড়িয়ে দিচ্ছে সাদা রঙ। নিমেষে মুখর হল প্রকৃতির ক্যানভাস। দার্জিলিং হিমালয়ের গা-ছোঁয়া বেশ কয়েকটি আবছা শোনা, অল্প জানা, চিত্রলেখ পটভূমি আছে। যেখানে হেমন্ত এসে কড়া নাড়ে। যেখানে চায়ের বন আর মৃত্তিকার অনির্দিষ্ট প্রেম। প্রকৃতির রূপলোকে সবুজের গল্পগাছা নিয়ে একরাশ লাবণ্যে অপাঙ্গে এলিয়ে থাকে শ্যামল সুষমা। স্থির। চিত্রবৎ। উত্তরবঙ্গ ভ্রমণ মানচিত্রে এমনতর ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে কত নব্য বেড়ানোর জায়গা। কতটুকুই বা খোঁজ রাখি আমরা। অবশ্য একথাও ঠিক যে, ইদানিং বিভিন্ন ভ্রমণবৃত্তান্ত ও ইন্টারনেট ঘেঁটে আমরা অনেক নতুন নতুন পর্যটনস্থলের ঠিকানার খোঁজও পেয়ে যাই।

ভ্রমণরসিক মন এই খোঁজ না-খোঁজের দ্বিধা সরিয়ে আপাতত রংলি রংলিওট গ্রামটিকে মনের কুঠুরিতে ভরে নিচ্ছে। কুয়াশা ও রোদের অলস মেখে এলিয়ে এক পাহাড়ি হ্যামলেট রংলি রংলিওট। চা-বাগান ঘেরা একটা গ্রাম, কয়েকটা পাহাড়ি ঘরবাড়ি জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে। মধুর পাওনা এমন সবুজাভ এলাকাটির এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তের অসাধারণ দৃশ্য।

আজ একটু অন্যরকম একটা সকাল। প্রতিশ্রুতিময়। রংলি রংলিওটের গন্তব্যে গাড়ি চলেছে। রাতভর সফর শেষ করে কলকাতা-শিলিগুড়ি রয়্যাল ক্রুসার বাসটি যখন শিলিগুড়ির হিলকার্ট রোডের বাসস্টপেজে ভোর পৌঁনে

ছয়টায় পৌঁছে দিল, আমাদের আগে থেকে বুকিং করা গাড়িও ততক্ষণে হাজির। তারপর বহুবার আসা মহানন্দা ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি ভেতর দিয়ে জাতীয়সড়ক তথা সেবক রোড উজিয়ে, পেস্তা রঙা তিস্তা নদীকে পাশে নিয়ে চলেছি। এই পথটা, যখনই আসি কেমন এক মায়ার বাঁধনে জড়িয়ে রাখে। এরপর কালিঝোরা, লোহাপুল ব্রিজ পেরিয়েই সেবক বাজার এলাকায় পথের ডান পাশে, প্রিয়া হোটেল অ্যান্ড রেস্তোরাঁয় গাড়ি ভেরানো হল। এপথে যখনই আসি, সত্যম ছেত্রির এই রেস্তোরাঁয় একটু ফিল্টার কফি, মোমো বা আলু-পরোটা নিয়ে পছন্দমত প্রাতরাশ খেয়ে যাই। এদের রেস্তোরাঁর উন্মুক্ত জানলা দিয়ে পেছনে

মাথার ওপর তার উদার আকাশ। মখমলি সবুজের বন্যায় ভেসে যাচ্ছে এখানকার চরাচর। দিগন্ত বিস্তৃত চায়ের খেত। যেমন রূপ, তেমন গহীন। সূর্যের রশ্মিতে সে সবুজে লেগেছে জেল্লা। ঠাস বুনোট সবুজের গালিচা মোড়া যেন। ওপরে নীল আকাশ আর সাদা মেঘের যুগলবন্দী। নিচে নিশ্চিন্তে রংলি রংলিওটের ভূমিশয্যা।

তিস্তার রূপ বেশ ভাল লাগে দেখতে। প্রাতরাশ সেরে, আবার গাড়িতে। রাম্বিবাজার পেরিয়ে তিস্তা ব্রিজে ওঠার আগেই তিস্তাবাজার পাড় করে অর্ধচন্দ্রাকৃতি বেঁকে পাহাড়িপথ পেশক রোড ধরে চা-বাগানকে পাশে নিয়ে চলল। অসাধারণ সুন্দর পথ। চা-বাগান চিরে পথ এগিয়ে গেছে। মাথার ওপর নীল আকাশ। যেন পিকচার পোস্টকার্ড। ধাপে ধাপে চা-বাগান পাশে নিয়ে সর্পিল পাকদণ্ডির মত বাঁক খেয়ে উঠেছে পথ। তাকদা পেরিয়ে তিনচুলে-লোপচু রোড। আমাদের রাতঠিকানা অবশ্য, 'তাকদা হেরিটেজ কলোনিয়াল বাংলোতে'। তাকদা থেকে রংলি রংলিওট আরও মাত্র ৯.২ কিলোমিটার। টাকলিং থেকে আরও খানিক এগিয়ে মসৃণ পথটা চলল রংলির দিকে। এই হেমন্তের সকালে পথঘাট আপাদমস্তক কুয়াশার চাদর জড়িয়ে এক্কেবারে সুনসান। সিমেন্টে বাঁধানো বিজ্ঞপ্তিফলকে লেখা 'রংলি রংলিওট টি গার্ডেন— ডানকান টি'।

এই সময়ে রোদে ঘুম লেগে থাকে। জলপাই সবুজ রঙা চা-বাগানের ঢাল গড়িয়ে এসে থমকে গেছে পথের ধারে। মাথার ওপর তার উদার আকাশ। মখমলি সবুজের বন্যায় ভেসে যাচ্ছে এখানকার চরাচর। দিগন্ত বিস্তৃত চায়ের খেত। যেমন রূপ, তেমন গহীন। সূর্যের রশ্মিতে সে সবুজে লেগেছে জেল্লা। ঠাস বুনোট সবুজের গালিচা মোড়া যেন। ওপরে নীল আকাশ আর সাদা মেঘের যুগলবন্দী। নিচে নিশ্চিন্তে রংলি রংলিওটের ভূমিশয্যা। ঘন ঘোর সবুজ চা-বাগানে মেঘ আর রোদের খেলা। আর সবুজ চমক। মাঝে মাঝে ঝুপসি ছায়াগাছগুলো, অর্থাৎ চা-বাগানের চেনা ভাষায় 'শেড ট্রি' দাঁড়িয়ে থাকে চা পাতার স্থানিক আবডাল ও শীতলতার দ্যোতক হয়ে। রংলি রংলিওটের চারপাশেই কম সে কম সাতটি চা-বাগান আছে। পার্বত্য ঢাল জুড়ে একের পর এক চা-বাগান। যেমন, তিস্তা ভ্যালি চা-বাগান, পুমং চা-বাগান, গিলি বা গিলেভঞ্জন চা-বাগান, তাকদা চা-বাগান, পেশক চা-বাগান, নামরিং চা-বাগান। এতোটা পাহাড়ছায়ায় এসেছি, এই সবুজ ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখবো বলেই তো। দিগন্ত ও পাহাড়ের অপুর্ব মিলমিশ।

দার্জিলিং হিমালয়ের কোলে, সমতলভূমি থেকে ৬.৮১৪ ফুট উচ্চতায় ২৭২.৯৯ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে মনোরম রংলি রংলিওটের বিস্তার। যার মধ্যে রয়েছে একটি পঞ্চায়েত সমিতি ও ১১টি গ্রাম পঞ্চায়েত। যেগুলির মধ্যে আছে লাবদা, লামহাট্টা, মানেদারা, পুবং, রামপুরিয়া, রংলি, রিসসিপ, রংচঙ, সিংগ্রিমাতম, টাকলিং ১, টাকলিং ২, তাকদা। এই তাকদা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে ৪১২.৩৮ হেক্টর নিয়ে চা-বাগান অধ্যুষিত গ্রামটি। গ্রামের ভেতর দিয়ে মসৃণ পথ। পাহাড়ি নির্জনতা। অনাঘ্রাতা পাহাড়ের কোলে ছোট্ট এক গাঁ। ঘরবাড়ির উঠোনে আসন্ন শীতের ফুলসাজ। প্রতিটি ঘরের সামনেই লতিয়ে উঠেছে ফুল লতা পাতা। তাদের নুয়ে আসা পাতায় পাতায় হিমজল। রাসায়নিক সারবিহীন সবজি চাষ

করেন স্থানীয় মানুষ। হালকা পাহাড়ি ঢাল জুড়ে ছোট ও পরিচ্ছন্ন গ্রামটি। প্রায় ৫৮১ ঘর পরিবারের বসবাস এখানে। মূলত প্রায় নেপালী ও লেপচা সম্প্রদায়ের বসবাস। এদের কথ্য ভাষা নেপালী ও গোর্খালি হলেও এরা পর্যটকদের সঙ্গে দিব্যি হিন্দিতে কথোপকথন চালিয়ে নেন। বাংলা বোঝেন তো বটেই, ভাঙা ভাঙা বাংলা বলতেও পারেন অনেকে। রংলি রংলিওট আদপে একটি 'কমুনিটি ডেভলপমেন্ট ব্লক'। অন্যভাবে বলা যায়, স্থানীয় 'জনজাতি উন্নয়ন বিকাশক্ষেত্র'। এমন দূষণহীন প্রকৃতি ও পাহাড়ি গ্রাম্যজীবন আমাদের মত শহুরে জীবনে নিতান্তই অমিল।

পথের ধারে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দুদ্দারিয়ে নেমে পড়ি। বাগিচার কিছুটা ভেতর কয়েক কদম সেঁধিয়ে যাই। দুদিকে সবুজ চা-বাগান আর মাঝে আমি। ভাবা যায়? যারা পাতা তুলছেন, তারা কিন্তু উদাসীন। তারা নিজেরা আপনমনে চা তোলার কাজে ব্যাস্ত। চা-বাগানকে নিয়ে ছবি শিকারের সুবর্ণসুযোগ হাতছাড়া করি না। চা-বাগানের ঝোপে ঢুকে প্রচুর ছবি তুলতে থাকি। কিছু সেলফিও। আপাত ফাঁকা যান চলাচলের পথের ওপরই ধুপ্ করে বসে পড়ি। আমাদের গাড়ির সারথির হাতে নিজের মোবাইলটা সঁপে দিয়ে অনুরোধ করি আমাদের দুজনারও কিছু ছবি তুলে দেওয়ার জন্য। নানান কায়দা করে ছবি তুলতে থাকি। মোবাইলের গ্যালারি ভরে ওঠে হাস্যমুখ আমাদের রংলি রংলিওটের সঙ্গসুখে। দেদার সবুজের সঙ্গে তখন বেজায় মিতালি আমাদের। এই চা-বাগান ভ্রমণসাক্ষী হয়ে থাকে চা-পাতা তোলা শ্রমিকদের কর্মতৎপরতা। মহিলা শ্রমিকদের 'দুটি পাতা একটি কুঁড়ি' তোলার ব্যস্ততা। চা-পাতা ঝাড়াই-বাছাই ইত্যাদি ব্যবস্থাপনার চাক্ষুষ দর্শনে। আগেই বলেছি, রংলি রংলিওটের উৎকৃষ্ট চা পাতা 'ডানকান টি' নামে প্যাকেটবন্দী হয়ে রপ্তানি হয়।

সেই পথের বাঁক। যে পথ পেরিয়ে যেতে হয় সবুজ রূপকথার দেশে। সবুজ সাম্রাজ্যের মধ্যেই পথ ও প্রান্তর, প্রকৃতির খেলাঘর। পথ আগলে দাঁড়াচ্ছে পাহাড়ি বুনো রঙিন ফুল, বাহারি ফার্ণ। তাদের পাতার ফাঁকে ফাঁকে লুকোচুরি খেলে নাম না জানা হরেক পাখি। তাদের ডানায় ভর করে মন-পাখিও ক্ষণিক থিতু হতে চায়। এই সব অঞ্চলের গহন পাহাড়ের গায়ে খেলনাবাড়ির আদলে সাজানো পাহাড়িয়া গ্রাম্য ঘরদুয়ারের চিলতে উঠোনে রঙিন বাহারি ফুলের মিঠে আড়ম্বর। সব বাড়িতেই যে সুদৃশ্য টবেই ফুল গাছ পোঁতেন, তা কিন্তু নয়। পাহাড়ে বেড়াতে এসে লক্ষ্য করেছি, এরা বাড়ির একচিলতে বারান্দায় পুরনো বালতি, রঙের ড্রাম, আধ ভাঙা প্লাস্টিকের পাত্র, এমন কী কালো প্লাস্টিকের ব্যাগেও মাটি ভরে তাতে সুন্দর সুন্দর সব ফুলের গাছ লাগান। পাহাড়ঢালে সবজে নকশা কাটা জুম চাষ অথবা চা-বাগান। আর ওপাসে নীলচে সব পাহাড়, পাহাড়তলি। সপার্ষদ কাঞ্চনজঙ্ঘাকে অবশ্য রংলি রংলিওট থেকে দেখা যায় না। সেটি উল্টোদিকে। এখান থেকে দেখে নেওয়া যায়

রংলি রংলিওট থেকে দেখে নেওয়া যায় পুবং খাসমহল, দাওয়াইপানি, গিলিভঞ্জন, তিস্তাভ্যালি চা-বাগান, ব্রিটিশ আমলে নির্মিত বারবেট সেতু, লামহাট্টা, তিনচুলে, তাকদা, বড়ে মাঙ্গোয়া, ছোটে মাঙ্গোয়া, পেশক ইত্যাদি। আবার এই পেশক বা রিসি রোড ধরে দার্জিলিং শহরের দূরত্ব ২৮.৫ কিলোমিটার।

পুবং খাসমহল, দাওয়াইপানি, গিলিভঞ্জন, তিস্তাভ্যালি চা-বাগান, ব্রিটিশ আমলে নির্মিত বারবেট সেতু, লামহাট্টা, তিনচুলে, তাকদা, বড়ে মাঙ্গোয়া, ছোটে মাঙ্গোয়া, পেশক ইত্যাদি। আবার এই পেশক বা রিসি রোড ধরে দার্জিলিং শহরের দূরত্ব ২৮.৫ কিলোমিটার।

কলকাতা থেকে নিউ জলপাইগুড়ি বা শিলিগুড়ি পৌঁছে, শেয়ার জিপ বা গাড়ি ভাড়া করে সরাসরি চলে যাওয়া যায়। সময় লাগে কম বেশি তিন ঘণ্টা মত। অনেকে তাকদা, তিনচুলে, লামহাট্টা, কালিম্পং বা দার্জিলিং থেকেও গাড়িতে ঘুরে আসেন রংলি রংলিওট।

থাকবেন— রিসর্ট রংলি টি গার্ডেন (৯৯৩২৩

৪৬২৯৭), লিজা হিল হোমস্টে (৯৯৭১৯ ৪১৩৩২)। এছাড়াও কাছেই তাকদায় প্রচুর হোমস্টে রয়েছে।

বছরের যেকোনও সময় যাওয়া যেতে পারে। সেরা সময় অক্টোবর থেকে মার্চ। বর্ষাকালে পাহাড়ের রাস্তা খুব খারাপ থাকে। তাই বর্ষার সময়টা এড়িয়ে যাওয়াই ভাল।

অলস দুপুরের পর যখন চা-বাগানে ঝুপ্ ঝুপ্ ছায়া নেমে আসে। বিকেলের আলো ঢাকা পড়তে লাগলো আদিম চা-বাগানের ঝোপের ছাওয়ায়। অন্ধকারও তখন ধীর লয়ে তাকে ঢেকে ফেলতে থাকে। চা-বাগানে সন্ধ্যা নামলে অজানা কারণেই কেমন বিষাদগ্রস্থ হয়ে ওঠে। হেমন্তের মিঠে এক বিষন্নতা ঘোমটা টেনে নেয় চা গাছের সবুজ অবয়বে। গুঁড়ো গুঁড়ো সবুজ নীরবতা ছড়িয়ে পড়ে। অগ্রহায়ণ মাস। রাত নামবে খানিক বাদেই একলা চা-বাগানে। চা খেতের বুক ছুঁয়ে মেঘেরাও নামে সবুজকে সোহাগে, চুম্বনে ভরিয়ে দিতে। পর্যটন সুবাস ফিকে হয়ে মূর্ত হয়ে ওঠে চুপিসার। রাতের চাঁদ আর সবুজ মেহফিল ভাসে। ভাসতেই থাকে।

এ নদী কেমন নদী

নদীর দিকে আর কবে নজর ঘুরবে কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে

তুহিন শুভ্র মন্ডল

কোচবিহার নামটি শুনলেই একটা ঐতিহ্যের ছবি আমাদের সামনে আসে। রাজার শহর। আমি যখন স্নাতক পর্যায়ে পড়ার জন্য শিলিগুড়ি কলেজ হোস্টেলে (শিলিগুড়ি) থাকতাম তখন কোচবিহারের বন্ধুরা কোচবিহারকে সংক্ষেপে বলত COB অর্থাৎ City of Beauty। যে ক'বার গিয়েছি পরিবেশের কাজে অথবা থিয়েটারের জন্য এই রাজার শহরে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছি, তার নিজস্ব সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্যের জন্য আমার ভালই লেগেছে।

কিন্ত সমস্যা হচ্ছে যখন কোচবিহারের নদীগুলির দিকে তাকাই তখন একটা প্রবল মনখারাপ কাজ করে।

কোচবিহারকে যদি নদীর জেলা বলা হয় তাহলেও অত্যুক্তি হয় না। কতসব নদী তোর্ষা, তিস্তা, জলঢাকা, ধরলা, রায়ডাক, কালজানি, গদাধর, ধরলা,মানসাই, সুটুঙ্গা, সানিয়াজান, ঘরঘরিয়া, শালটিয়া, ডুডুয়া আরও কত কী! কিন্তু কেমন আছে এই নদীরা? এই প্রতিবেদন একটি খন্ড প্রতিবেদন। এখানে নদীর কথা পূর্ণাঙ্গভাবে আলোচনা না হলেও তোর্ষা নদীর কথা আসবে বারবার। যে নদী বারবার উঠে এসেছে আলোচনায়। দূষণের কারণে, বোরোলি মাছের জন্য, বন্যার কারণে।

সেদিন কথা বলছিলাম কোচবিহারে পরিবেশ ও বিজ্ঞান কর্মী শঙ্কর নারায়ন দাসের সাথে। আমাদের কথোপকথনের বিষয় ছিল নদী। কেমন আছে তোর্ষা? শঙ্করের কথা অনুযায়ী 'একদমই ভাল নেই'। কেন?

নদীর বুক থেকে বালি তোলার আর একটা পদ্ধতি। জলসেচের বড় পাম্পসেটের সাকশন ভালব খুলে শুধু পাইপের মুখটা জলের নীচের মাটিতে রেখে পাম্প চালানো হয়। বালিমাটি মেশানো জল পাইপের সাহায্যে জায়গামত নিয়ে ফেলা হয়। জলটা বয়ে চলে যায় আর মাটিটা ওখানেই থেকে যায়। নদীর যেখান থেকে ঐ জলমাটি তোলা হয় সেই জায়গায় গর্ত তৈরি হয় আর চারপাশের বালির পার ভেঙে ঐ জায়গায় নদীটা বেশ চওড়া হয়ে পড়ে।

নদীকে ঘিরে সাদায় কালোয় মিশিয়ে একটা প্যারালাল অর্থনীতি চলছে। মাছধরা নৌকা চালানো

ইত্যাদি ট্র্যাডিশনাল পেশাকেন্দ্রিক অর্থনীতির চাইতে এই অর্থনীতির শেকড় অনেক অনেক গভীর। নদীর বালি, পাথর, ভরাট, মাটি, বোল্ডার, ইত্যাদির আইনি কারবারের পাশাপাশি বেআইনি কারবার রমরমিয়ে চলছে। বলতে গেলে আইনি রক্ষাকবচ, টেন্ডার লিজ ইত্যাদিকে সামনে রেখে আড়ালে অনেক বেশি পরিমাণে বেআইনি কারবার চলে। ডুয়ার্সের বনকর্মীরা অনেকেই বেতনের টাকা সঞ্চয় করে, পাথর বোল্ডার এর তোলা দিয়ে আয়েশ আরাম খানা এবং পিনা চলে, এরকম কথা ওসব অফিসে কান পাতলে শোনা যায়। সমতলে বালি, ভরাট আর ডুয়ার্সে বজরী, পাথর এবং বোল্ডার এর আইনি বেআইনি কারবারে প্রচুর লোক নিযুক্ত রয়েছে। আর্থমুভার, ডাম্পার, ছোট বড় ট্রাক, লরি, পিকআপ ইত্যাদির মালিকরা, সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য শ্রমিক মহিলা শ্রমিক এবং অবশ্যই শিশু শ্রমিক নিযুক্ত রয়েছে। সব একসাথে সম্পর্কযুক্ত। ওদিক থেকে বালি বজরি না এলে এদিকে নির্মাণ শ্রমিকরা বেকার হয়ে পড়ে। এই দিকটা তো অস্বীকার করার উপায় নেই।

একথা ঠিক, কিন্তু নদীর দিকে কি নজর আছে কোচবিহারে? যদি থাকে তাহলে কেন কোচবিহারের বর্জ্য মেশে নদীতে? কেন নদী পাড় হয় আবর্জনা ক্ষেত্র? কেন নদীগুলিতে শহরের নিকাশিনালা থেকে এসে মিশছে সব দূষিত পদার্থ? ডিটারজেন্ট ফ্যাক্টরির জল? তোর্সা মরা তোর্সা আর চর তোর্সায় পরিণত হবে?

কেন কীটনাশক দূষণে অথবা জলে বিষ প্রয়োগ করে বোরলি ধরা হবে? কেন নদীপাড়ের মানুষ, সচেতন জনগণ প্রশাসনিক উদাসীনতার কথা বলবেন? কোচবিহার জেলার নদীগুলি নাব্যতা হারিয়েছে। সে বিষয়ে আজ পর্যন্ত কোন পদক্ষেপ? পরিষ্কার উত্তর— নেওয়া হয় নি। চিন্তাভাবনার প্রাথমিক স্তরে আছে। একবার এই প্রসঙ্গে মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেছিলেন, কোচবিহারে কালজানি নদীতে চর কাটানোর ভাবনায় সেচ দফতরের সাথে আলোচনা করে নতুন পদ্ধতিতে বাঁধ নির্মিত হয়েছে। তোর্ষা নদীর চর কাটিয়ে নদীর গভীরতা বাড়ানোর জন্য সেচ মন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানাবো। তারপর? কোনও খবর নেই।

পুন্ডিবাড়ির রবি রায়, রামপ্রকাশ দাস, বিকাশ দাসদের কথায় তার চূড়ান্ত হতাশা আর হাহাকারের মিশেল। রাজ্য নদী বাঁচাও কমিটির পক্ষে কোচবিহারের নদীগুলিতে ঘুরে ঘুরে দেখেছি যে নদী সত্যিই ভাল নেই কোচবিহারে। তা সে তোর্ষা হোক বা মানসাই, সুটুঙ্গা, ধরলা।

কিছুদিন আগে এই নিয়ে কথা হচ্ছিল কোচবিহারের পরিবেশ-সংস্কৃতি কর্মী সুমন্ত সাহার সাথে। তার গলাতেও একই হতাশা। নদীগুলিকে ঘিরে যে জীবন-জীবিকা চলত সেগুলোও তো ক্রমশ বন্ধের পথে। নগরায়নে এবং আধুনিক মানুষের কর্মফলে আর উদাসীনতায় নদীগুলি আজ মরতে বসেছে। অথচ এই নদী লোকসংস্কৃতিতে শুধু নয়, খাদ্যাভাসেও প্রবলভাবে জড়িয়ে।

এবার আসি তার সম্পদ, গর্ব বোরোলির কথায়। তার স্বাদের চর্চা চতুর্দিকে। আগের মত আর পাওয়া যায়? এককথায় উত্তর— না। এমনকী মৎস্য দফতরের আধিকারিকের দেওয়া বিবৃতিতেও হতাশাজনক চিত্র। বোরোলি উৎসবে এই মাছ সংরক্ষণে, মাছ-সচেতনতার ভাবনা আছে ঠিকই কিন্ত কাজের কাজ কতটা হচ্ছে সেটা একটা বিষয়। এছাড়াও একসময় পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যেত যাদের সেই চাপলা, ন্যাদোস, কাজলি, মৌরলা সংরক্ষণের কোনও ভাবনা?

আসলে একটা সামগ্রিক উদাসীনতা। মানুষেরও, প্রশাসনেরও সরকারেরও। আমরা সবুজ মঞ্চের উদ্যোগে গঠিত রাজ্য নদী বাঁচাও কমিটির পক্ষে একটি দাবী সম্প্রতি তুলছি। তা হল কোচবিহারে উত্তরবঙ্গের যে নদী গবেষণা প্রতিষ্ঠান তৈরি করার কথা বলা হয়েছিল তা এখন সাইনবোর্ডে আছে কিন্তু তাকে নিয়ে এবার যথার্থ পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।

কোচবিহারে যে আন্ত সীমান্ত নদীগুলি আছে তার সমস্যা ও সমাধানের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হোক। আমরা দাবী তুলছি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা দাবী তুলতে পারি কিন্ত কাজ করতে হবে প্রশাসনকেই, সরকারকেই। নির্বাচনী ইস্তাহার তৈরির আগে যারা নদীর দিকে নজর দেওয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিলেও পরে তাতে নামগন্ধ রাখেনা সে ব্যাপারে কি হবে?

দীর্ঘদিন ধরে কোচবিহারের পরিবেশপ্রেমী সংস্থা

পরিবেশ চিন্তক অরুপ গুহর নেতৃত্বে “নদীকে নিয়ে ভাবুন। নদীকে নিয়ে বাঁচুন” কর্মসূচি করে থাকে নদী চেতনা বাড়ানোর লক্ষ্যে। তোর্সা সহ অন্য নদীগুলো নিয়েও তাদের এই নদী চেতনা উন্মেষের চেষ্টা।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে কবে সেই চেতনা ফিরবে? কবে কোচবিহারের নদীগুলির দিকে নজর ঘুরবে? যারা প্রশাসনে, যারা ক্ষমতায় তারা শুনছেন তো?

আলিপুরদুয়ার

আলিপুরদুয়ার— উত্তরের একটি নদীবিধৌত জেলা। একথা বলতেই ওঠে কালজানি, রায়ডাক, তোর্ষা, হলং, জয়ন্তী, বালা, ডিমা, ঘোমানি, বসরা নদীর কথা। কিন্তু এককথায় আলিপুরদয়ার জেলার নদীর কথা বলা যায় যে উপরের নদীগুলি ভাল নেই।

এক্ষেত্রে একটি কথা প্রথমেই বলে রাখা ভাল যে যখন কর্মসূত্রে মাদারিহাটে ছিলাম তখন এই নদীগুলোকে খুব কাছ থেকে দেখেছি। আজ থেকে কুড়ি বছর আগে যা অবস্থা ছিল এখনও তাই। বরং নদীগুলির অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে।

মূলত কি কি সমস্যা আছে আলিপুরদুয়ারের নদীর? এক নজরে দূষণ, নদীবক্ষ ক্রমশ উঁচু হয়ে যাওয়া, বন্যা, ডলোমাইট মাইনিং ও কার্বাইড দূষণ, নদীবক্ষে আবর্জনা, অবৈধ মৎস্য শিকার, মৎস্যবৈচিত্র্য হ্রাস ইত্যাদি।

এছাড়াও আরও নদীসমস্যা আছে। আলিপুরদুয়ার সংলগ্ন ভুটান রাষ্ট্র অবস্থিত। সেখানে ডলোমাইটের কারখানা এখনও আছে। ফলত ডলোমাইট মাইনিং চলে। তা নদীতে মেশে। জয়ন্তী, বালা, ডিমা, বসরা নদীর জল এভাবে দূষিত হচ্ছে। ডলোমাইট মাইনিং-এর ফলে ও পাহাড়ে ধসের ফলে আলিপুরদুয়ার জেলার নদীবক্ষ উঁচু হয়ে যাচ্ছে। ফলে একটু বৃষ্টিতেই বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে। আবার দূষিত জল খেয়ে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের বন্যপ্রাণীরাও আক্রান্ত হচ্ছে।

এর সাথে বসরা নদীতে কার্বাইড দূষণের সমস্যা আছে। বসরা নদীর ভবিষ্যৎ আজ বিপন্ন। বক্সা অরণ্যের মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীর জলের উপর নির্ভরশীল চিতাবাঘ, হরিণ, হাতি, বাইসন সহ অন্য বন্য প্রাণ। দূষিত জলে তাদের জীবনও বিপন্ন। আগে অনেকরকম মাছও পাওয়া যেত। এখন সেচের জল অমিল। বর্তমানে বসরা নদীর জলে হাত পা ধুলেই শরীর জ্বলতে শুরু করে। লাল হয়ে যায় চামড়া। শরীরে রীতিমত ফোস্কাও পড়ে যায়।

আলিপুরদুয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ নদী কালজানি। কিন্তু পরিবেশকর্মীদের অভিযোগ কালজানি নদীবক্ষে নিয়মিত আবর্জনা ফেলা হয়। ফলে নদী হয় দূষিত। এ নিয়ে চলছে দীর্ঘ চাপানতোর। কর্মসূত্রে আলিপুরদুয়ার থাকেন পরিবেশবন্ধু জাহিরুদ্দিন আহমেদ। তার কথাতেও কালজানি দূষণের একই চিত্র পাই। পরিবেশ দপ্তর সূত্রে খবর জাতীয় পরিবেশ আদালতের নির্দেশের ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই রাজ্যে নদী পুনরুজ্জীবন কমিটি গড়া হয়েছে সেই কমিটি কালজানি নদীর দূষণও পরিমাপ করবে।

এক্ষেত্রে একটি কথা বলা দরকার তা হল কালজানি নদীর দূষণ কমাতে রাজ্য ২২ লক্ষ টাকার প্রকল্প হাতে নিয়েছে। মূলত এটি নিয়েছে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর। বায়ো রেমিডিয়েটরস প্রযুক্তি ব্যবহার করে শহরের নোংরা জল শোধন করার পর তা নদীতে ফেলার বন্দোবস্ত হচ্ছে আলিপুরদুয়ার শহরে। আলিপুরদুয়ার শহরের পলাশবাড়ি, বকরিবাড়ি, শোভাগঞ্জ এই তিনটি এলাকায় কালজানি নদীর স্লুইসগেটে বায়ো রিমেডিয়েটরস বসানো হবে।

আলিপুরদুয়ার জেলার আরেকটি নদী জয়ন্তী। এই নদীকে ঘিরে সমস্যা অন্যরকম। নদীগর্ভ ক্রমশ উঁচু হয়ে যাচ্ছে। পাহাড়ের ধস, ডলোমাইট মাইনিং, নদীবক্ষের বোল্ডারে নদীবক্ষ আগের তুলনায় অনেক উঁচু। ফলে বন্যার ভয়াবহতা নদীপাড়ের জয়ন্তী বাসিন্দাদের জীবন দুর্বিষহ করে দিচ্ছে। এদিকে নদীবক্ষ থেকে পরিবেশগত কারণে পাথর তোলায় বাধা। জয়ন্তী পাড়ের বাসিন্দা অজয় রায়, আরোপী রায়রা বলেন, ‘আমরা অদ্ভুত এক সমস্যার মধ্যে পড়েছি। এখনই বিষয়টাতে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার নজর না দিলে জয়ন্তী জনপদ একদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। জয়ন্তী নদীও ভয়ংকর সমস্যার মধ্যে আছে’।

পরিবেশ ও বিজ্ঞানকর্মী শঙ্কর নারায়ণ দাস

(বাকি অংশ ৮৬ পাতায়)

ধারাবাহিক উপন্যাস। অষ্টম পর্ব

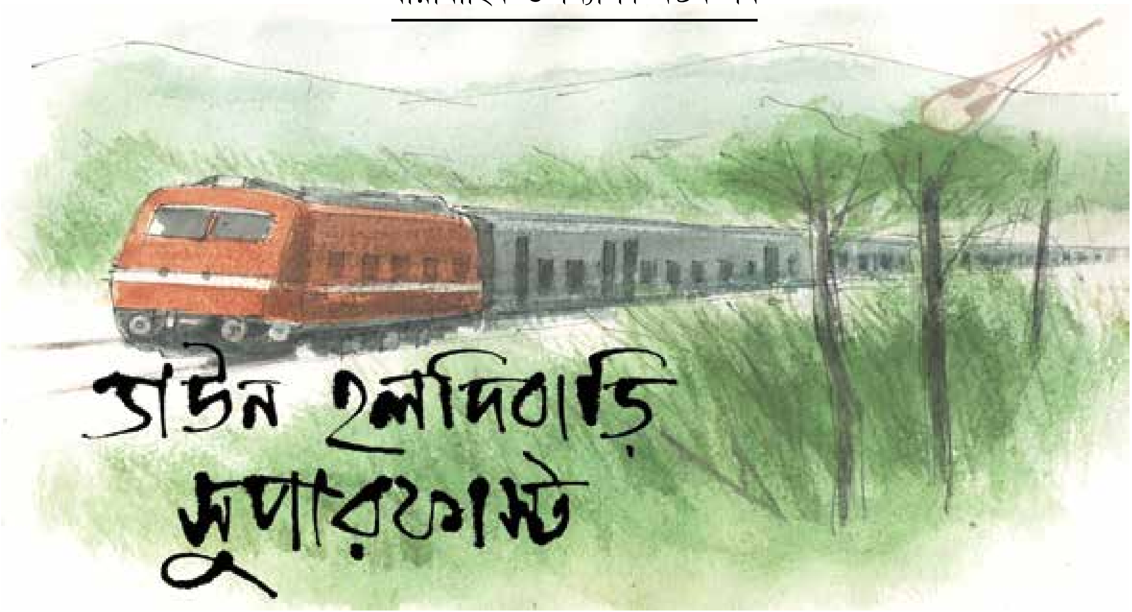

ডাউন হলদিবাড়ি সুপারফাস্ট

সুজিত দাস

এক ভবঘুরে বেহালাবাদক আর তাঁর সুরের পেছনে লুকিয়ে থাকা রাঙাপানি কেমিক্যালস। রাঙাপানির পেছনে তক্ষক শিকার। তক্ষক শিকারের সূত্রে হয় তো আরো কিছু—। এ এক ডুয়ার্সজোড়া রহস্যমঞ্চ যেখানে কখনও বিপাসনা, আরাত্রিকা, রাধারানী, ইলা। কখনও বলবিন্দার, বাটা সুভাষ, মিলন গোম্বু, সৌরভ। আছে আরও রহস্যময়, আধা রহস্যময় চরিত্র যারা কেউ জট বুনে যাচ্ছে কেউ ছাড়িয়ে যাচ্ছে। চারদিকে ভেসে আসা রহস্যের বাতাস এবার জোট বেঁধে পরিণত হতে চলেছে রহস্য-টাইফুনে। এই সংখ্যায় তার-ই আপাতশান্ত পূর্বাভাষ।

১৫

ভগবান দাস একজন ভবঘুরে বেহালাবাদক।

কোনও মানুষের মুখ একবার দেখলেই গেঁথে থাকে ভগবানের মস্তিষ্কের খাঁজে খাঁজে। যেমন সুর একবার কানে লেগে গেলে মাথা থেকে নামে না কোনওদিন তেমনি মানুষের মুখ ভুলতে পারে না এই বিষণ্ণ বেহালাবাদক। স্মৃতি বড় আজব জিনিস। গোপন কুলুঙ্গি থেকে বিদ্যুৎ ঝলকের মত নেমে আসে চোখের সামনে! সুরও। স্মৃতি আর সুর, এই দুই দুটো নিয়েই ভগবানের কাজ কারবার।

এইসব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে দোমোহানি মোড়ে বাস থেকে নামে ভগবান। এই জায়গাটা চেনা

যায় না এখন। কত নতুন দোকানপাট। বাঁয়ে ঘুরেই একটা ঘুমটি মত দোকান থেকে নিজের মোবাইল রিচার্জ করে ভগবান। এই মোবাইল খুব সরেস বস্তু। একবছর আগেও এই যন্ত্রটিরপ্রতি কোনও আগ্রহ ছিল না ভগবানের। কোনও কিছুর প্রতিই তেমন কোনও আগ্রহ নেই ওর। রাতে শোয়ার জায়গা ঠিক জুটে যায়। মধুপুরের মানুষজন ভালবাসে ভগবানকে। বেহালা বাজিয়ে যে দুপয়সা জোটে তা দিয়ে নিজের পেট চলে যায়। গত দু-তিন বছর মধুপুর শহর থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে ‘মোটোরিস্ট ইন্ মোটেল’-এই রাত্রিবাস। সন্ধে থেকে ওখানেই বেহালা বাজায়। মোটেলে নানান গাড়ি আসে। গাড়ি থামে। পানশালা ঘুরে ঘুরে বেহালা বাজায় ভগবান। মদ পেটে গেলে কতরকমের আচরণ যে করে মানুষ! কেউ রেগে ওঠে, কারো চোখের জল বাঁধ মানে না, কেউ উদার হাতে বকশিস দেয়। মোটমাট বেহালা বাদক ভগবান দাসের এখন থাকা খাওয়ার চিন্তা নেই।

তারওপর এই মোবাইল। বড় সরেস জিনিস। ‘মোটোরিস্ট ইন্’-এর মালিক কোনও মোবাইলই একবছরের বেশি হাতে রাখে না। এই মোবাইলটাও একদিন ভগবানের হাতে তুলে দিয়ে মালিক হাসে,

‘নে ভগবান। অনেক সুর ভরে দিয়েছি এই যন্ত্রে। শুনবি, তুলবি আর বাজাবি। তুই আসার পর থেকে ফ্যামিলি কাস্টমার খুব আসছে এখানে। এটুকু তোর প্রাপ্য।’

যন্ত্র হাতে নিয়ে ঘাবড়ে যায় ভগবান,

‘বাবু, আগামাথা কিছুই তো জানি না। ও আমার দ্বারা হবে না। আপনার কাছেই রাখেন।’

‘তোকে কিছু করতে হবে না ভগবান। যন্ত্র নিজেই তোকে দিয়ে শিখিয়ে নেবে।’

তা মোবাইল কান ধরে সবকিছু শিখিয়ে দিয়েছে ভগবানকে। নাম্বার সেভ করা থেকে গান ডাউনলোড করা... সবকিছুই শিখে গেছে ভগবান। মোটেলের ওয়েটারগুলো হাড়-হারামজাদা এক একটা। মোবাইলে ন্যাংটো মেয়েছেলে কীভাবে দেখা যায় তার সুলুকও শেখাতে এসেছিল ওকে।

রিচার্জ করে আবার হাঁটতে শুরু করে ভগবান। এমন লীলাময় একটা যন্ত্রে দুনিয়াদারি হাতের মুঠোয় চলে আসে। এই যেমন এখন, হাঁটতে হাঁটতেই জন্নত-দের গানের টিজার দেখছে ভগবান। ছেলেমেয়েগুলো খুব খাতির করে ওকে। মান্যিগন্যিও। তাছাড়া আমিন মিয়াঁর জন্য অনুষ্ঠান করবে ওরা। এটা খুব আহ্লাদ দিয়েছে ভগবানকে। লোকটা সারাজীবনে রজনীকান্তের দেড়বিঘা জমি ছাড়া কিছুই পায় নি জীবনে। সেই কোনকালে বউটা ভেগে গেল মকবুলের সঙ্গে। এত বছর বাঁশি বাজিয়ে এই শেষ বয়েসে এসে একটু নামডাক হচ্ছে, এই ব্যাপারটাও খুব আনন্দ দিচ্ছে ভগবানকে। আমিন মিয়াঁ আর যাই হোক, পেট চালানোর জন্য হাটে মাঠে সুর বিক্রি করেনি ভগবানের মত।

এই মোবাইল খুব সরেস বস্তু। একবছর আগেও এই যন্ত্রটিরপ্রতি কোনও আগ্রহ ছিল না ভগবানের। কোনও কিছুর প্রতিই তেমন কোনও আগ্রহ নেই ওর। রাতে শোয়ার জায়গা ঠিক জুটে যায়। মধুপুরের মানুষজন ভালবাসে ভগবানকে। বেহালা বাজিয়ে যে দুপয়সা জোটে তা দিয়ে নিজের পেট চলে যায়।

হাঁটতে খুব ভাল লাগে ভগবানের। সারাদিন শুধু হাঁটন হাঁটন। হাঁটতে হাঁটতে দুনিয়া দেখে ভগবান। দোমোহানি মোড় থেকে বাগজান ছয়-সাত কিলোমিটারের মত। টোটোওয়ালা ডাকে ওকে,

‘ও ভগবানকাকা, কোথায় যাবা?’

‘এই কাছেই রে বাপ। বাগজান।’

‘বাগজান তো অনেকটা পথ কাকা। ওঠো, ওঠো। পয়সা দিতে হবে না।’

‘হাঁটতে দে বাপ। হাঁটনের থেকে বড় মিঠা জিনিস আর নাই।’

তা ভগবানের কাছে হাঁটন খুব মিঠা বটে। হাঁটনে রোগ-বিয়াদি আসে না, শরীলের কলকব্জা ঠিক থাকে, মানুষজনের সঙ্গে কথা হয়, নয়ানজুলির মৃদু স্রোতের শব্দ শোনা যায়... এমন মজা হাঁটন ছাড়া আর কীসে? ভাবে আর হাঁটে ভগবান। হাঁটতে হাঁটতে মরে আসা কাশফুল দেখে তিস্তার চরে। ছিপ ফেলে বসে থাকা লোকজন দেখে। বঁড়শিতে গাঁথা বাইম মাছ দেখে। হাঁটন আর দেখনের কোনও শেষ নাই।

আজ বুধবার। পুরান বাজারের হাট এখনও জমেনি। পাইকাররা সবে আসতে শুরু করেছে। পিন্টু পালের মনিহারি দোকানের সামনে পাইকার, ফড়ে আর ধান-পাটের ব্যবসায়ীরা গজল্লা করছে চিৎকার চেঁচামেচি সহ। পিন্টু পালের ছেলে দূর থেকেই হাঁক দেয়,

'ও কাকা, এদিক পানে আসো একটু। বাজনা শুনি।'

'নারে বাপ, কাজ আছে, বাগজান যাবো।'

'আসো না কাকা, একটা গান তো শোনাও। এই গরম জিলাপি বলে দিলাম। আসো আসো। অনেকদিন তোমাকে দেখি না।'

গরম জিলাপি আর বাজনা বাজানোর অনুরোধ ফেলতে পারে না ভগবান। পিন্টু পালের ছেলেটার ইস্টাইল খুব মারাত্মক। কানের দুই পাশে চুল নাই, চাঁদির ওপরপানে চূড়া বাধা। গলায় উল্কি। তবে ছেলাটার মন খুব দরাজ। দু একটা গান শুনেই চকচকা একটা একশোর পাত্তি দেয় ভগবানকে,

'কাকা ভাল থাইকো। আর আইসো মাঝেমাঝে।'

উপেন ডাক্তারের চেম্বারটা পাশ কাটিয়ে গেলেই ভগবানের আর চিন্তা নাই। হাঁটতে হাঁটতে সিধা বাগজান। আমিন মিয়াঁর সঙ্গে কথা বলাটা আজ খুব জরুরী। শ্যামসুন্দরের সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে। দুজনেই থাকবে আজ আমিন মিয়াঁর বাড়িতে। ডাইনে উপেন ডাক্তারের চেম্বার। বাঁ দিকে মুখ ঘুরিয়ে জোরে হাঁটা শুরু করে ভগবান। কিন্তু রেহাই নেই। উপেন ডাক্তার নাড়ি দেখে, রোগীর মুখ দেখে রোগ বলে দিতে পারেন। এই ভর দুপুরে, প্রখর সূর্যের আলোয় উপেন ডাক্তারের চোখ ফাঁকি দেওয়া অসম্ভব। কমপাউন্ডার নরেশ এসে পথ আগলায়,

'ও কাকা, এত জোরে হাঁটো কেন?'

'আজ আর ডাকিস না বাপ, আমিন মিয়াঁর বাড়িতে ডাল-ভাতের দাওয়াত। অনেক দেরি হয়ে গেল।'

'কাকা, আমি কে তোমাকে আটকানোর! ডাক্তারের চোখ তুমি ফাঁকি দিতে পারো নি। চল এখন।'

চারদিকে কাঠের আলমারি। নিখুঁত পালিশ। সেগুন কাঠের ওপর নিয়মিত পালিশ পড়লে যা হয়, উপেন ডাক্তারের আলমারিতে মুখ দেখা যায়। পাশে বড় একটা টেবিল। নানারকম ওষুধ, সিরাপের শিশি বোতল। অবশ করে দেওয়া একটা গন্ধ। উঁচু কাঠের চেয়ারে প্রাচীন বটগাছের মত বসে আছেন এ তল্লাটের একমাত্র জীবিত এলএমএফ ডাঃ উপেন ভট্টাচার্য। রাঙ্গাজবা আলতায় দুধের মিশেল দেওয়া গায়ের রং। গলার ওপর পৈতের মত জড়িয়ে রাখা স্টেথোস্কোপ। বাম হাতে রসুনের চোকলার মত পাতলা 'ফেবার লিউবা' ঘড়ি। মুখে একটি হাসি আছে কি নেই, বোঝা দায়। সামনের তিনটে বেঞ্চে মধুপুর আর শিলিগুড়িতে ডাক্তার দেখিয়েও ফল না পাওয়া কিছু মুখভার রোগী।

'বাচ্চা উলটো আছে, বিয়োনোর সময় ঝঞ্ঝাট হবে, মা। যা ডেট বললাম তার দুদিন আগেই মধুপুরের হাসপাতালে ভর্তি হবে। মনে থাকে যেন। পেট কেটে বাচ্চা বের করতে হবে।'

সামনে বসে থাকা পোয়াতিকে নিদান দিয়েই ভগবানের দিকে তাকান উপেন ডাক্তার,

'কী ব্যাপার, আজকাল ডাক্তার বদ্যিকেও হেলাফেলা করিস! শোন উপেন ডাক্তারের চোখ ফাঁকি দিস না। দিতে পারবিও না। দেখি, চোখটা দেখি।'

ভগবান মুখমণ্ডল এগিয়ে দেয়। চোখের পাতা নীচে নামিয়ে ডাক্তার ঈষৎ গম্ভীর,

'ডুমুরের ঝোল খা সঙ্গে কুলেখাড়া। রক্ত হবে। এখন 'সুহানি রাত' বাজা। আঃ, 'দুলারি' ছবিতে মধুবালার কী অ্যাক্টো! বাজা, ভগবান, বাজা।'

গত বিশবছর ধরে একই গান শুনে আসছেন ডাক্তার। একটা গানই উনি শোনেন ভগবানের

বেহালায়। বেহালায় সুর ওঠে যখন চোখ বুজে আসে এই বৃদ্ধের। আজও তার বাত্যয় নেই। বাজনা থামলে দুধে-আলতা উপেন ডাক্তার ডানদিকের ড্রয়ার থেকে একটা গান্ধী নোট বের করেন সঙ্গে কয়েকটা ক্যাপস্যুল,

'শোন, তোর চোখ বলছে হিমোগ্লোবিন কম। রক্ত বাড়া। ডুমুরের ঝোলের সঙ্গে এই ওষুধও চলবে একমাস। একমাস পরে আসিস আবার।'

'ডাক্তারবাবু, একটা কথা আছিল', হাত কচলায় ভগবান। এই সুযোগ ছাড়ান দেওয়া যাবে না,

'একটু পেরাইভেট।'

পাশের অ্যান্টিচেম্বারে মুখোমুখি দুইজন। ডাক্তারের চোখ সোজা ভগবানের হলদেটে চোখের ওপর।

'বিচি ফাইট্যা ফুইট্যা গেলে কি বাচ্চা জন্ম দেওন সম্ভব, ডাক্তারবাবু? মানে অন্ডকোষের কথা বলছি।' এক নিঃশ্বাসে কথা শেষ করে ভগবান।

'কোথায় যাচ্ছিস?'

'বাগজান।'

এক্স রে মেশিনের মত কিছুক্ষণ ভগবানের দিকে তাকিয়ে থাকেন বৃদ্ধ। তারপর খুব আস্তে আস্তে মুখ খোলেন,

'শোন ভগবান, আমিন মিয়াঁকে আমি বহুবার বলেছি ধৈর্য ধরতে। ওর যা চোট ছিল তাতে ওর পৌরুষের কোনও ক্ষতি হয় নাই। বুঝিস?'

'বুঝি ডাক্তার। কন আপনি।'

'ওর বীর্যে একটু অসুবিধা ছিল, আমি মধুপুর থেকে টেস্ট করিয়ে এনেছিলাম কিন্তু বাচ্চা জন্ম দেওয়া অসম্ভব কিছু ছিল না। হলেও হতে পারত। রোশেনারা ভরসা করতে পারে নি। মকবুলের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ল। গ্রামের লোকেরাও মিয়াঁকে একসময় অনেক অপমান করেছে। তা কী ব্যাপার ভগবান, এতদিন বাদে?'

'ব্যাপার গুরুতর, ডাক্তারবাবু। সময়ে জানাবো। আপনাকেই জানন দেওয়া যায়।'

পকেটে টাকা এবং ক্যাপস্যুল নিয়ে চেম্বার থেকে বেরিয়ে আসে ভগবান। আজ বড় ভাল দিন। কামাই আর কামাই।

মাথায় গনগনে রৌদ্র নিয়ে, লালপুল পেরিয়ে বাঁদিকে সর্ষে ক্ষেতের ভেতর দিয়ে শর্টকাট ধরে ভগবান। দূর থেকেই হাড়ভাঙা গাছের বেড়া দেখতে পায়। আমিন মিয়াঁর বাড়ি, দেড়বিঘা জমিনের ওপর। শ্যামসুন্দর আর আমিন দুজনেই ওর অপেক্ষায়,

'এত দেরি কাকা?' বড় মিঠা গলা ছেলেটার।

'আর বলিস ভাইজতা। কত লোক, কতটা পথ।'

কাঁসার থালায় কালা নুনিয়া চালের ভাত, কাসুন্দি, কলমি শাক, পয়া মাছ, সরু বেগুন দিয়ে বাবলা শুঁটকির ঝাল। খাবার দেখে চমকে ওঠে ভগবান,

'মিয়াঁ, এ তো খাওয়ায় মাইরে ফেলবেন আমাকে।'

'খাও ভগবান, কতদিন বাদে বাড়িতে নিজের কেউ আসলো।'

'ওর বীর্যে একটু অসুবিধা ছিল, আমি মধুপুর থেকে টেস্ট করিয়ে এনেছিলাম কিন্তু বাচ্চা জন্ম দেওয়া অসম্ভব কিছু ছিল না। হলেও হতে পারত। রোশেনারা ভরসা করতে পারে নি। মকবুলের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ল। গ্রামের লোকেরাও মিয়াঁকে একসময় অনেক অপমান করেছে। তা কী ব্যাপার ভগবান, এতদিন বাদে?'

একটু বাদেই বিকেল মরে আসবে। দুই বুড়ো পড়ন্ত আলোয় সর্ষে ক্ষেতের আলের ওপর বসে। মিয়াঁর পোষা মুরগিগুলো এদিক ওদিক থেকে বাড়ি ফিরছে এখন। লালপুলের শ্মশান থেকে খুব জোর 'বোলো হরি, হরি বোল' ধ্বনি ভেসে আসে। আরেকটা মড়া এল। এদিক সেদিক কথাবার্তার পর ভগবান পকেট থেকে মোবাইল বের করে,

'মিয়াঁ, মধুপুরের কয়েকটা ছাওয়াল পাওয়াল আপনাকে 'ফাংশান' দিবে মানে ওই শাল টাল দিয়া

আপনাকে নমস্কার জানাবে। আপনের থেকে ডেট নিতে আইসছি আমি। ওরা একটা গানও বাঁধছে। আমি বেহালা দিছি। শোনেন। দ্যাখেন। ভিডিও আছে।'

মোবাইল দেখে মৃদু হাসেন আমিন মিয়াঁ,

'বড় আজব মেশিন এই মোবাইল, ভগবান। এক ভিডিওর জোরে শ্যামসুন্দর আমাকে কোনখান থেকে কোনখানে নিয়ে গেল।'

আমিন মিয়াঁ একমনে 'ভার্জিন মোহিতো'র টিজারটা শুনতে থাকেন। কোনও ভাবান্তর নেই।

'দ্যাখেন মিয়াঁ, দ্যাখেন। ভিডিও শুধু শুনলে হয়?'

এবারে একমনে ভিডিওটা দেখতে থাকে আমিন মিয়াঁ। দেখা শেষ হলে ভ্রূ কুঁচকে ভগবানের দিকে তাকান।

'মাইয়্যাটা বেশ ভাল গাইছে। হের নাম কী, ভগবান?'

'জন্নত। নানার নাম মকবুল আহমেদ। চোখের মণির রং নীল। ঠিক আপনের মত। ওই চোয়াল দ্যাখেন, থুতনি দ্যাখেন। আপনের মুখ এক্কেরে কাইট্যে বসানো। মুখ তো আমি ভুলি না মিয়াঁ।'

এরপর খুব একটা হাওয়া উঠল। উথালপাথাল হাওয়া। সেই হাওয়ায় লালপুলের শ্মশান থেকে মড়া পোড়া ছাই উড়ে এল বাগজানের সর্ষে ক্ষেতে। আমিন মিয়াঁর জলভর্তি চোখের দিকে তাকিয়ে যখন বিদায় নিল ভগবান তখন কাস্তের মত একটা চাঁদ উঠছে আকাশে। সর্ষে ক্ষেত দুপাশে রেখে ধীরলয়ে হাঁটতে শুরু করে এই বেহালাবাদক। কত নয়ানজুলি, কত মানুষ, বুধবারের ভরা হাট পেরোতে হবে এখন। হাঁটনের একটা মজা আছে, ঠিক সুরের মত। একবার লয়ে পড়ে গেলে কোনও বেচাল নাই। এইসব সাতসতেরো ভাবনার মধ্যে প্যান্টের পকেটে মোবাইল বেজে ওঠে। ভগবান স্ক্রিনের দিকে তাকায়।

জন্নত।

মোবাইল বড় সরেস জিনিস। মানুষ এই ছোট্ট মেশিনের মধ্যে নাচে, গায়, ঝগড়া করে। মোবাইল একটা বেবাক মজার যন্ত্র।

গুনে গুনে চারটে আমন্ড আর এক মাগ গ্রিন টি।

আর্লি ব্রেকফাস্ট শেষ করে মধুকুঞ্জের ছাদে ওঠেন ইলা ব্যানার্জি। এই হেমন্তে মধুপুর শহরে একটা অদ্ভুত রং লেগে থাকে। শেষ রাতের দিকে ভারি বালাপোশ গায়ে দিতে হয়। সকালে কিছুক্ষণের জন্য একটা শিরশিরে হাওয়া বয়। আজ ভোর থেকে ফেসফুক ভরে গেছে কাঞ্চনজঙ্ঘার ছবিতে। মধুপুর শহরের প্রতিটা অলিগলি থেকে আজ নাকি পাহাড়চূড়া দেখা যাচ্ছে। আসলে এই সময়টায় প্রতি বছরই এই শহর থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায়। তবে আজ ভোর থেকে যা হচ্ছে তা একেবারে টোটাল ফ্রেঞ্জি। শান্ত এই মধুপুর শহরে বছরে দু'একবার এমন হুজুগ ওঠে। প্রত্যেক বর্ষায় যেমন তিস্তার জল নাকি এতটাই বেড়ে যায় যা আগে কখনও হয়নি। মধুপুর শহর থেকে ফি বর্ষায় বিকেলের দিকে তাই তিস্তা ব্রিজে মানুষের ঢল নামে। আজ যেমন ফেসবুকে কাঞ্চনজঙ্ঘা স্মরণাতীত কালের মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল।

এত ভোরে সচরাচর ঘুম থেকে ওঠেন না ইলা। মদ তেমন একটা না খেলেও, এক গবলেট ওয়াইন এবং পার্টির হ্যাংওভার সকাল অবধি থাকেই থাকে। 'ইয়োগা' শেষ করলে তবেই ফ্রেশ লাগে নিজেকে। কিন্তু আজ দিনটাই অন্যরকমের। আজ মধুপুর শহর থেকে আয়নার মত দেখা যাচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘা। আজ ফেসবুক জুড়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা। গতকাল রাতেই মংরা ফোন করেছিল,

'দিদি, কাল দিনের আলো ফোটার আগেই ছয়-সাত জন গেস্ট তোর বাড়ি যাবে। একটা লম্বা মিটিং আছে...'

মংরার কথা শেষ হওয়ার আগেই পার্টির গন্ধ পেয়ে যায় ইলা,

'বেশ তো, আমিও কয়েকজন বন্ধুকে ডেকে নিই। সুপ্রভাতের এক ক্লায়েন্ট গতকাল দুটো বড় বোয়াল দিয়ে গেছে। বোয়ালের রসা, দিশি মুরগি, চালকুমড়ো দিয়ে পাতলা মুসুর, অ্যাপেল ফ্লেভারের ভদকা রাখি। সঙ্গে গন্ধরাজ লেবু আর...'

'এসব কিছুই রাখিস না দিদি, তোর কাছে কিছুই চাই নি কোনওদিন, আজ চাইছি। সামান্য আয়োজন

করিস। আর বিষয়টা গোপন রাখিস। সুপ্রভাতদাকে আমি আগেই বলে রেখেছি।’

মংরা একদমে কথা শেষ করেই ইলা ব্যানার্জির দীর্ঘশ্বাস শুনতে পায়। একটা বড় পার্টি হাতছাড়া হওয়ার আক্ষেপ। এই তুতো দিদিটিকে খুব ভাল চেনে মংরা। ছেলেপুলে নেই, মানুষজন নিয়ে থাকতে খুব ভালবাসে। ইলাদিকে বিশ্বাস করা যায় দুশো শতাংশ। কোনও প্রশ্ন করবে না তবে পার্টি মিস্ করার জন্য কয়েকদিন কথা বন্ধ রাখবে। সুপ্রভাতদা খুব গোপনে ‘কোড গ্রিন’-এর আইনি দিকটা দ্যাখে। সুপ্রভাতদাই মংরাকে বলেছে দিদিকে সামলে রাখতে।

‘দূর, ভাল্লাগে না, এতজন মানুষ বাড়িতে তবু কোনও আওয়াজ নেই। মেজেনাইন ফ্লোরে এত জন মানুষ তবু কোনও শোরগোল নেই। ভাবতে পারিস, মংরা?’

‘সত্যিই ভাবা যায় না’, হেসে ফেলে মংরা, ‘রাগ করিস না, আমিও আসছি।’

‘তুই কিন্তু একটু ঘি দিয়ে ভাতে ভাত আর হাঁসের ডিম সেদ্ধ খেয়ে ওপরে উঠবি। তোর জামাইবাবুকেও কোনওদিন এত ভোরে উঠতে দেখি নি। কী ব্যাপার বলত, খুব বিরাট মামলা নাকি?’

‘হ্যাঁ দিদি, খুব বড় মামলা। পিরিয়ড পিস উপন্যাসের মত। অনেক চরিত্র, বিরাট প্লট। তবে চিন্তা করিস না, ভাল হাতে পড়লে গুটিয়ে নেওয়াটা সমস্যা নয়। আর শোন, সুপ্রভাতদা কোনওদিন মিডিওকার ছিলেন না। ওঁকে নিয়ে চিন্তা করিস না। হি ইজ অলওয়েজ উইথ দ্য গুড।’

‘আমার মত মিডিওকারদের তো তোর সুপ্রভাতদা পাত্তা দেবে না। আমরা অনুগল্পের কারবারি। হেলাফেলা মানুষ। কিছু বুঝি না বুঝি?’

‘দিদি, ইউ আর গ্রেট। তুই সব বুঝিস। আমি দশ মিনিটের মধ্যে মধুকুঞ্জে যাচ্ছি। হাঁসের ডিম, ভাতে ভাত। গাওয়া ঘি। কুইক।’

মেজেনাইন ঘরে তখন হালকা এসি চলছে। সুপ্রভাতের হাভানা চুরুট বন্ধ ঘর তোয়াক্কা না করে ধোঁয়া ছেড়েই চলেছে। মিঠেকড়া এই তামাকের গন্ধের মধ্যে বাটা সুভাষ, চিকা বিশু, পীযূষ, আরাত্রিকা, এইচডি এবং বলবিন্দর।

মিলন গোম্বুই নীরবতা ভাঙেন, ‘আমরা কেউই এখনও পর্যন্ত মার্কড নই। ‘ট্রিপল আর’ এই ব্যাপারে আরও সতর্ক হতে বলেছেন। উনি এই মুহূর্তে রাজ্যের বাইরে। উই হ্যাভ ওয়ান ন্যাশনাল অ্যান্ড ফিউ লোকাল নিউজ এজেন্সিজ ইন আওয়ার ফোল্ড। আরাত্রিকা এবং বলবিন্দর, দুজনেই ওদের গ্রাউন্ডওয়ার্ক শেষ করে ফেলেছে। কয়েকদিনের মধ্যেই খবর বের হবে এবং সকলে অ্যালার্ট হয়ে পড়বে। তাই কিছুদিনের জন্য একটা সেফ হাইড আউট ইজ আ মাস্ট ফর আরাত্রিকা অ্যান্ড বলবিন্দর। এনি কোয়েসচেন্স?’

হাভানা চুরুট-এর ধোঁয়া পাক খেয়েই চলেছে এই বিরাট ঘরের কোণায় কোণায়। সুপ্রভাত চুরুট নিভিয়ে পরিবেশ হালকা করে দিলেন, ‘আপনি

মংরা একদমে কথা শেষ করেই ইলা ব্যানার্জির দীর্ঘশ্বাস শুনতে পায়। একটা বড় পার্টি হাতছাড়া হওয়ার আক্ষেপ। এই তুতো দিদিটিকে খুব ভাল চেনে মংরা। ছেলেপুলে নেই, মানুষজন নিয়ে থাকতে খুব ভালবাসে। ইলাদিকে বিশ্বাস করা যায় দুশো শতাংশ।

একবার বলে দেওয়ার পর কারও কোনও প্রশ্ন থাকতে পারে না মিলনজী। আপাতত আমার একমাত্র বউটি আপনাদেরকে খেতে না দেওয়া পর্যন্ত এই অধমের শান্তি নেই। আর আরাত্রিকা, বলবিন্দরের এটা নিজের বাড়ি। ইলা ওদেরকে এখনই ঘরগুলো দেখিয়ে দেবে। যেদিনই আসবে সেদিন থেকেই ওরা অতিথি নয়, আত্মীয় হিসেবেই মধুকুঞ্জে স্বাগত।’

মেজেনাইন ঘর থেকে ডাইনিং হলের দিকে যাওয়ার সময় খুব হালকা একটা গানের সুর ভেসে আসে ‘বোস’ স্পিকারে। ‘আমার মুক্তি আলোয় আলোয়, এই আকাশে আমার মুক্তি...’। মংরা বোঝে

হই-হুল্লোড়ের অবকাশ নেই তাই দিদি একটা বিষণ্ণ অথচ মধুর টোন সেট করেছে।

১৬

বোলবাড়িহাট থেকে চার কেজি শুয়োরের মাংস কেনে এইচডি। সারা ডুয়ার্স চষে ফেলেও এমন মাংস আর কোথাও পায় নি। বেশ খানিকটা বাদির মাংস নিয়েছে। কালকেই একটা জমি ফাইনাল হয়েছে। দুই বিঘার পরিষ্কার জমি, ডিসপিউট ছাড়া। আজ সকাল থেকেই সেই জমির চারদিকে গাছের চারা লাগিয়ে সীমানা দেওয়া হচ্ছে। যেমনই হোক, জমিনের বাউন্ডারি দিতেই হবে। জমির কোনও পুরনো ভূত থাকলে বাউন্ডারি দেওয়ার সময় ঠিক চলে আসে। এখনও পর্যন্ত সব ঠিকঠাক। কাগজ আয়নার মত হলেও কোন ওয়ারিস যে কখন হাজির হয়! এখন, এই বিকেলবেলায় কাজ প্রায় শেষ হওয়ার মুখে। নিরুপদ্রব। পনেরো জন শ্রমিক মিলে সকাল থেকে খেটে চলেছে। ডবল রোজের কাজ, শেষ হতে হতে রাত হয়ে যাবে। আদিবাসী এই শ্রমিকেরা এইচডি-কে মানে খুব। হরিও ওদের ভালবাসে প্রাণপণ। আজ বড়কা খানা। ভাদোই চালের ভাত, আলু ভাজা আর অনেকটা বেশি ঝাল দিয়ে শুয়োরের গরগরে মাংস। মাংস ব্যাগে ভরে বাইকের পেছনে বেঁধে দুই চাকার শয়তানকে স্টার্ট করে। খানিকটা এগিয়েই বাঁ দিকে ধূপঝোরা দেশি মদের দোকানে পঁচিশ বোতল বাংলা মদের পয়সা জমা করে এইচডি। সেলসম্যান ছেলেটি হরিকে ভালই চেনে। টাকা গুনে নিয়ে নিজেই বলে, 'হরিদা, খাসির ভুঁড়ি গরম জলে সিদ্ধ হচ্ছে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে চাট রেডি হয়ে যাবে।'

ভুঁড়ির চাট এককথায় অমৃত সমান। খাসির অন্ত্র থেকে ময়লা বের করে নেওয়ার পর গরম জলে সেদ্ধ করে নিয়ে টুকরো টুকরো করে কেটে মাংসের মত রান্না করতে হবে। পরিমাণে কম থাকলে একটু আলুও মিশিয়ে দেওয়া যায়। ভুঁড়িই বল বা মাংস, ঝোলে আলুর কোনও তুলনা হয় না। পরিমাণে যথেষ্ট হলেও হরি বলে, 'শোন, একটু ভুটানি আলু ডুমো ডুমো করে কেটে দিস। দেখিস গলে না যায়।'

'চিন্তা করিস না, হরিদা। তোর 'সাইট'-এ ঠিক সময়ে সবকিছু নিয়ে পৌঁছে যাবো আমি।'

তা এই জমি এক জবর 'সাইট' বটে।

জমির পাশেই বিরাট রিসর্ট। ইংলিশ নাম, 'দ্য উডস্ রিসর্ট অ্যান্ড স্পা'। রিসর্টের তিনদিকে উঁচু প্রাচীর। এই দেওয়াল যতবার তৈরি হচ্ছিল ততবারই হাতিতে ভেঙে দিয়েছে। এই এলাকা পুরোটাই এলিফ্যান্ট করিডর। শেষমেশ মোটা লোহার রড দিয়ে তিনদিকে পোক্ত কংক্রিটের দেওয়াল খাড়া করে 'কোম্পানি'। রিসর্ট মালিকদের এতদঅঞ্চলে 'কোম্পানি' বলার চল হয়েছে। শোনা যায় সেই কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেকটরে হরেন কুন্ডুর বউও নাকি আছে। আছে বলেই ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে কোনও অবজেকশন আসে নি। আছে বলেই এই রিসর্ট তৈরি হওয়ার পর হাতির দল রুট বদল করে ট্রেনে কাটা পড়ে মরছে তবু পেপারওয়ালাদের কোনও হেলদোল নেই। আছে বলেই সন্ধে থেকে 'খয়েরি গাড়িতে, বাংলোবাড়িতে' মেয়েরা আসে। ফিরেও যায় ভোরের দিকে। সব জানে হরি। শুধু হরি কেন, তামাম ধূপঝোরা জানে।

তবে সিস্টেমের মধ্যেই ভাল লোক আছে। আছে বলেই সিস্টেম চলছে এখনও।

নতুন ডিএফও সাহেব একজন বাচ্চা ছেলে। বিহারের মোতিহারি জিলায় বাড়ি। খুব সাধারণ ঘর থেকে ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিস পরীক্ষায় পাশ করে ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্যাডারে জয়েন করেছে দু'বছর। জয়েন করার কয়েকদিন দিন পরেই লোকাল সাংবাদিক হিসেবে এইচডি-র সঙ্গে আলাপ। প্রথম আলাপেই ডিএফও সাহেবকে জানিয়েছিল হরি, 'স্যর, 'দ্য উডস্ রিসর্ট অ্যান্ড স্পা' নিয়ে একটু কথা বলতাম আপনার সঙ্গে।'

'বোলো এইচ ডি, বোলতে রহো। ফিল ফ্রি।'

সাহেবের গলার আওয়াজে এমন কিছু একটা ছিল, পোড়খাওয়া 'ছোট' সাংবাদিক হরি বোঝে মানুষটা আর যাই হোক, জালি না। সবটা খুলে বলে হরি। হাতির রুট বদল থেকে মেয়েব্যবসা অবধি। এও জানায় পাশের দুইবিঘা রূপনি জমিও কেনার তালে

আছে 'কোম্পানি' এবং যেটা হরি কিছুতেই হতে দেবে না। ডিএফও সাহেব শুধু এটুকু বলেই আশ্বস্ত করেন,

'সহি ওয়াক্ত পে ম্যায় আপনা কাম করুঙ্গা। বি রেস্ট অ্যাসিওয়র্ড। লেকিন...'

'লেকিন ক্যায়া সাব?'

'মেরা প্রিডিসেসর কা ফেয়ারওয়েল উস রিসর্ট পে অরগানাইজ কিয়া থা তুমহারা জার্নালিস্ট ক্লাব আউর মেরা ওয়েলকাম ভি।'

মৃদু হাসেন ডিএফও সাহেব, 'দোজ আর ইনসিগনিফিকেন্ট অ্যাফেয়ারস্। ইন দ্য ইনস্টান্ট কেস, আই অ্যাম উইথ ইউ। লেকিন কুছ হোনা চাহিয়ে। আই কান্ট পুট মাইসেলফ ইন গিলোটিন বাট শ্যাল টেক আপ্রোপ্রিয়েট অ্যাকশন ইফ সামথিং হ্যাপেন্স্। কুছ বাওয়াল মচাও। তুম লড়্তে রহো এইচ ডি।'

তা লড়াই একটা লড়েছে বটে হরি। ময়নাগুড়ির জমিটা বিক্রি করেও টাকায় কুলোয় নি। পুরো টাকা জোগাড় হওয়ার আগেই বেশ ভাল একটা অ্যামাউন্ট দিয়ে জমির বায়না করেছে। একবার বায়না হয়ে গেলে তিনমাসের সময়। এরপর জমির মালিক চুদুরবুদুর করলে সিভিল কোর্টে মামলা ঠুকে কীভাবে কুড়িবছর জমি ঝুমি ঝুলিয়ে রাখা যায়, এই অঙ্ক হরির থেকে ভাল কেউ জানে না এ তল্লাটে। তবে তিনমাস নয়, মাত্র দুইমাসের মধ্যে গোটা টাকা ক্লিয়ার করে হরিদাস সাহা, লোকাল করেস্পন্ডেন্ট, 'দ্য ডেইলি নিউএজ'। সম্পাদক, 'জলঢাকা নিউজ'। বাকি টাকাটা 'ট্রিপল আর'-এর নির্দেশে বাটা সুভাষ দিয়েছে। একলপ্তে অনেকটা টাকা। 'কোম্পানি' থেকে কুন্ডু, সকলেই অবাক হরিদাসের এই জমির লড়াই লড়ে জিতে যাওয়ায়। এখন শুরু হবে আসল খেলা। ভিউ, ভিউ। 'দ্য উডস রিসর্ট অ্যান্ড স্পা'-র আসল ইউএসপি ছিল ফরেস্টের ভিউ। চারিদিকে উঁচু পাঁচিল থাকলেও এই একটা দিকে লোহার জালি দিয়ে ঘেরা। 'কোম্পানি' জানত এই রূপনি জমিটুকু কিনে ফেলা শুধুই সময়ের অপেক্ষা। আজ সেই জমি গাছের বেড়া দিয়ে ঘিরছে হরি। এক সপ্তাহের মধ্যে দুইবিঘা জমিতে কাঁঠালি কলার গাছ লাগাবে। আর কলাবাগান মানেই 'মহাকাল' বাবার পিকনিক স্পট। কয়েকদিন বাদেই হাতির তাণ্ডবে ছারখার হয়ে যাবে ওই জালির বেড়া। তারপর?

মাদারির খেল তুমি জমিয়ে দিয়েছ এইচ ডি।

আদিবাসী মজদুরদের কাজ প্রায় শেষের দিকে। সাদ্‌রি ভাষায় গান গাইছে ওরা। হেমন্ত নিজেকে জানান দিচ্ছে মাতাল করা ছাতিমের গন্ধে। ছাতিমের গন্ধ আর শুয়োরের মাংসের ঘ্রাণ... চরাচর ভেসে যাচ্ছে উৎসবে। এই মজদুরেরা জানে যে কলাবাগান এখানে তৈরি হবে তার দেখভাল ওরাই করবে। কলা বিক্রি থেকে মোচা, থোড় সবই ওদের। হরি কোনও

নতুন ডিএফও সাহেব একজন বাচ্চা ছেলে। বিহারের মোতিহারি জিলায় বাড়ি। খুব সাধারণ ঘর থেকে ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিস পরীক্ষায় পাশ করে ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্যাডারে জয়েন করেছে দু'বছর। জয়েন করার কয়েকদিন দিন পরেই লোকাল সাংবাদিক হিসেবে এইচডি-র সঙ্গে আলাপ।

কিছুতেই ভাগ বসাবে না। এই জনবল হরির তুরুপের তাস। এই সহজ আদিবাসী মানুষগুলো রাজনীতি বোঝে না, 'স্পা' বোঝে না তবে এটুকু বোঝে হরিদাস সাহা ওদেরই একজন। এই মানুষটার একটি ডাকে মাদলে দ্রিমিদ্রিমি আওয়াজ উঠবে। পাঁচ গ্রামের লোক এক হতে এক ঘণ্টাও লাগবে না। হরিদাস সাহা জমি কেনে তবে নিজের জন্য নয়। মাটি, পশুপাখি এবং এইসব গরীব মানুষদের জন্য। এভাবেই অসম লড়াই লড়ে চলা একটা মানুষ এই মুহূর্তে মাটির ওপর চিত হয়ে শুয়ে। ওপরের হেমন্তের আকাশ। বাতাসে ছাতিম এবং মাংসের সুবাস। চারদিক শুনশান। 'দ্য উডস্ রিসর্ট অ্যান্ড স্পা'র আলো নিভে এসেছে এতক্ষণে।

দূর থেকে ভেসে আসা গাড়ির আওয়াজ শুনে হরি বুঝতে পারে ওর লঝঝড়ে মারুতি অমনি এখানে চলে আসবে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই।

এইচ ডি বুঝে পায় না সর্দারজি এমন সোনামুখ করে দু'বোতল বাংলা কীভাবে উড়িয়ে দেয়! ভুঁড়ির চাট এত তৃপ্তির সঙ্গে খাচ্ছে যেন মাক্কি-দা-রোটির সঙ্গে সর্ষো-দা-শাগ। মাটিতে গোল হয়ে বসে চারজন মানুষ। এইচ ডি, বলবিন্দর, আরাত্রিকা আর সাবিত্রী। সামনের কলাপাতায় মোটা ভাদোই চালের ভাত, মাংস, আলুভাজা। আরাত্রিকা ম্যাডাম এমনভাবে খাচ্ছেন যেন মর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ডিস ওঁর সামনে সাজিয়ে রেখেছে কেউ,

'সো এইচ ডি, হোয়াটস্ নেক্সট?'

'নাথিং ম্যাডাম। আর দশদিনের মধ্যে এখানে হাতির তাণ্ডব শুরু হবে। তাছাড়া সর্দারজির সঙ্গে এসে আগেই আমি ফটো তুলে রেখেছি। 'দ্য উডস রিসর্ট অ্যান্ড স্পা'র দুজন ওয়েটারকে দিয়ে মোবাইলেও কিছু ক্লিপ তুলেছি। আপনি পোর্টালে সপ্তাহদুয়েক বাদে নিউজ করুন। তারপর কাগজে। তারপর শুরু হবে আসল খেলা। ডিএফও সাহেব শুধু একটা হ্যান্ডেল চাইছেন।'

'বেশ, আমাদের নিউজ বের হলে গোটা ডুয়ার্স জুড়ে এই অবৈধ রিসর্ট ব্যবসার বিরুদ্ধে প্রশাসন ব্যবস্থা নেবে। তবে ইংরেজি নিউজ পোর্টাল আর খবরের কাগজ শহরের মানুষের কাছেই পৌঁছয়।'

'তাহলে?'

'তাহলে 'খবরিলাল' পোর্টালের প্রশান্তকেও কয়েকটা ক্লিপ দিতে হবে।'

'কোনও ইস্যু নয় ম্যাডাম। আমি সুভাষদাকে সব ওয়্যাটস্ অ্যাপ করে দেব ঠিকসময়ে। প্রশান্ত এখন সুভাষদার পে-রোলে আছে। মোটা টাকার মাসিক প্যাকেজ। আরও দুটো নতুন জহর কোট কিনেছে। ফেসবুকে দেখলাম দার্জিলিং-এর উইন্ডা মেয়ার হোটেলে বসে চা খাচ্ছে। টাকার গরমে যাকে যা খুশি বলে দিচ্ছে। পোর্টালেও লিখছে হাত খুলে। ইদানিং শিলিগুড়ির সোশালাইট বৃত্তের মহিলা মহলে রাতবিরেতে মেসেজ করছে।'

মজদুররা সবাই বাড়ি ফিরে গেছে। আরাত্রিকা, সাবিত্রী এবং বলবিন্দরও।

একা হরি এবং শুক্রা ওঁরাও। শুক্রা মদ খায় না। ধূপঝোরার স্বচ্ছ কাচের মত আকাশে এখন নক্ষত্রের সমাহার। অসহ্য ছাতিম এবং হালকা শিশিরের ঘ্রাণ বাতাসে। এই নক্ষত্র এবং ষড়যন্ত্র ভরা আকাশ মাথায় নিয়ে আপার চ্যাংমারি ফিরে যাবে এইচ ডি। চুট্টা মুখে নিয়ে বৃদ্ধ সুরেশ তামাং পাহারা দিচ্ছে সেই জমিন। সেইখানে লেবু এবং কলাবাগানের মাঝে হরির ছোট্ট আস্তানা। সেইখানে সুতির শাড়ি পরা এক রমণী হরির অপেক্ষায়। এই একমাত্র নারী যে হরিকে উল্টো মুদ্রায় বাধ্য করে না।

রাফ ঢালাই একটা মধুর জিনিস।

বেগুনটারি মোড়ের বাবা লোকনাথ সাইবার কাফেতে সন্ধে নেমে এসেছে। ইন্দ্রাশিস মিত্র, পলাশবরণ নিয়োগী এবং বাপ্পা দেব বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর ছিপি খুলে সবে এক পেগ করে শেষ করেছে। প্রথম পেগটির আদরের নাম রাফ ঢালাই। এমত রাফ ঢালাই আবহে আকাশ কালো করে দু-এক ফোঁটা অসময়ের বৃষ্টি নেমে আসে। পলাশবরণের কথায়,

'সবটাই পেগে ঢাকা তারা। এই কারণে শালা ওয়েদারের ইনস্যুরেন্স করে রাখা দরকার।'

দিনবাজারের সন্ধ্যা বস্তুত অলস এবং নিস্তরঙ্গ। শীত এবং বর্ষায় গোটা মধুপুরেই টোটাল আবগারি ওয়েদার। লিকার কনোশিয়র পলাশবরণ মদটা চিরকাল আয়েস করে পান করে। বৃদ্ধ সন্ন্যাসী থেকে ব্ল্যাক লেবেল, মদের বিচিত্র দুনিয়ায় পলাশ নিজের জিভকে সেট করে ফেলতে পারে অবলীলায়। তবে রাফ ঢালাই-এর পর একটু বিরতি দরকার। টেস্ট ম্যাচের শুরুর দিনটায় যেমন প্রথম দু'ঘণ্টা একটু ধরে খেলতে হয়, এও খানিকটা তাই। পিচটা বুঝে নাও, তারপর চালিয়ে খেলো। তা আজকের এই অসময়ের বৃষ্টি রাফ ঢালাইয়ের মৌতাত একটু হলেও চটকে দিয়েছে। মাঝের বিরতিটা ছোট হয়ে এল যেন। বল স্যুইং করার আগেই বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর দ্বিতীয় রাউন্ড শুরু হয়। পাওয়ার প্লে।

কিন্তু মংরা অ্যালিয়াস ইন্দ্রাশিস মিত্রর মন এবং চোখ রাস্তার দিকে। একটা কালো রেঞ্জ রোভারের এই রাস্তা দিয়েই মধুকুঞ্জের দিকে যাওয়ার কথা। ওদলাবাড়ির জামাইয়ের ধাবা থেকে আরাত্রিকা এবং বলবিন্দরকে নিয়ে সুমন ইয়োলমো মুধুকুঞ্জে না ঢোকা অবধি শান্তি নেই। 'দ্য ডেইলি নিউ এজ'-এর বেঙ্গল এডিশনে অবৈধ রিসর্ট এবং এলিফ্যান্ট করিডরের খবর বেরিয়ে গেছে। হাতির পাল যে নামি রিসর্টের গাড়ি ভেঙে দুজন ট্যুরিস্টকে আহত করেছে, সে খবরও বাতাসে উড়ছে। ইংরেজি পেপারের চল মফস্‌সল শহরগুলোতে একটু কম। তবে বিকেল থেকেই 'দ্য ডেইলি নিউ এজ' এবং 'খবরিলাল'-এর পোর্টাল গোটা নিউজটা ছড়িয়ে দিয়েছে। হরেন কুন্ডু, পঞ্চায়েত এবং ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের বাপের শ্রাদ্ধ করে ফেলেছে প্রশান্ত ধর। লোকাল কেবল চ্যানেলে লাটাগুড়ি আর ধূপঝোরার বেশ কিছু রিসর্ট নিয়ে সাধারণ মানুষের বিক্ষোভের খবর। সঙ্গে হাতির তাণ্ডবের ছবি।

আজ থেকে আরাত্রিকা এবং বলবিন্দরের 'মধুকুঞ্জে' থাকার কথা। 'পাওয়ার প্লে' চলাকালীনই 'বাবা লোকনাথ সাইবার কাফে'র জানালা দিয়ে মংরা দেখতে পায় সুমন ইয়োলমোর কালো রেঞ্জ রোভার। হুশ করে লাফ দেওয়া একটা কালো চিতা যেন। শান্তি।

খবরটা 'ট্রিপল আর'-কে দেওয়া দরকার। আগামীকাল থেকে 'অপারেশন টোকে গেকো।'

তক্ষকের ইংরেজি নাম।

রাত আটটা নাগাদ বাংলোয় ফিরে আসার পর সৌরভের ওয়্যাটস অ্যাপে পরপর বেশ কিছু মেসেজ ঢোকে। ভিডিও ক্লিপ এবং কিছু স্টিল। সঙ্গে ছোট্ট একটা মেসেজ,

'কলিং ইউ অ্যাট টোয়েন্টি ওয়ান জিরো জিরো আওয়ার্স।'

সৌরভ দার্জিলিং সাইবার থানায় ফোন নম্বরটা দিয়ে লোকেশন যাচাই করে নেয়। আসামের সিম এবং ফোনটাও আসাম থেকেই করা।

ঠিক রাত নয়টায় একটা আননোন নাম্বার থেকে কল রিসিভ করে সৌরভ। মহিলা কণ্ঠ, ভয়েস ডিসটর্টেড,

'দাত্তা সাহেব, আপনি নর্থ বেঙ্গলের আই জি সাহেবের ব্লু আইড বয়। তাই আপনি দার্জিলিং জেলায় পোস্টেড হলেও জলপাইগুড়ি জুরিসডিকশনের খবরটা আপনাকেই দিচ্ছি। তাছাড়া আপনার ইমপেকেবল অনেস্টির ওপর আমাদের সম্পূর্ণ আস্থা আছে।'

'হোয়াই মি? ইট কুড হ্যাভ বিন ডান বাই আদার অফিসার্স।'

'ইটস্‌ অনলি ইউ অর পাবলিক। চয়েস ইজ ইয়োর্স', ডিসটর্টেড মহিলা কণ্ঠের উত্তর খুব সোজা।

'আমাকে জুরিসডিকশন টপকানোর জন্য অনুমতি নিতে হবে।'

'ইউ টেক ইয়োর টাইম। আজ রাতটুকু আপনাকে সময় দিলাম। কাল সকালে আবার ফোন করব। যদি রাজি থাকেন নিখুঁত লাইভ লোকেশন পাঠিয়ে দেব। এবং নতুন জয়েন করা ডিএফও সাহেবকেও খবরটা দিয়ে দেব সো দ্যাট ইউ ক্যান টেক হিজ অ্যাসিস্ট্যান্স। কাল রাতের মধ্যে হরেন কুন্ডুকে অ্যারেস্ট করুন আলোং উইথ সিজার অফ থ্রি টুয়েন্টি সিক্স লাইভ লিজার্ডস। দোজ কিউট লাইভস আর অন দ্য ভার্জ অফ স্মাগলিং।'

'বাট ম্যাডাম, হাউ ক্যান আই অ্যারাঞ্জ দ্য ইনটার ডিস্ট্রিক্ট পোলিশ লিয়াজো ওভারনাইট? প্লিজ প্রোভাইড সাম মোর টাইম।'

'টাইম ইজ প্রেশাস, দাত্তা সাহেব। আপনিই পারেন কাজটা করতে। নইলে মানুষ কাজটা করে ফেলবে। যেভাবে চম্পাসারি মোড়ে মানুষ ভুটানি মদ লুঠ করে ফেলেছিল, ঠিক সেইভাবে। বাট দ্যাটস্‌ অ্যানার্কি। অ্যাজ অফ নাউ, আমরা তা চাই না।'

'আপনি, আই মিন আপনারা ঠিক কারা? আর ইউ গুড অর ইটস জাস্ট গ্রুপ রাইভালরি?', সৌরভ আস্তে আস্তে সামলে নেয় নিজেকে।

'উই আর ফিউ গুড সোলস। অ্যান্ড এক্সপোনেনশিয়ালি গ্রোয়িং ইন নাম্বার, দাত্তাসাহেব।'

(চলবে)

গল্প ১

ছাতিম ফুলের গন্ধ

গৌতম রায়

যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই। ভূতের মত পড়ে আছিস। ওঠ শিগ্গির। চল। এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে গেল তিতির।

বিসাজ বুঝল তিতির এসেছে। বুঝেও যেন কিছু বোঝে নি এমনভাবে মটকা মেরে পড়ে রইল। এই এক পাগলী আছে, তাকে একটু মন খারাপ করে থাকতেও দেবে না। একটু ল্যাদ খেয়ে পড়ে থাকবে তার উপায়ও নেই।

একদিকে অমনটা ভাবলেও মনে মনে খুশিই হয়েছে বিসাজ। এই অষ্টমীর দিন একটা অনুভূতি তাকে জানান দিচ্ছে --কেউ আছে তার। সব শেষ হয় নি।

মনের খুশিটা গোপন রেখেই একটু ঘ্যাম নিয়ে তিতিরকে বলল, আবার জ্বালাতে এলি?

আমিতো কেবলই জ্বালাই। জ্বালাবো। বেশ করবো জ্বালাবো। হাজারবার জ্বালাবো। লক্ষবার জ্বালাবো। দরকারে কোটিবার জ্বালাবো। কী করবি তুই?

ক্ষেপে গিয়ে আধশোয়া বিসাজের কোঁকড়া চুলটা টেনে দিতে ওর মুখের সামনে হাতটা টেনে আনল তিতির।

মাথার উপরে উঠতে থাকা তিতিরের হাতটা এক ঝটকায় টেনে ওকে বুকের কাছে নিয়ে এল বিসাজ। তিতিরের চুলে মাথা ঘসতে গিয়েই ওর চিরপরিচিত গন্ধটা পেল সে।

বিসাজের বেষ্টন একটু আলগা হতেই তিতিরের জিজ্ঞাসা, আবার কী হল বিসাজ? চল ওঠ।

তুই আজ তেল মেখেছিস মাথায়?

আর বলিস না রে। দিদুন জোর করে নিজের মাথায় মাখার তেলটা এক খাবলা মাখিয়ে দিল। তেল মাখলে নাকি মাথা ঠান্ডা থাকে। যত্তো সব। বাড়ি ফিরে আবার শ্যাম্পু করতে হবে।

বিসাজ যেন শুনতেই পেল না তিতিরের কথাগুলো। স্মৃতির গহীনে পেঁজা তুলোর মত তার নাকে লেগে রয়েছে তিতিরের মাথার তেলের গন্ধটা।

কী তেল রে? ক্যান্থারাইডিন? বেঙ্গল কেমিক্যালের?

বেশ খানিকটা অবাক হয়েই তিতির বলল; সে কী রে গুরু। আজকাল গন্ধ শুঁকে মাথায় মাখা তেলের নাম, কোন কোম্পানির প্রোডাক্ট -সব বলে দিচ্ছিস। কী ব্যাপার বলতো বস?

না রে। মা এই তেলটা ছাড়া অন্য কোনও তেলই মাথায় মাখত না। মাঝে মাঝে বেঙ্গল কেমিক্যালের স্ট্রাইক হত। মাথায় মাখার তেলের কী হবে - তাই নিয়ে মার সেকী মাথাব্যথা। আমি ক্ষেপাতাম, আরে ওদের লেবার স্টাফদের কী হবে তাই নিয়ে ভাবো তোমার মাথার তেলের ভাবনা ছেড়ে। মা হাসত।

তেল যদি না পাওয়া যায়, তাই মা স্টক করে রাখত সারা বছরের। বাবার তো মাথায় চুলই নেই। আমি তো ওই তেল মাখিই না। বছর শেষে আদ্দেক তেল নষ্ট হত।

তবে জানিস তো মার স্ট্রোকের পর আবার দেখলাম ক্যান্থারাইডিন পাওয়া যাচ্ছে না। জোগাড় করলাম কয়েকটা শিশি। সব শিশিগুলো লাগেও নি রে। কেন যেন তখন এই গন্ধটা আর সহ্য করতে পারছিলাম না। বাকি শিশিগুলো জোর করেই দিদিকে দিয়ে দিলাম। প্রায় এক শ্বাসে কথাগুলো বলে যেন বিসাজ উত্তেজনায় একটু হাপাতে লাগলো।

তিতির আজ এই পুজো গন্ডার দিনে আপন মনের

আগল ভাঙতে বিসাজকে একটুও বাধা দেয় নি। কেবলই ওর মনে হয়েছে একটা কবিতার লাইন, সি মাষ্ট উইপ অর সি উইল ডাই--টেনিসন যেন খুবলে খাচ্ছে তিতিরকে।

আগে বিসাজ বড্ড ছিচকাঁদুনে ছিল। একটু সেন্টু খেলো তো চোখ ছলছল করে উঠল। তিতির লক্ষ্য করেছে ওর মায়ের স্ট্রোক হওয়ার পর থেকেই কেমন যেন বড়দের মত হয়ে গেছে বিসাজ। ওর মাকে যখন 'উদয়ের পথে'র কাঁচের গাড়িটায় করে শেষবারের মত নিয়ে আসা হল তখন অমন কথায় কথায় কেঁদে ফেলা ছেলেটা একফোঁটাও চোখের জল ফেলে নি।

তিতিরের সেদিনও কেবলই টেনিসনের কবিতাটাই মনে হচ্ছিল। ভাবছিল কবিতার সেই শহিদ সৈনিকের স্ত্রীর কোলে সন্তানকে বসিয়ে দেওয়ার পর তার শ্রাবণধারার কথা। আচ্ছা তখন যদি ও একবার বুকে জড়িয়ে ধরত বিসাজকে, তাহলে ও কি একটু কাঁদতে পারত?

হঠাৎই তিতিরের মনে পড়ে গেল সেই ভয়ঙ্কর দিনটাকে। পোষ্ট ডকের ভাইভা দিতে বিসাজকে শেষ পর্যন্ত যেতেই হয়েছিল পেনসিলভ্যানিয়ায়। ওর মা তখন সেরিব্রালে প্রায় বেড রিডন। একদিন হঠাৎ করে ভয়ংকর কনভালশান হল। এই তো বছরখানেক আগেও একবার মহালয়ার ঠিক আগের দিন রাতে এমনই কনভালশন হয়েছিল।

সেবারও বিসাজের মাকে হসপিটালাইজড করতে হয়েছিল। পরে বিসাজ তিতিরকে বলেছিল, জানিস তো বাড়িতে তো নার্সদিদি এন্টি কনভালশন ড্রাগ এপটয়েন ইঞ্জেশন দিল। তাও কনভালশন থামে না।আমি তো জানতামই না পোষ্ট স্ট্রোক অমন কনভালশন হয়। অ্যাপোলেতে যে নিউরো মেডিসিনের আন্ডারে মা ভর্তি ছিল সে ব্যাটা কোনও অ্যান্টি কনভালশন ড্রাগই দেয় নি। অ্যান্টি কোয়াগুলেশন দিতেই তো মালটা ব্যস্ত, কনভালশনের ভাবনা তখন আর ডাক্তারের কোথায়? একটা ইমপোর্ট করা অ্যান্টি কোয়াগুলেশন ড্রাগ 'প্রাডক্সা', সেটার জন্যে সেই ডাক্তারের যা চাহাত, তখনই বুঝেছি শালা রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্র রামকৃষ্ণের টাকা মাটিকে মাটি টাকা করার ন্যাকে নাক গলিয়েছে!

প্রথমবার মহালয়ার আগের রাতে কনভালশন দেখে বিসাজ ফোন করেছিল নৈহাটির রবিশঙ্কর পাঠককে।

তিতিরকে বলে, মালটা ভাস্কর রায়চৌধুরির হাউস স্টাফ ছিল বলে নিজেকে একটা হনু মনে করে। সেই মালটাতো এপটয়েন ইঞ্জেকশন দেওয়ার কথা বলেই দায় সেরে দিল। ইঞ্জেকশন দেওয়ার ঘণ্টাখানেক বাদেও কনভালশন থামছে না। আমার তো হাত পা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে এই দেখে। প্রসূন মহারাজের দেওয়া মহাস্নানের জলও মার মুখে দিলাম। কিছুতেই কিছু হল না। অ্যাপোলোতে অত দূরে নিয়ে যাওয়ার রিস্ক নিলাম না। সোজা চলে গেলাম বারাকপুরের সিএমআরসি-তে।

তিতির হাতটা চেপে করে বিসাজের। বিসাজ যেন নিজের মনের ভিতরে চেপে রাখা কথাগুলো বলতে পেরে অনেক রিল্যাক্সড হচ্ছে, লক্ষ্য করে তিতির। বাধা দেয় না ও বিসাজকে।

জানিস তো তিতির সিএমআরসি-তে ঢোকার মুখে দেখলাম মা কী রকম শান্ত হয়ে গেছেন। আমি খুব ভয়ে ভয়ে বাড়ির যে নার্স সঙ্গে গিয়েছিল, সেই বাসন্তীদিকে বলেছিলাম, আছে তো?

তিতির জোরসে চাপ দিল বিসাজের হাতে, তোর সব সময়ে আজে বাজে চিন্তা।

না রে তিতির আমার মন বলছিল এই পুজোর দিনে কিছুতেই মা আমায় ছেড়ে চলে যেতে পারবে না।

বিসাজের দীর্ঘশ্বাসটা যেন ছুঁয়ে গেল তিতিরকে। কতদিন পর আজ ওর সঙ্গে দেখা হল। নিজের ক্যারিয়ার নিয়ে একফোঁটা একফোঁটা ভেবে হেলায় ছেড়ে দিল পেনসিলভ্যানিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির চাকরিটা। ডেভিড লুডেনের আন্ডারে পোষ্ট ডক করছিল বিসাজ। লুডেনের 'মেকিং ইন্ডিয়া হিন্দু' টা তিতিরকে পড়তে দিয়েছিল ও। কোথা দিয়ে যে কী হয়ে গেল -- মনে মনে ভাবে তিতির।

সেবার ওই নার্সিংহোমের এক আরএমও বিসাজের মাকে ভেন্টিলেশনে দেওয়ার জন্যে কী জোরাজুরি। আরএমও-র কথায় স্যাটিসফায়েড হতে পারছে না বিসাজ। আবার আরএমও মালটাও নাছোড়বান্দা।

সিটি স্ক্যান টেকনিশিয়ান আনঅফিসিয়ালি বিসাজকে বলেছিল ফারদার কোনও অ্যাটাক হয় নি। অথচ আরএমও জোর দিয়ে বলছিল সিভিয়ার অ্যাটাক হয়েছে। খুব কনফিউজড হয়ে ও সিটির প্লেটগুলো পাঠিয়েছিল অ্যাপোলোর হেমন্ত রায়ের কাছে।

উনিও এক কথায় বলে দিলেন, ফারদার কোনও অ্যাটাক হয় নি। বিসাজের বুক থেকে যেন পাথর নেমে গেল।

হেমন্ত রায়ের কথাতে বিসাজের সবথেকে আগে মনে পড়েছিল সেই সিটি টেকনিশিয়ানকে। ওর মাকে যখন আইসিসিইউ থেকে একতলায় নামিয়ে সি টি রুমে নিয়ে যাওয়া হল তখন অলরেডি রেডিওতে বিমলভূষণের গলায় 'নমো চন্ডী' শুরু হয়ে গেছে। সেদিকে অবশ্য মন দেওয়ার ফুরসত বিসাজের কোথায় তখন?

কে কী বলবে জানি না, তবে আপনাকে জোর দিয়ে বলছি আপনার মায়ের নতুন করে কোনও হেমারেজ হয় নি। আগের ইমফাক্টটা যেমন ছিল, তেমন ই আছে। আমি তো একটা অতি নগন্য টেকনিশিয়ান। ফরমালি তো কী হয়েছে তা আর আপনাকে আমি বলতে পারি না। বড় বড় ডাক্তারবাবুরা আছেন। এত্তো টেনশন করছেন আপনি, তাই মোদ্দা কথাটা বলে দিলাম। পেশেন্টের যেটা হয়েছে, সেটা স্রেফ পোষ্ট স্ট্রোক কনভালশন। ঘাবড়াবেন না-- প্রায় এক নিশ্বাসে অল্পবয়সী টেকনিশিয়ানটি কথাগুলো বলে গেল।

অবশ্য বিসাজের ভরসা একটু পরেই আরএমও-র কথায় মারাত্মক কনফিউশনে পরিণত হল। সেই আইসিসিইউ-র মেডিকেল অফিসার তো এক্ষুনি ভেন্টিলেটরে দিতে চায় মাকে। যদিও মায়ের খিঁচুনিটা তখন প্রায় কমে এসেছে। স্যাচুরেশনও নাইনটি ফাইভ থেকে নাইনটি এইটের ভিতরে ওঠানামা করছে। বিপিটাও স্টেবল।

কে ইনকিউবেট করবে ভেন্টিলেটার? বিসাজ জানতে চাইল মেডিকেল অফিসারের কাছে।

মানে? বিরক্তি ঝরে পড়ল আরএমও-র কথায়।

আসলে আমি বলছিলাম আপনি কি অ্যানাসথেটিস্ট?

আরএমওটি এবার আর বিরক্তি ধরে রাখতে পারল না, আরে এত ডাক্তারির ভাষা কপচাচ্ছেন আর এটা জানেন না যে, ভেন্টিলেটরে দেওয়াটা কোনও অপারেশন নয়। অ্যানাসথেসিয়ার কোনও ব্যাপারই নেই।

এত উদ্বেগের ভিতরেও বেশ হাসি পেল বিসাজের। মালটা নিশ্চয়ই অলটারনেটিভ মেডিসিনের, মনে মনে ভাবল সে। প্রায় কুড়ি বছর আগে এই সিভিএ নিয়েই ওর দিদিমা ভর্তি হয়েছিলেন কমলা সিনেমা হলের উল্টোদিকে হংসধ্বজ ঘোষের নার্সিং হোমে। সেখানে তো এক আরএমও চত্তির মাসে রীতিমত গাজনে সন্ন্যাসীর ভেক নিত। এইচডি ঘোষ ছিল এমপি বিদ্যুৎ চোঙদারের খুব পেয়ারের। এখন আবার গঙ্গাধর মিশ্র, বিদ্যু চোঙদার আর এইচডি ঘোষ হরিহর আত্মা।

গাইনোর ডাক্তার এইচডি ঘোষ আবার পরে চোঙদারের আশীষে এমএলএ-ও হয়ে গিয়েছিল। মনে মনে ভাবল বিসাজ, এদেরও নিশ্চয়ই কারও না কারও হাত আছে মাথার উপরে। তা না হলে ইনকিউবেট করতে অ্যানাসথেটিস্ট লাগে -- এটাও জানে না এমন একজনকে কী করে আইসিইউ-র আরএমও করে রাখার সাহস এরা পাবে!

তোকে যে উঠতে বলে গেলাম! কথাটা কানে ঢুকল না, না? এই অষ্টমীর দিনও শুয়ে শুয়ে ল্যাদ খেয়েই চলেছিস? তিতিরের চিল চিৎকারে চটকা ভেঙে গেল বিসাজের।

ধুস, বললাম তো ভাল লাগছে না। উঠব না। যাঃ। ফোট তো। তখন থেকে কানের পোকা খেয়ে ফেলল-- বলতে বলতে পাশবালিশটা আঁকড়ে পাশ ফিরে শোয়ার জোগাড় করল সে।

শালা উঠবি কি না-- বলতে বলতে সামনের টেবিল থেকে জলের গেলাসটা টেনে প্রায় অর্ধেকটা ওর মুখে উপুড় করে দিল তিতির।

ভারি ঝাট জ্বালানো মাল তো রে তুই।

সেটা এতো দিনে বুঝলি? গা পিত্তিটা কেবল তোর একার জ্বলে? না? আর কারও কিচ্ছু হয় না?

কী হয় রে তিরতিরি? --এই ডিপ্রেসনের ভিতরেও তিতিরকে তিরতিরি বলে ফেলল বিসাজ।

আসলে যখন একটু সেন্টু উথলে ওঠে তখন ওর ডাক গুলো একটু প্রাকৃত হয়ে যায়। একটু আগেই ভাবছিল, আজ মা থাকলে এতক্ষণে পাড়ার প্যান্ডেলে পুজো দিতে যাওয়ার জন্যে অস্থির করে তুলত। শুধু পুজো দিতে যাওয়া নয়। নতুন জামা পরে পুজো দিতে যেতে হবে। নতুন জামা না পরলেই মায়ের অভিমানী কণ্ঠ শোনা যেত;

যাঃ, তুই নতুন কিচ্ছু পড়ছিস নো তো? আমিও তাহলে নতুন কিছু পরব না।

আচ্ছা সব মেয়েদের মধ্যেই কি টু সাম এক্সটেন্ট 'মা' একটুখানি হলেও থেকে যায়? এই যে সে মন খারাপ করে একা ঘরের ভিতর চুপ করে শুয়ে হাবি জাবি ভাবছিল, তিতির এল। মুখে বিরক্তি দেখালেও, ভালই তো লাগছে বিসাজের।

আদর করতে গিয়ে ওর চুলে ক্যানথারাইডিনের গন্ধটা পেয়ে মায়ের গায়ের গন্ধটা যেন কোথায় মিলে মিশে শঙ্খ ঘোষের কবিতা হয়ে গেল ওর কাছে। 'তোমায় আমি বুকের ভিতর নিই নি কেন রাত্রি বেলা'।

বাইকটা নিয়ে যখন কল্যাণী এক্সপ্রেস ওয়ে-টা ছেড়ে ব্লাইন্ড স্কুলের পাশের মোরাম দেওয়া রাস্তাটায় এল ওরা আশ্বিনের আকাশে তখন ক্ষেপা শ্রাবণের ঘনঘটা। দু এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। সুন্দর একটা তিরতিরে হাওয়া দিচ্ছে। শরৎ-হেমন্তর সাথে শ্রাবণের এই পাঞ্চটা মন্দ লাগছে না। ডান হাত দিয়ে আলগা করে তিতির ওর কোমরটা জড়িয়ে রয়েছে। তিতিরের ছোঁয়াটুকু একটা হৈমন্তিক বিষন্নতা ছেয়ে দিয়েছে বিসাজের শরীরে। অনেকটা দেশি হোয়াইট মিসচিফ নয়, খাঁটি রুশিয়ান গোল্ড সিম্ফনির মত, যেখানে ডাব আর সুগার কিউবের ক্যাদ্দারি ফলাতে হয় না।

কালভার্টটার পাশে বাইকটাকে স্টান্ড করে দুজনেই পা ঝুলিয়ে বসল কালভার্টে। নীচ দিয়ে তীর তীর করে ক্যানেলের জল বয়ে চলেছে। ঝিরঝিরে বৃষ্টিটা শেষ পর্যন্ত একটুখানি ওদের ভিজিয়ে আপাতত বিদেয় হয়েছে। বৃষ্টির রেশটা থেকে গেছে তিতিরের চুলে। ওর কোঁচকানো ঘন চুল চুঁইয়ে একটু একটু জানান দিচ্ছে সদ্য থেমে যাওয়া বৃষ্টিটা।

এক ঝটকায় তিতিরকে বুকের ভিতর টেনে নিল বিসাজ। তিতিরের কানের পাশে বিন্দু বিন্দু জলে যেন ওর এক সিন্ধু জীবন যাপন। ঠোঁটের ডগা দিয়ে এখন সে শুষে নিতে চায় পৃথিবীর শেষ জল বিন্দুটুকুনিও।

কী করছিস বিসাজ? ছাড়, ছাড় বলছি। কালভার্ট থেকে এক্কেবারে ক্যানেলের জলে পড়ে যাব দুজনেই।

বেশ হবে। ভিজব তো মজা রে। ডুববো না বলেই ভিজব।

গুম করে বিসাজের পিঠে একটা কিল মেরে তিতির বলল; বল আর ও রকম মন খারাপ করে একা একা বাড়িতে নিজের ঘরে শুয়ে শুয়ে গজরাবি না।

কী করব বলতে পারিস তিরতিরি? পাছে বাবা কষ্ট পাবে, ছোটমাসী কষ্ট পাবে-- তাই একফোঁটা চোখের

জীবনে একটা চকলেট বোম ইসমাইলদা ফাটিয়েছে কিনা সন্দেহ। সেই লোকটা নাকি মাদ্রাসায় জেহাদি শিক্ষা দেয়, তাই তার গায়ে লটকে দেওয়া হয়েছিল একটা লেবেল।

জলও ফেলতে পারি না। মা চলে যাওয়ার খবরটা প্রথম যখন সুব্রতদা দিল, জানিস তিতির, কী যে বুক নিঙড়োনো কান্নায় বাবা ডুকরে উঠেছিল।

আগে ভাবতাম, ওদের ভিতর বুঝি প্রেম-টেম আদৌ নেই। আছে কেবল কর্তব্যের তাগিদ। সেই রাতে বুঝেছিলাম রে প্রেম কি জিনিষ।

বিসাজকে ইচ্ছে করেই একটু ডাইভারটেড করে দিতে দূরের একটা বড় বিল্ডিং দেখিয়ে তিতির বলল; ওটা কী রে?

কী বলতো? আগে তো কখনও দেখি নি এখানে অমন পেল্লায় একটা বাড়ি।

কথার জবাবে তিতির বলে; আসার সময়ে লক্ষ্য করেছিস আমাদের শহরে রাস্তার মোড়ে মোড়ে শনি ঠাকুরের মন্দিরকে টেক্কা দিয়ে এই শহর লাগায়ো না গ্রাম, না শহরে কেমন একটু দূরে দূরেই চার্চ আর মসজিদ তৈরি হচ্ছে।

জবাব না দিয়ে বিসাজ গুন গুন করে উঠল কবীর সুমনের গান; ওই তো মানুষ ধর্মের কথা বলছে। আগুনে তিনটি মানুষের দেহ জ্বলছে। কেওনঝারের আদিবাসীদের গ্রামে...

কী হল গানটা হট করে থামিয়ে দিলি যে?

না রে তিতির। কেসটা দেখতেই হচ্ছে।

ফেলুদা, এখানে আবার কোন কেস? কথার চিমটি কাটল তিতির।

এই যে ফেলু মিত্তির। বকেই যাবেন? ঘড়ির কাঁটার দিকে নজর আছে? পেটে যে ছুঁচোয় ডন মারছে।

তিতিরের দিকে না তাকিয়েই বিসাজ বলল; আরে খালি তো ক্যালরি স্টোরই করে যাচ্ছিস। একটু বার্ণ হতে দে।

কথা না বাড়িয়ে তিতির ফর্মে চলে আসা বিসাজের হাতটা ধরে একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে বেশ ঝাঁজের সঙ্গে বলল, তোর না হয় হাওয়া খেলে পেট ভরবে। আমার কিন্তু জোর খিদে পেয়েছে। সকালে অঞ্জলি দেব বলে কিছু না খেয়েই তোদের বাড়িতে এসেছিলাম। কোথাও খেতে যাবি তো চল, নয়ত আমায় বাড়িতে ছেড়ে দে।

খিদে পেলে তিতিরের মাথার ঘিলুগুলো সব ওর মুখের মতই কলবল করে ওঠে- এটা ভালই জানে বিসাজ। আর কথা না বাড়িয়ে বাইক স্টার্ট দিয়ে বলল, কোথায় খাবি বল?

শোন, এইখানটাতেই ইসমাইলদার বাড়ি না? কতোদিন বল ওদের কোনও খবর জানি না। চল যাবি একবার?

- তিতিরের যেন ঘিলু গলানো ক্ষিদে এক নিমেষে উধাও হয়ে গেছে।

বিসাজের যে এখানে এসে থেকে ইসমাইলদার কথা একবারও মনে পড়ে নি তা নয়। তিতিরকে ওদের বাড়ি যাওয়ার কথা বলি বলি করেও শেষ পর্যন্ত আর বলে ওঠা হয় নি।

মনটা যেন তিতিরের একটা কথায় নেচে উঠল বিসাজের।

চল বলে সোজা বাইক ঘুরিয়ে ইসমাইলদার বাড়ির দিকে।

আরে কী বাঁদর ছেলে তোরা। ভরদুপুরে এলি আগে একটা ফোন করবি তো?

—ইসমাইলদার গলার গভীর প্রশ্রয় ঝরে পড়লো।

ইসমাইলদার কাছে আসতে কেমন যেন একটা অপরাধবোধ কাজ করে বিসাজের ভিতরে। ভাবে আরও কত কাল এই অগ্নিপরীক্ষার ভিতর দিয়ে যেতে হবে ইসমাইলদাদের? কেবল জন্মসূত্রে ধর্ম পরিচয় আলাদা বলেই ওঁদের বার বার পরীক্ষা দিতে হবে?

একটা খারিজি মাদ্রাসায় পড়িয়ে পেটের ভাত জোগাড় করে ইসমাইলদা। খুব ভাল সেলাই মেশিনের কাজ জানে। মায়ের সেলাই মেশিনটা প্রায়ই খারাপ হয়। মা সাবেকী টেলারিংয়ের দোকান জীবন আলয়ের জীবনদাকে মাঝে মাঝেই মেশিনের এটা সেটা বলে। জীবনদাই মায়ের কাছে ইসমাইলদাকে নিয়ে এসেছিল প্রথম। তারপর থেকে ধীরে ধীরে ইসমাইলদা বিসাজদের বাড়ির মানুষ হয়ে গেছে।

প্রতি বছর বাসন্তী পুজোর সময়ে কুমোরটুলির যতীন পালের কাছ থেকে ঠাকুর আনার সময়ে লরিতে জলের বোতলে ভদকার সঙ্গে জলের প্রোপোরশন থেকে মুড়িতে চ্যানাচুরের ঠিক মত মিশেলই নয়, সদর দরজা দিয়ে কায়দা করে ঠাকুর ঢোকানো থেকে শুরু করে নবমীর বলির চাল কুমড়ো জোগারই শুধু নয়, লোক না থাকলে বলি দেওয়া —সবেতেই ইসমাইলদা।

মা'র অসুখের সময়ে বিসাজের সঙ্গেই দিনরাত এক করে অ্যাপোলোতে পড়ে থেকেছিল মানুষটা। জীবনে একটা চকলেট বোম ইসমাইলদা ফাটিয়েছে কিনা সন্দেহ। সেই লোকটা নাকি মাদ্রাসায় জেহাদি শিক্ষা দেয়, তাই তার গায়ে লটকে দেওয়া হয়েছিল একটা লেবেল। বিসাজ যখন ব্যারাকপুর সাব জেলে ইন্টারভিউ স্লিপটা এগিয়ে দিয়েছিল ইসমাইলদার সঙ্গে দেখা করতে ঘুলঘুলিটার ভিতর দিয়ে তখনই কানে এসেছিল রাইডারের শ্লেষ, ও ওই ইসমাইল জেহাদির সঙ্গে দেখা করবেন?

ভুলতে পারে না বিসাজ। আজ এই অষ্টমীর দুপুরে দূর থেকে ভেসে আসা ঢাকের আওয়াজ আর মাতাল করে দেওয়া ছাতিম ফুলের গন্ধে তিতিরকে পাশে নিয়ে ইসমাইলদার দহলিজে বসে বসে তার কেবলই মনে হচ্ছে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নাটকের সেই সংলাপ; 'এ আমার পাপ, এ তোমার পাপ।'

গল্প ২

প্রাপ্তি

রুমেলা দাশ

নতুন জায়গা; নতুন শহর; নতুন অভিজ্ঞতা! যেন পুরোনো জামা কাপড়কে অনেকটা শীতের মিঠে রোদে মেলে দেওয়ার মত; শরীর, আত্মা সেই কবেকার অথচ সবটাকে সেঁকে নেওয়ার জন্য নতুনে খানিক এগিয়ে দেওয়া!

একটা ঘটনা,

সম্পূর্ণ আলাদা একটা মেজাজ নিয়ে অনেক ঘটনার সঙ্গে মিলে মিশে আমার অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎকে জাপটে জুপটে গেঁড়ে বসে আছে আজও। দিন যায়, সপ্তাহ যায়, মাস যায় অথচ বিশেষ ওই অংশটুকুর কোনও হেরফের নেই। রয়ে যায় একই রূপ, রস, গন্ধ নিয়ে। ভণিতায় না গিয়ে আসল কথায় ফিরে আসি; কী বলেন! বয়স আমার সত্তর ছুঁইছুঁই। তবু এখনও দিব্যি আমার তিন বছরের নাতিটার মত মনের কোণে আবোলতাবোল আঁকিঝুঁকি কাটি সেই দিনগুলোর!

কথাগুলো বলতে গেলে আমার আপাতত লাইফ টাইম খাতার কয়েকটা আগের পাতা ওল্টাতে হবে! তাই সই-ই!

আমি রমাপদ;

পদবী জানা নেই; মানে আর পাঁচটা অনাথ শিশুদের ক্ষেত্রে যা হয় আমারও তাই; অর্থাৎ নাম পদবী অন্যের দেওয়া। অন্যের পছন্দমত; নামটা কচ্চিৎ ব্যবহার হলেও পদবী ব্যবহারের মায়া তাই আমার তেমন নেই। তবে বাবা-মা না থাকলেও খেতে পাওয়ার কপালটা একটু খোলতাই ছিল; কোনওমতে কোথা থেকে যেন চোখে পড়ে গেছিলাম শিউচরণ দাশের।

নিপাট শান্তশিষ্ট ভাল মানুষ শিউচরণ থাকতেন দক্ষিণ কলকাতার কোনও এক বনেদি বাড়িতে। থাকতেন বলতে ওই ফাইফরমাস খাটতেন গোটা বসু পরিবারের। ভগবান ভক্তি তাঁর চরিত্রের একটা বিশেষ দিক! তাই কাজের ফাঁকে ফাঁকে বসুবাড়ির ঠাকুরের থানেই তাঁর মন পড়ে থাকত বেশি। দিনান্তে কিংবা দুপুরের কোনও এক সময়ে যখন ব্যস্ত বাড়ির দালান খানিকটা নির্জন হত; কাজের লোকজন গা এলাত বিশ্রামে; শিউচরণ সেই একান্ত সময়টাতেই বাগানের শিউলি ফুল পেড়ে, কখনও গাঁদা ফুলে সূঁচ সুতো পরিয়ে ঠাকুরের সেবা করত চুপি চুপি। তবে তাঁর বুকে ঢুকপুকানি চলত ভয় হত, জাতিতে সে শুদ্র; কে জানে কর্তাবাবারা যদি আবার কোনও দোষ দেন! সত্যিকারের ব্রাহ্মণ ছাড়া এসব কাজ অপরাধের তো বটেই; তা শিউচরণের এই কান্ডকারখানা একদিন সত্যি সত্যি বাড়ির কর্তামশাইয়ের নজরে আসে! সরাসরি ডেকে পাঠান বড় কর্তা সুবিমল বসু! ভয়, দ্বিধা নিয়ে কাঁপা কাঁপা পায়ে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ায় শিউচরণ! ভাবে, কপালে কী আছে ঈশ্বর জানে; তিনকুলে কেউ নেই। গ্রামের ভিটে মাটি ছাড়ার পর শহরে বহুকষ্টে একটা কাজ যাও বা পাওয়া গেছিল, হয়ত নিজেরই বোকামো-র জন্যই হাতছাড়া হবে; নাহলে কী আর তড়িৎঘরিৎ কর্তা এমনভাবে ডেকে পাঠান? নির্ঘাত কাজ থেকে বিদায় দেবেন!"

কিন্তু মানুষ ভাবে এক আর হয় আরেক। শ্রীযুক্ত সুবিমল বসু শিউচরণকে ধমক দিলেন বটে, তবে সে ধমক ভালবাসার। শিউচরণের এই লুকোনো কীর্তিই তাঁকে বসু বাড়ির অনেকটা কাছের করে দিয়েছে। সেদিন থেকেই কায়স্থ বাড়ির পুজোআচ্চার যাবতীয় দায়ভার গিয়ে পড়ল শিউচরণের কাঁধে। এ স্বয়ং ঈশ্বরের আশীর্বাদ ছাড়া আর কী! নাহলে এত বড় জীবনের প্রাপ্তি...! এমনটা মনে করেন শিউচরণ। কিন্তু আমার এতে ঘোর আপত্তি বিপত্তি সবকিছু! যা চোখে দেখা যায় না, যাকে অনুভব করারও কোনওরকম উপায় নেই। শাঁখ ঘণ্টা বাজিয়ে তাকে পুজো করার মানেটা কী? আর সত্যি যদি কোথাও না কোথাও তিনি থাকতেন তাহলে আমি রমাপদ-র জীবনটা এমন তছনছ হত? বাপ-মা এভাবে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে রেখে যেতে পারতেন আমাকে? কোথায় আমার বাড়ি...? আমার ধমনীতে কার রক্ত কোনওদিনই জানতে পারব না..! এ যে কত বড় ব্যর্থতা!

ঠাকুর বলে আদপে কিছু আছে কিনা জানি না; আসলে আমার ওসবে বিশ্বাসটাই তৈরি হয় নি কোনওদিন। কিন্তু জ্ঞান হওয়া ইস্তক বারবার শিউচরণ আমার পালিত বাবার কাছে শুনেছি;

“বিয়ে থা করলুম না। দেখলি ঠিক জগৎজননী মা আমাকে সন্তান দিয়ে দিল! কত বড় পুণ্যি বলে বোঝাতে পারব না! মা সবার দুঃখু বোঝে। এক জীবন কারুর পুরো ভাল পুরো মন্দে কাটে না। প্লাসে মাইনাসে কাটাকাটি হয়ে ফল ‘শূন্য’ নিয়ে যেমন ধরাধামে আসা, তেমনই ‘শূন্য’ নিয়েই ফিরে যাওয়া; এ হিসেব সবার জন্য! কারুর কম বেশি নয়!”

আমার এসব কথাবার্তা শুনতে একদম ভাল লাগত না। বসুবাড়ির ঠাকুর দালানের পাশের ছোটখাটো স্যাঁতস্যাঁতে ঘরে শিউচরণের সঙ্গে থাকতে থাকতে ছোট থেকেই আমার দম বন্ধ করে আসত। মনে হত, “ধুর না জানি আরও বেশি কিছু প্রাপ্তি আমার জীবনেও ছিল!” চারপায়ের ঘরটা হয়ত আমাকে সেসব থেকে অনেকটা দূরে সরিয়ে রেখেছে, কেন জানি না ছোট মনেই আমার বড় হওয়ার অনেক বড় বড় বাসনা ছত্রাকের মত গজিয়ে উঠেছিল। আমি খাঁচায় বন্দি পাখির মত ছটফট করতাম, কখনও অস্থির পায়ে ছুটে বেরিয়ে যেতাম ঘর থেকে। কিন্তু এর সঙ্গে একটা ব্যাপার আমার এখন এই ভেবে আশ্চর্য লাগে যে সেসময় আমার এগুলো ভাবার কোনও কারণই ছিল না, কারণ বড় হওয়ার বিশেষ করে আরামি রোজনামচার সংজ্ঞাটা ঠিক যে কী তাতো আমি জানতামই না তবে...?

বাংলায় একটা প্রবাদ আছে, “যে প্রাণী মানুষের রক্তের স্বাদ পায়, সেই তো নরখাদক হয়; রক্তের স্বাদ যতক্ষণ না পায় ততক্ষণ প্রাণীর হাজার খিদে পেলেও সে মানুষ মারতে শেখে না!” তাহলে এই ‘আমি’র মাঝে অন্য ‘আমি’টা কে? যে আমাকে ছুটিয়ে বের করত ঘর থেকে, বাবার মত ভালবাসার মানুষটার বুকে আশ্রয় নিয়েও ঘুম ছুট চোখে নেশা ধরাত কোনও নেশালু রঙিন রাতের! একটু একটু করে জেগে ওঠা এই ‘আমি’ ঠিক কী চায়?

বসুবাড়িতে ছিল অনেকটা পুরোনো কলকাতার জমিদারবাড়ির মত আদব কায়দা। চোখ মেলে তাকিয়ে দেখতাম সে বাড়ির বেশ কয়েক প্রজন্ম আগের বৈভবের দিকে; ছুঁয়ে দেখতাম নাচঘরের ইঁট; দালানের দামি দেওয়াল পাথরের মিলিয়ে যাওয়া ঐশ্বর্য। আর আমার ভেতরে চিকচিকিয়ে উঠত ডানা বুজে বসে থাকা সেই ‘অন্য আমি’-র ঝলমলে অসংখ্য বুদ্বুদ।

বড় হতে হতে দেখেছিলাম সে বাড়ির বড়কর্তা পরলোকগমন করার কিছু আগে থেকেই বাড়িটা যেন একটু একটু করে মিইয়ে যাচ্ছে। বুঝতে পারছিলাম যে যার প্রাপ্য বুঝে নিজস্ব সামিয়ানা গড়ার নেশায় ছিটকে যাচ্ছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে; কেউবা দেশের বাইরেও। তাও মাঝেমধ্যে ছিটকে যাওয়া বংশধরেরাও আসত বাড়ির সঙ্গে শেষ নাড়ির টানে। আমি ওঁদের লক্ষ করতাম মন দিয়ে। বেশিরভাগই যখন দামি গাড়ি, দামি পোশাক হাঁকিয়ে বছরান্তে সামনের নুড়ি বিছানো রাস্তা মাড়িয়ে চাকায় কড়কড় শব্দ তুলে বাড়িতে ঢুকত আমারও বুকের ভেতর ছলাৎ করে উঠত, দালান পাশের ছোট্ট ঘর থেকে উঁকি দিয়ে ভাবতাম, ‘আমাকেও ওমন গাড়ি হাঁকাতে হবে! অমন দামি আদপ কায়দা রপ্ত করতে হবে!’

কী করে জানি না সেই অন্য 'আমি'টা আমাকে অস্থির করে তুলছিল এভাবেই বছরের পর বছর ধরে।

আমি সামান্য মানুষ!

তাকে উপেক্ষা করার সাধ্য আমার নেই! তাই 'অন্য আমি'কে আমিও একটু একটু করে নিজের ভেতর নিঃশব্দে শেকড় গাড়তে দেখেছিলাম। স্কুল পাশ করার পর বেজায় চেষ্টা চরিত্র করে, প্রয়োজনে নানা লোকের তৈলমর্দন করে কলেজ পাশ, এমনকি এমবিএ পর্যন্ত পড়ে ফেলেছিলাম। বড় হওয়ার পথে কোনও দ্বিধাই আমাকে আটকাতে পারেনি! না পেরেছিল কোনও ভালমানুষির সংশয়! কোনও কিছুর তোয়াক্কা না করেই কলকাতার বাইরেই থেকে গেছিলাম প্রায় দশ-দশটা বছর। বুঝতে পারছিলাম এগিয়ে যাওয়ার যাবতীয় উপায় বাতলানোর সঙ্গে সঙ্গে আমার যা-কিছু ইমোশন সব যেন আলগা হয়ে যাচ্ছে। রীতিমত ঘাম ঝরিয়ে চেষ্টা চরিত্র করে ভাল আইটি জবও হয়েছিল হায়দ্রাবাদে এসে। নাহ পদবী বা বাবা-মায়ের নাম নিয়ে কেউ কোনও ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করত না। সত্যি কথা বলতে কী কেউ আমাকে চট করে ঘাঁটাতে আসত না, নিতান্ত ছাপোষা গোবেচারা তকমাটা যে আমি দাঁত দিয়ে টেনে ছিঁড়ে ফেলেছিলাম। পায়ের নীচের শক্ত জমিটা যে শুধু সৎ থেকে রেজাল্ট দিয়ে করা যায় না; সেকথা আমি ছাড়া আর ভাল করে কেই বা জানবে? আমার না-হয় নেহাৎ বংশ পরিচয় নেই, কিন্তু হাই-ফাই রেজাল্ট করা পাড়ারই সত্যি জেঠুর ছেলে কৌশিকের কী হাল? বেচারা মার্কস গলায় ঝুলিয়ে বসে আছে; চাকরির ত্রিসীমানায় যেতে পারছে না। লিস্টে নাম ওঠা সত্ত্বেও কোনও চেনা জানা হাত ওর থেকে বিশ-পঁচিশ নম্বরের নীচের ছাত্রকে ওপরে তুলে দিয়েছে। আর ওর বাবা সরকারি চাকরি করেও এক পয়সা হাতটান করেন নি। তাইতো মনে মনে ওনাকে সত্যিজেঠু নাম দিয়েছিলাম। নাও এবার ঠেলা সামলাও! বেঁচে থাকো চিরকালীন মধ্যবিত্ত মেন্টালিটি নিয়ে! আর ভাগ্যকে দোষ দাও!

সবকিছু মোটামুটি ঠিকঠাক করার পরে আমি নতুন শহরে এসে পড়েছিলাম। ভালই চলছিল। কিন্তু হঠাৎই একটা সমস্যায় পড়ি! ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না; কাউকে ঠিক বলাও যাচ্ছিল না! এককথায় রাতের ঘুম উড়ে গেছিল।

নিজামের শহর, হায়দ্রাবাদ। পুরোনো ঐতিহ্যের পাশাপাশি ভারতের আইটি হাব-ও বটে! তাই থাকার জায়গার জন্য বিশেষ কাঠ-খড় পোহাতে হয়নি। ঘর পেয়ে যাই ডিল্যাক্স বয়েজ হোস্টেলেই। হোস্টেল থেকে হাঁটা পথে অফিস! মাঝে মধ্যে রাতের ডিনার হায়দ্রাবাদী বিরিয়ানি; জমিয়ে ভালমন্দ খাওয়া বেশ চলছিল।

আচমকাই একটা ঘটনা ঘটল!

এখানকার মেন রোডে গাড়ি চলাচল করে সাংঘাতিক! যেহেতু এখনও নিজস্ব যানের ব্যবস্থা করে উঠতে পারি নি আর হোস্টেল থেকে অফিসের দূরত্বও খুব একটা বেশি নয় তাই একটা গলিপথ খুঁজে বের

বড় হতে হতে দেখেছিলাম সে বাড়ির বড়কর্তা পরলোকগমন করার কিছু আগে থেকেই বাড়িটা যেন একটু একটু করে মিইয়ে যাচ্ছে। বুঝতে পারছিলাম যে যার প্রাপ্য বুঝে নিজস্ব সামিয়ানা গড়ার নেশায় ছিটকে যাচ্ছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে; কেউবা দেশের বাইরেও। তাও মাঝেমধ্যে ছিটকে যাওয়া বংশধরেরাও আসত বাড়ির সঙ্গে শেষ নাড়ির টানে।

করি। সেটা দিয়েই দু'বেলা যাতায়াত করতাম; বেশ নিঝুম আর ছায়া ছায়া জায়গা। চারধারে যেমন ফ্ল্যাট বাড়ির বহর এখানে তেমনটা নেই; মনে মনে একটু অবাকই হয়েছিলাম। কারণ প্রতি সেকেন্ডে উন্নতির শিখরে ওঠা শহরটা যেভাবে মানুষ থাকার বস্তিতে পরিণত হচ্ছে তাতে খুব বেশি দিন এই একটু ফাঁকা জায়গাও যে আর অবশিষ্ট থাকবে এমন কথা মনে হয় না। অবশ্য তাতে আমার কী এল গেল; বাকিদের মত আমিও এসেছি কামাতে! থাকব, খাব, কামাব; এর বাইরে দুনিয়াদারির খবর রাখতে গেলে আর বাঁচতে হবে না! মাথা থেকে আলফাল চিন্তা ঝেড়েই

ফেলেছিলাম প্রায়...!

একদিন অফিসে যাওয়ার সময়টায় দেখি আমার সামনে দিয়ে কেউ যেন চেনাপরিচিত ভাষায় কথা বলতে বলতে যাচ্ছে! বাংলা...? তার মানে বাঙালি! এখানে বাঙালি বেশ ভালই আছে, আসলে কলকাতা বা আশপাশ থেকে অনেকেই তো আসেন জব জয়েন করতে। তাদের কেউ কেউ পরিবার নিয়েও থেকে যান এই শহরে! দেখলাম বাচ্চাটা মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে টলমল হাতে একটা রঙিন ছাতা কোনওমতে নিজের মাথার ওপরে ধরে আছে; আর খুব কথা বলে যাচ্ছে পাশের হাত ধরা মানুষটার সঙ্গে। ব্যাপারটা খুবই সাধারণ! বাচ্চাটা স্কুলে যাচ্ছে; এমন প্রায় মাস খানেক ধরেই দেখি। আমি চলার পথে খানিকটা হেঁটে এগোলেই একইভাবে বাবা-বাচ্চা হাত ধরাধরি করে আমার ঠিক নাক বরাবর এসে হাজির হয়। আমতা আমতা শিশু গলায় পরিচিত কথা ভেসে আসে কানে। তবে অফিসের তাড়া থাকায় ভাল করে ওদের কথা খেয়াল করি নি কোনওদিনই। তালগোল পেকেছিল তারও কয়েকদিন বাদে। সেদিন অফিসে তাড়া ছিল। কী যেন একটা প্রজেক্ট মিটিং ডেকেছিল অফিস আওয়ার্সের আগেই। আমি গলিপথে আসতেই দেখি আমার সামনে সামনে ওরা চলেছে! বাচ্চাটার স্কুল কী আজ আগে শুরু হবে? এত সকালে? তাড়াতাড়ি ওদের পাশ কাটিয়ে এগোতে গিয়েই দেখি ওরা নেই! মানে...?

ব্যাপারটা কী হল?

ভ্যানিশ?

এই তো ছিল! অফিসে দেরি হচ্ছিল তাও এগিয়ে গিয়েও সেকেন্ডের জন্য পেছনে তাকালাম! নাহ নেই...! কোত্থাও নেই! কী জ্বালা। সেদিন মাথায় এত কাজের প্রেশার ছিল ব্যাপারটা নিয়ে অতটা জলঘোলা করে ভাবি নি। তারপরের চার-পাঁচদিন একইরকম ব্যস্ততায় কেটেছে। রোজ-ই বাড়ি থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়েছি, মনে মনে অবাক হয়েছি; প্রতিদিনই একইভাবে ওরা আমার সামনে এসেছে আবার আমি এগিয়ে গেলে হারিয়েও গেছে! নিজেকে ক্রমাগত বুঝিয়েছি সবটাই হয়ত বা আমার মনের ভুল! কিন্তু তাই বা কী করে হয়? এতদিন ধরে যে দু'দুটো জলজ্যান্ত মানুষ চোখের সামনে হেঁটে গেছে! চিন্তাগুলো ঘোঁট পাকছিল। আচ্ছা যখনই দেখেছি ওরা সামনে দিয়ে হেঁটে যেত এটা কী খেয়াল করেছি ওরা আসত কোথা থেকে? যে গলিটা ধরে চলাচল করি সেটার ডায়ে-বাঁয়ে অন্য কোনও গলিপথ তো নেই; তবে...! রীতিমত সোজাই একটা পথ গিয়ে উঠেছে বড় রাস্তায়! তাহলে কী এতদিন আমি ধাঁধার মধ্যে ছিলাম...? চরম ভাবনায় কুঁচকে আসছিল ভ্রূ'র সোজাসুজি দুটো সমান্তরাল রেখা!

রাতে ঘুমাতে গেলেও ছেলেটার বকবক আর ওর হাতে ধরা রঙিন ছাতাটা মনে পড়ে যাচ্ছিল বারবার। ঘুম আসত না চোখে! বারবার মনে হত ওরা দু'জন যেন আমার ধারে কাছেই আছে। আমি ওদের শরীরের তাপ পাচ্ছি; ওদের অদৃশ্য অনুভব যেন সমস্ত 'আমি'কেই ঘিরে রয়েছে। আমার 'আমি' ভয় পাচ্ছে; পিছু হটছে...! কিন্তু কেন? কেন এসব হচ্ছে আমার সঙ্গে? কেমন একটা অসহায় অবস্থা! রাতে দিনে যখনই একটু একা একটু নিজের সঙ্গে থাকার অবসর আসে ঠিক তখনই ঠিক সেই মুহূর্তেই ভাবনারা তালগোল পাকাতে থাকে।

এরকমই একটা দোলাচল অবস্থার মধ্যে ভোররাতের দিকে একটা স্বপ্ন দেখি;

নামেই স্বপ্ন!

স্বপ্ন যে এত স্পষ্ট, এত পরিষ্কার হয় আমার জানা ছিল না। সেটা যে ঘুম ভাঙার পরে এভাবে মনেও থাকতে পারে সাতাশ বছরের জীবনে তাও জানা ছিল না আমার। মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি দানা বাঁধছিল। কিছু যেন একটা; কিছু যেন একটা আটকে ছিল গলার কাছটায়! ভাবনা, দোনামনা চরম টানাপোড়েনে হঠাৎ মাথার মধ্যে চিড়িক করে ওঠে; ঝাপসা ঝাপসা চেনা কিছু ছবি ভেসে ওঠে সামনে! ...সত্যি? নিজের চেনা ছবিগুলো নিজেরই বিশ্বাস করতে বাধছিল! তবে কী...?

কোথায় দেখেছি, কোথায় দেখেছি মনে করতে করতে মনে পড়ে গেছিল ঠিক ঐরকমই একটা লাল-নীল রঙিন ছাতা! আলতো ডগমগ হাতে যেটা প্রায়ই চোখে পড়ত বাচ্চাটার হাতে; হ্যাঁ ঠিকই...! একেবারে হুবহু... তো ছেলেবেলায় আমারও ছিল;

সঙ্গে করে নিয়ে স্কুলেও যেতাম; কিন্তু তারপর...! স্কুলের দিব্যেন্দু, শ্যামলরা যে দামি রেনকোট পরে আসত, কখনও বা ওদের হাতের অন্যরকম ছাতা দেখে হাত পা ছুঁড়ে বায়না করতাম বাড়ি এসে। বেশ মনে আছে এরকম একদিন বায়নার শেষে নাওয়া খাওয়া ছেড়ে আমি যখন মেজাজ দেখিয়ে ঘরের মেঝেতে বসে, বাবার মত মানুষটা বলেছিল,

"যা আছে তাইতেই ভাল থাকার চেষ্টা করিস। যা হয় না তাকে জোর করে আঁকড়াতে যাস না। তা দেখে কখনও লোভ করিস না; দেখবি ধৈর্য্য ধরলে মা তোকে সব দেবে! খেয়ে নে বাবা!"

শুনি নি আমি কিছুই শুনি নি সেদিন। ছাতাটাও যে কোথায় হারিয়েছিলাম নাকি কোথাও ফেলে দিয়েছিলাম ঠিক মনে করতে পারছি না। কেন মনে পড়ছে না আর কিছু...?

আজ এতবছর পর এসব হঠাৎ করে মনেই বা আসছে কেন আমার? এইরকম রঙিন ছাতা হাজার একটা ছোট শিশুর-ই তো থাকতে পারে! তবে...? মনকে বোঝাচ্ছিলাম। শান্ত করবার চেষ্টা করছিলাম কিন্তু পারছিলাম না। কেমন যেন মনে হচ্ছিল আমার 'আমি' ডুকরে কেঁদে উঠছে। কিছু একটা 'নেই' আমাকে সবকিছু থেকে নিঃসঙ্গ দীন করে দিচ্ছে প্রতিনিয়ত!

বুকের ভেতরটা চলকে উঠছিল কোনও অজানা কারণেই।

রাত শেষ হয়ে আসছিল। দেখি লাল থালার মত সূর্য কালো আকাশ সরিয়ে একটু একটু করে তার আলো আভা ছড়াচ্ছে। সকাল হয়েছে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি অফিসে যাব বলে তৈরি হয়ে নিই। আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনের কোণে উঁকি দেওয়া সন্দেহগুলো পিছিয়ে পড়ছিল। সাধারণ সহজ বাস্তব মেনে আমি মনে মনে ঠিকই করে নিয়েছিলাম আজ আমাকে যে করেই হোক ওই ছোট্ট ছেলেটা আর ওর বাবার সঙ্গে কথা বলতেই হবে! সবকিছু থেকে নিজেকে সরিয়ে নয়, সবকিছুর সামনে থেকে বাস্তবটাকে মেনে নিতে হবে।

এই ক'দিনের টানা দুশ্চিন্তায় মনে জেদ আনলেও শরীর যেন কোনওভাবেই সায় দিচ্ছিল না। মাথা ভার হয়েছিল। চোখ জ্বালা করছিল বিনিদ্রায়। কোনওমতে পা টেনে টেনে পৌঁছে যাই নির্জন গাছগাছালি ঘেরা মাঠের মাঝের রাস্তাটায়। ফোনে সময় দেখে বুঝি রোজ যে সময়ে আমি বেরোই তাড়াহুড়োতে তার থেকে বেশ অনেকটা আগেই চলে এসেছি। কিন্তু যতই আগে আসি না কেন; ওদের দেখে তবেই আমি যাব ঠিক করি! অপেক্ষা করি একঘণ্টা। কিন্তু নাহ ছোট্ট ছেলেটা, ওর বাবা কাউকেই দেখি নি সেদিন। মনের মধ্যে যে কী অসম্ভব অস্থিরতা কাজ করছিল সেসময় বলে বোঝাতে পারব না। আমিও দমে যাওয়ার পাত্র নয়। জীবনে কম ঝড় পেরিয়ে আসিনি। বাপ-মা বংশপরিচয় ছাড়া এই সমাজের বুকে মাথা তুলে তো দাঁড়িয়েছি! কেউ আমাকে হাতে তুলে সুযোগ

রাতে ঘুমাতে গেলেও ছেলেটার বকবক আর ওর হাতে ধরা রঙিন ছাতাটা মনে পড়ে যাচ্ছিল বারবার। ঘুম আসত না চোখে! বারবার মনে হত ওরা দু'জন যেন আমার ধারে কাছেই আছে। আমি ওদের শরীরের তাপ পাচ্ছি; ওদের অদৃশ্য অনুভব যেন সমস্ত 'আমি'কেই ঘিরে রয়েছে। আমার 'আমি' ভয় পাচ্ছে; পিছু হটছে...! কিন্তু কেন?

তো করে দেয় নি? মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে যাচ্ছিলাম অবিরাম। বারবার মাথা তুলে দাঁড়াতে চাইছিলাম। কিন্তু বারবারই মনে হচ্ছিল কেউ যেন আমার হাঁটু দুটোতে অদৃশ্য হাতুড়ি মেরে ভেতর ভেতর দুর্বল করে দিচ্ছে। একবার মনে হল আমি কী পাগল হয়ে গেলাম? তাও এত সামান্য একটা কারণে? কই এতদিন তো এমন কিছু হয় নি! রোজ-ই সকালবেলা ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করতাম। ফিরে আসতাম। আবার যেতাম। কিন্তু এরপরের একটা মাসেও আমি ওদের খুঁজে পাইনি। বা বলা ভাল আমি ওদের হারিয়ে ফেলেছি চিরদিনের মত! যেমন হারিয়ে ফেলেছিলাম আমার ছোট্টবেলার সেই হুবহু দেখতে রামধনু ছাতাটাকেও!

অসহনীয় একটা কষ্ট বুকের মধ্যে হাঁকপাক করছিল।

এতদিন ওই জায়গায় অবান্তর ঘোরাফেরা করতে দেখে একজন স্থানীয় লোকের কৌতূহল হয়েছিল, কথায় কথায় সে জিজ্ঞাসা করেছিল আমি কিছু খুঁজছি কিনা! কীই বা বলব? স্পষ্ট করে কিছুই উত্তর দিয়ে উঠতে পারি নি আমি। লোকটা বেশ কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়েছিল, জঙ্গলের পাশে গাদা হয়ে পড়ে থাকা ভাঙাচোরা পরিত্যক্ত একটা বাড়ি দেখিয়ে বলেছিল,

"বহু বছর আগে নাকি এখানে কীসের পুজো হত। কোনও পাগলা সাধু পুজো করত পাথুরে মূর্তিতে। কালের স্রোতে সেসব কবে হারিয়ে গেছে! কিন্তু এখন জমি জায়গার যা চাহিদা ফাঁকা কী আর কিছু থাকে? কিন্তু কপালের এতই ফের! এই জায়গাটা যতবারই প্রমোটার নিতে এসেছে। ততবারই কোনও না কোনও সমস্যায় পড়েছে। তাই এখন আপাতত এদিকটায় কেউ নজর দেয় না।" আমাকে ঘোরাফেরা করতে দেখে লোকটা সেরকমই প্রমোটারের শাকরেদ বলে হয়ত ভেবেছিল!

কথাগুলো শুনে হাত পা ঘেমে উঠছিল। মনে হচ্ছিল আমার গোটা শরীরটাকে মাটির সঙ্গে কেউ পুঁতে দিচ্ছে একটু একটু করে। এও কী বিশ্বাসযোগ্য? লোকটা হয়ত আমাকে নেহাতই বুরবক বানাচ্ছে! নিজের ওপর নিজেরই রাগ ধরছিল কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে একটা পুরোনো অপরাধবোধও আমার শরীরটাকে নিস্তেজ করে দিচ্ছিল। যেন দুই ভিন্ন 'আমি'র মাঝে একটামাত্র ইচ্ছে শক্তি নিয়ে সেতু হয়ে দাঁড়িয়ে আছি।

মাথার ঠিক রাখতে পারছিলাম না। সমস্ত কাজ ফেলে অফিসে গিয়েই একে ওকে ফোন করে জোগাড় করেছিলাম একটা ফোন নাম্বার।

একটা চেনা অথচ ভুলে যাওয়া ফোন নাম্বার!

ডায়াল করেছিলাম ঘামে ভিজে ওঠা কাঁপা কাঁপা হাতে! গলাটা কেমন যেন শুকিয়ে আসছিল; প্রাণটা অল্প মুহূর্তের জন্য আটকে ধুকপুক করছিল ঠিক ন্ট্রির কাছটায়।

ফোনের ওপার থেকে একটা গলার আওয়াজ শুনেছিলাম। চেনা অথচ ভুলতে বসা একটা গলার আওয়াজ!

আজ অনেকগুলো বছরের পর;

হ্যাঁ ঠিকই সেই সেই ভদ্রলোক; যিনি আমাকে আপন করে সহবত শিখিয়ে শুধুমাত্র মানুষ করতে চেয়েছিলেন। কিছু না হোক অন্তত ডাল ভাত জুটিয়ে নিয়ে একজন মিশে থাকা আটপৌরে মানুষ!

বিশ্বাস করুন একটা কথাও স্বর হয়ে ফুটে উঠছিল না আমার গলায়। আমি যে কথা বলতে পারি সেটাই ভুলতে বসেছিলাম সেইসময়!

কেন জানি না ওপার থেকে সেই চিরচেনা কণ্ঠস্বরটা বলে উঠেছিল,

"কথা বল! আমি যে জানতাম তুই নিশ্চয়ই একদিন আমাকে মনে করবি! লজ্জা কীসের? কথা বল বাবা! দেখ আমি কিন্তু তোকে ভুলি নি; কবে আসবি বাবা? তোর বাবা শিউচরণ যে কবে থেকে পথ চেয়ে আছে! আর যে শরীর দেয় না এখন!"

কী জানি কেন একগাদা জল ভিড় করে আসছিল চোখে, জিজ্ঞাসা করেছিলাম

"বাবা আমার সেই লাল নীল ছাতাটা...!"

"ঐতো এখনও আমার খাটের পাশে রাখা...!" উত্তরে বয়স্ক মানুষটা বলেছিল।

নতুন শহর আর আমাকে আটকাতে পারে নি। কলকাতা ফিরে আসি চিরদিনের জন্য কিন্তু যাবার আগে ওই ঝিমঝিমে নির্জন পথে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম আরও একবার। চোখ মেলে তাকিয়েছিলাম চারদিক;

হয়ত কিছু খুঁজেছিলাম।

লতাপাতা সবজে গাছের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে থাকা একচিলতে আকাশটার দিকে তাকিয়ে মনে মনে জিজ্ঞাসা করেছিলাম,

"ঈশ্বর কী সত্যিই আছেন...?"

গল্প ৩

যখন ভালবাসা নিষিদ্ধ

সৌরভ দত্ত

।।এক।।

সেদিন বৃহস্পতিবার। 'ছায়া, ছায়া, ছায়া তুমি কোথায়...', অফিস থেকে ঘরে ঢুকে স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে সূর্যর সোহাগের ডাক আছড়ে পড়ল ঘরের চার দেয়ালে। শেষে নিরুত্তর ছায়ামিতাকে সূর্য আবিষ্কার করল শোবার ঘরে, বিছানায় মিশে। ঘুমে অচেতন প্রায়। চোখমুখে ক্লান্তির ছাপ। এমনটা কখনো হয় না। দুপুরে ঘণ্টা খানেকের সুখনিদ্রা, তারপর ঘর গোছানো নিয়ে স্বভাবসুলভ পরীক্ষানিরীক্ষা, গান শোনা, কবিতা শোনা, দরাজ গলায় আবৃত্তিচর্চা, পাঁচ তলা ফ্ল্যাটের আধখোলা জানলায় চোখ দিয়ে প্রকৃতি দেখা, ঝুলবারান্দায় গুনগুন দু'কলি গাইতে গাইতে ফুলগাছের পরিচর্যা করা, স্বল্পবাসের মোড়কে আয়নায় নিজের শরীরের খাঁজে খাঁজে উষ্ণ যৌবনের জোয়ার জরিপ করা, রোজকার নিয়মে সাধারণত এভাবেই কাছে এগিয়ে আসে সূর্যর ঘরে ফেরা। তারপর ছায়ামিতা হেঁশেলে গিয়ে জলখাবার বানাতে বানাতেই হৈ হৈ করে সূর্য ফিরে আসে আর বাইরের সূর্যাস্ত ও ঘরের সূর্যোদয় মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।

কিন্তু সেই বৃহস্পতিবারের গোধুলিবেলায় এমনটা ঘটে নি। বিছানায় বেঘোরে ঘুমানো ছায়ামিতার গায়ে অতিরিক্ত উষ্ণতা অনুভব করতেই সূর্যর মুখচোখে আতঙ্ক। গা তো যেন পুড়ে যাচ্ছে জ্বরে। বন্ধু-চিকিৎসককে ফোনে ধরতেই প্রাথমিক কিছু ওষুধের পরামর্শ এবং চটজলদি পরীক্ষার সুপারিশ। ওষুধপত্র এনে ছায়ামিতাকে খাওয়াতে সূর্যর সময় লাগল মেরে কেটে আধ ঘণ্টা। বন্ধু-চিকিৎসকের পাঠানো প্রতিনিধি লালারস ও রক্তের নমুনা নিয়ে বেরিয়ে গেলেন রাত আটটার দিকে। ওষুধ খাওয়ার খানিকক্ষণ বাদেই শরীরের তাপমাত্রা প্রায় স্বাভাবিক। নামমাত্র নৈশভোজ সেরে ছায়ামিতা রাতে শুতে যেতে না যেতেই জ্বর নিয়ন্ত্রণে। ওষুধের এমন চটজলদি প্রভাবে স্বস্তির শ্বাস নিয়েছিল সূর্য। পরদিন তাই ছায়ামিতাকে একলা ঘরে রেখে অফিস যেতে দুবার ভাবে নি। ঘুনাক্ষরেও টের পায় নি দুনিয়ায় আলোড়ন সৃষ্টিকারী মারণ ভাইরাস রীতিমত ঘাঁটি গেড়ে বসে পড়েছে ছায়ামিতার সবে বত্রিশটি বসন্ত পেরোনো কোমল শরীরে। সেদিন এরপর অফিস থেকে ফিরে ছায়ামিতার জ্বর নিয়ন্ত্রণে আছে বুঝলেও লাগাতার কাশি ও হালকা শ্বাসকষ্ট দেখে মনে কু ডেকেছিল সূর্যর। তখন থেকেই চাপা আশঙ্কা দানা বাঁধল।

আশঙ্কা চরম বাস্তবায়িত হল ভরসন্ধ্যায়। পরীক্ষায় ছায়ামিতার শরীরে কোভিড-১৯ ভাইরাসের অস্তিত্ব নিয়ে চূড়ান্ত বিবৃতি ঘরে এসে দিয়ে গেলেন বন্ধু-চিকিৎসকের প্রতিনিধি। একরাশ আতঙ্ক। উত্তেজনা। শারীরিক দূরত্ব। সামাজিক দূরত্ব। ভয়ের আতিশয্যে ছায়ামিতার অশ্রুসজল চোখে চোখ রাখতে পারছিল না সূর্য। চোখে অন্ধকার দেখছিল। ছায়ামিতা একসময় ডুকরে কেঁদে উঠল। পারস্পরিক কথা বলার ভাষা হারিয়ে ফেলল দুজন। এবার তবে কী করণীয়! ঘরে গোপন স্বেচ্ছাবন্দি? নাকি পড়িমরি করে ছুটে যেতে হবে বিশেষ হাসপাতালে? সূর্যর

মুঠোফোন বেজে উঠল। বন্ধু-চিকিৎসক নিজেই ফোন করেছেন। কিছুটা স্বস্তির শ্বাস নিয়ে ফোন ধরল সূর্য। টুকরো টুকরো দুচারটে কথা হল। কথা শেষ হতে না হতেই তাঁর পাঠিয়ে দেয়া গাড়ি চলে এল। সিঁড়ি বেয়ে সন্তর্পণে নীচে নেমে গাড়ির পেছনের আসনে চেপে বসল ছায়ামিতা। গাড়িকে অনুসরণ করে মোটরবাইকে চড়ে রওনা দিল সূর্য।

গন্তব্যে পৌঁছে সূর্য বন্ধু-চিকিৎসককে আবিষ্কার করল আরেকজন বর্ষীয়ান বাঙালি চিকিৎসকের সঙ্গে। সর্বভারতীয় টিভি চ্যানেলে ভাইরাসজনিত টকশোয়ে এই অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ দুএকবার দেখেছে সূর্য ও ছায়ামিতা। এমনিতেই দুশ্চিন্তায় কমবেশি অস্থির লাগছিল দুজনেরই, কিন্তু এমন তাবড় বিশেষজ্ঞকে সামনাসামনি পেয়ে ধড়ে কিছুটা প্রাণ ফিরে এল। নিরাপদ দুরত্ব বজায় রেখে মিনিট তিরিশেক আলোচনা চলল। দুই চিকিৎসকই অভয় দিলেন। আশ্বস্ত করলেন, হাসপাতালে নয়, নিজ ঘরে থেকেই খুঁজে নেয়া যাবে রোগমুক্তির অভ্রান্ত ঠিকানা। রোগ প্রতিরোধকারী ওষুধপত্র, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র শৌচাগার সহ রুদ্ধদ্বার ঘর, ঘড়ি ও তালিকা ধরে খাবারদাবার, দুই সপ্তাহ ধরে এমন কিছু নিয়মকানুন মেনে চললে এই ভাইরাস অন্যের শরীরে বাসাও বাঁধবে না, ধারকের শরীর থেকেও অবশেষে বিদায় নেবে নিরুপদ্রব ভঙ্গিতে। সব শুনে আশ্বস্ত হল সস্ত্রীক সূর্য। ঘরে ফিরে এল ওরা। অফিসে কথা বলে ''ওয়ার্ক ফ্রম হোম'' চূড়ান্ত করা হল। দরকারি জিনিসপত্র, সব্জি মিলে গেল ঘরে বসে। আবার যখন যা দরকার হবে, ফোনে জানালেই দিয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেল দোকানের ছেলেটি। আরম্ভ হল দুজনের ঘরবন্দি দশা। তিন কামরার ফ্ল্যাটবাড়ির একটি রুদ্ধদ্বার ঘর ও সংলগ্ন শৌচাগার শুধুমাত্র ছায়ামিতার জন্য। আর বাকি অংশে সূর্য। এক ঘরে থেকেও দাঁতে দাঁত চেপে অভূতপূর্ব পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতার এক প্রত্যয়ী বাতাবরণ।

।। দুই ।।

শোন ছায়ামিতা, ভাইরাস সংক্রমণের কারণে তোর সৌন্দর্যের বিকাশ ঘটেছে। এমনিতেই তো লাস্যময়ী ছিলি, এখন একেবারে ডানাকাটা পরী হয়ে উঠেছিস...', রসিয়ে রসিয়ে বলে চলে আরণ্যক।

'ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চোখ ফুলিয়ে, দিন কে দিন ছায়া রহস্যময়ী সুন্দরী হয়ে উঠছে। সুদূর মার্কিন মুলুকে বসেও আরণ্যক দিব্যি ছায়ার সৌন্দর্যের আঁচ পাচ্ছে...', সূর্য সহাস্যবদনে যেন একবাক্যে সমর্থন করে আরণ্যককে।

'আহা রে! দুজনে মিলে আমার রূপের প্রশংসা করে ছাপিয়ে যেতে চাইছে একে অন্যকে। তোমরা আর সময় পেলে না...', ভাইরাসে কাবু ছায়ামিতা বেশ মজা পায় দুজনের কথায়। শরীরী অস্বস্তিকে একদিকে সরিয়ে রেখে নরম হাসিতে নীচু স্বরে উত্তর দেয় ছায়ামিতা।

খোশমেজাজের কথা আর টুকরো টুকরো পাল্টা কথা, এভাবেই স্কাইপে ভিডিও চ্যাট চলছে। পারস্পরিক ভালবাসায় গা ভাসিয়ে হালকা চালের নিখাদ আড্ডা। ছায়ামিতাকে মানসিকভাবে ফুরফুরে রাখতে আজকের আড্ডার জুড়ি মেলা ভার। আড্ডায় আপাতত তিনজন— শিকাগো থেকে সূর্যর কলেজ জীবনের অভিন্নহৃদয় সহপাঠী আরণ্যক, পুনের ফ্ল্যাটবাড়ির চার দেয়ালের নিশ্ছিদ্র দুনিয়া থেকে ছায়ামিতা, ঐ ফ্ল্যাটেরই আরেকটি ঘর থেকে সূর্য। এখানকার ঘড়িতে এখন সময় বিকেল সাড়ে পাঁচটার আশেপাশে। শিকাগোর বাড়িতে এই সাতসকালে মিমি এখনো ঘুম থেকে ওঠে নি। অসীম ভৌগলিক দূরত্ব দুই জোড়া যুগলের ঘনিষ্ঠতা এতটুকুও কমাতে পারে নি। সপ্তাহান্তে নিয়ম করে ওদের ভিডিও চ্যাট চলে। টুকরো টুকরো খুনসুটি, হাসি, ঠাট্টা, তামাশা, খোলামেলা ভালবাসা, এসবের মধ্যে অনায়াসে ওরা চারজন খুঁজে পায় প্রাণশক্তির রসদ। ভাইরাস মার্কিন মুলুকে জাঁকিয়ে বসেছে আগেই। এখন তার বিস্তার প্রায় সারা দুনিয়া জুড়ে। এসব কোনওকিছুই কোনও বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি ওদের এই সাপ্তাহিক একান্ত বৈঠকে। তিনজনের আড্ডার মাঝে ঘুমচোখে যোগ দেয় মিমি, আরণ্যকের কোলে মাথা রেখে, একই ল্যাপটপ থেকে। মিমির ঘুম ভেঙেছে ঠিকই, ঘোর কাটে নি। ছায়ামিতাকে ভাইরাসে আক্রান্ত অবস্থায় এই প্রথমবার দেখছে মিমি। চোখ কচলে নিয়ে মিমি ভাল

করে দেখতে চায় ছায়ামিতাকে। চোখের কোণে কালি পড়েছে কিনা, চেহারার জৌলুস হারিয়ে গিয়েছে কিনা। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ছায়ামিতাকে দেখে নিয়ে অবশেষে সোহাগের সাথে মুখ খোলে মিমি,

'ভাইরাস তোমাকে আক্রান্ত করে নি সোনা মনি, ঋদ্ধ করেছে। তোমার রূপ-যৌবন-জৌলুস দিব্যি রয়ে গিয়েছে স্বমহিমায়। বলতে নেই, আরও আকর্ষণীয় হয়েছে তোমার রূপ। নিয়ম মেনে খাওয়া-দাওয়া, লাগাতার বিশ্রাম, তুমি এখন অপ্সরা।'

মিমি বরাবরই ছায়ামিতার সৌন্দর্যের পূজারী। আজও তার ব্যতিক্রম হয় নি। কথাগুলো শুনে ভাল লাগলেও সব কষ্ট চেপে শুধু মিষ্টি হাসি দিয়ে নীরব কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ছায়ামিতা। শ্বাসকষ্ট নিয়মিত না হলেও পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হওয়ার কোনও লক্ষণ নেই। জ্বর আসছে, কমছে, আবার আসছে। খাবারে অরুচি। খাবারের গন্ধ পাচ্ছে না। ক্লান্তি ও অনিদ্রা নিত্যসঙ্গী। মাথাব্যথা থাকছে। থেকে থেকে পেটে ব্যথাও হচ্ছে। চোখ লাল হয়ে গিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। শুকনো কাশি হচ্ছে। হাজারো উপসর্গ দানা বাঁধছে গোটা শরীরে। বন্ধু-চিকিৎসক সবকিছু জানেন। কাল রাতে ওষুধ বদলে দিয়েছেন। সূর্য ভেবেছিল প্রথম সন্ধ্যার জ্বরের ওষুধের মত চমক দেবে এই নতুন ওষুধ, সবচাইতে যা চিন্তার, সেই শ্বাসকষ্ট নিশ্চিহ্ন হবে। কিন্তু হয় নি। আজ দুপুরে বন্ধু-চিকিৎসকের কাছে এ নিয়ে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করলে তিনি ধৈর্য্য ধরতে বললেন সূর্যকে। কিন্তু ছায়ামিতার শ্বাসকষ্টের বিষয়টি নিয়ে বন্ধু-চিকিৎসক নিজে যে কোনও ঝুঁকি নিতে চান নি, তার প্রমাণ মিলল তাড়াতাড়ি। আরণ্যক-মিমির সাথে ভিডিও চ্যাটের মাঝেই সূর্যর মুঠোফোনে জরুরি মেসেজ এসে গেল বন্ধু-চিকিৎসকের কাছ থেকে। ছায়ামিতাকে ঘরে রেখেই অবিলম্বে তিনি অক্সিজেন দেওয়ার ব্যবস্থা করতে চান। সূর্যর কপালে চিন্তার বলিরেখা স্পষ্ট হল। আরণ্যক ও মিমিকে নিয়ে তাদের আড্ডার মেজাজটা কেটে গেলেও পারস্পরিক শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে খুব তাড়াতাড়ি আবার গুগল মিটের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভিডিও চ্যাট থেকে বেরিয়ে এল সূর্য ও ছায়ামিতা। দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ কানে এল।

শরীর আপাদমস্তক আচ্ছাদিত করে বন্ধু-চিকিৎসকের তিন সদস্যের প্রতিনিধিদল চলে এল অক্সিজেন সিলিন্ডার সহ দরকারি বাকি সরঞ্জাম নিয়ে। ছায়ামিতার ঘরে জরুরি ভিত্তিতে সব ব্যবস্থাপনা সেরে একজন মহিলা চিকিৎসাকর্মীকে মোতায়েন করে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন প্রতিনিধিদলের বাকি দুজন। কৃত্রিম উপায়ে হলেও শ্বাসকষ্ট জনিত সমস্যা আপাতত আর মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে না ভেবে খানিকটা নিশ্চিত বোধ করল সূর্য। দুই চিকিৎসকের বেধে দেওয়া যে সপ্তাহ দুয়েকের সময়সীমা, তার

খোশমেজাজের কথা আর টুকরো টুকরো পাল্টা কথা, এভাবেই স্কাইপে ভিডিও চ্যাট চলছে। পারস্পরিক ভালবাসায় গা ভাসিয়ে হালকা চালের নিখাদ আড্ডা। ছায়ামিতাকে মানসিকভাবে ফুরফুরে রাখতে আজকের আড্ডার জুড়ি মেলা ভার। আড্ডায় আপাতত তিনজন— শিকাগো থেকে সূর্যর কলেজ জীবনের অভিন্নহৃদয় সহপাঠী আরণ্যক, পুনের ফ্ল্যাটবাড়ির চার দেয়ালের নিশ্ছিদ্র দুনিয়া থেকে ছায়ামিতা, ঐ ফ্ল্যাটেরই আরেকটি ঘর থেকে সূর্য।

অর্ধেক সবেমাত্র পেরিয়েছে। ছায়ামিতার মাত্র এই বয়সেই হৃদযন্ত্র ও উচ্চরক্তচাপ জনিত পুরনো সমস্যা আছে। দুই চিকিৎসকের অজানা নয় এসব। এসব পুরনো সমস্যা ভাইরাসের প্রকোপ থেকে নির্বিঘ্নে মুক্তিলাভ প্রক্রিয়াকে দীর্ঘায়িত করতে পারে। তবুও দুই চিকিৎসকের আত্মবিশ্বাস সূর্যকে স্বস্তি প্রদান করে।

।। তিন।।

বন্ধু-চিকিৎসকের পরামর্শে গতকাল সন্ধ্যায় সূর্যর

লালারস দ্বিতীয়বার নেওয়া হয়েছিল পরীক্ষার জন্য। যদিও বিন্দুমাত্র শারীরিক সমস্যা নেই, তবু একবার নিশ্চিত হওয়া। না, ভাইরাস থাবা বসায় নি সূর্যর শরীরে। বন্ধু-চিকিৎসকের উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলেছে সূর্য। স্পর্শ তো দূরের কথা, বাতাসে ভাইরাসের সম্ভাব্য সংক্রমণের ঝুঁকি এড়াতে এই কদিন কার্যত ছায়ামিতার ঘরের দরজামুখী হয় নি সূর্য। বন্ধু-চিকিৎসকের নির্দেশ মেনে পালা করে একজন মহিলা চিকিৎসাকর্মী সারাক্ষণ থাকছেন। বাড়তি দায়িত্ব নিয়ে তিনি ছায়ামিতার জন্য খাবার বানিয়ে দিচ্ছেন। ছায়ামিতার শ্বাসকষ্ট আপাতত নেই। কৃত্রিম অক্সিজেন তিনদিনের পর বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তবে বেশি রাতে নিয়ম করে জ্বর আসছে, যদিও মাত্রাতিরিক্ত হচ্ছে না দেহের তাপমাত্রা। শুকনো কাশি আছে। চিনচিনে মাথার যন্ত্রণা থাকছে। বুকে একটি চাপ ধরা যন্ত্রণা নতুন উপসর্গ রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে গত পরশু থেকে। বুকের পরীক্ষানিরীক্ষা করিয়েছেন বন্ধু-চিকিৎসক। চিন্তিত হওয়ার মত কিছু ধরা পড়ে নি।

এভাবেই চলছে। মানসিকভাবে একটু হালকা হওয়ার অভিপ্রায়ে খানিকক্ষণ অনলাইন আড্ডা মারতে মন চাইছে সূর্যর। ছায়ামিতা পাকাপাকিভাবেই সূর্যকে বলে রেখেছে, আড্ডা দিতে সে সবসময়ই তৈরি, তবে তৃতীয় কেউ থাকলে সময়বিশেষে ভিডিও নিস্ক্রিয় করে শুধুমাত্র অডিও মারফত থাকবে আড্ডায়। যেমন ভাবা তেমন কাজ। ছায়ামিতার হোয়াটসঅ্যাপে গুগল মিটের লিংক পাঠিয়ে দিল সূর্য। পরক্ষণেই সূর্য লিংক পাঠালো আরো দুজনের হোয়াটসঅ্যাপে, আরণ্যক আর মিমি। আরণ্যক যেন ওঁত পেতে ছিল এমনটার জন্য। এক নিমেষে মিটিং সেশনে আবির্ভূত হয়ে পড়ল। মিমিও চলে এল। লো-নেক স্বচ্ছপ্রায় টপ ও হট প্যান্টে আধশোয়া মিমিকে অবলীলায় 'সেক্সি গার্ল' আখ্যায়িত করে ফেলল সূর্য। কিন্তু ছায়ামিতা? ছায়ামিতার বিলম্বিত আবির্ভাব সূর্যকে অশান্ত করল। হোয়াটসঅ্যাপে পাঠানো লিংক এখনো ছায়ামিতা দেখে নি, অথচ শুধুমাত্র সূর্যর মেসেজের জন্য বিশেষ একটি সশব্দ ম্যাসেজ-টোন স্থির করে রাখা আছে ছায়ামিতার মুঠোফোনে। ছায়ামিতার দরজার দিকে দু'পা এগিয়ে গিয়ে খানিকটা অস্থিরতার সঙ্গে ছায়ামিতাকে ডাকতে লাগল সূর্য,

'ছায়া? ছায়া, তুমি আমার মেসেজ দেখছ না কেন? গুগল মিটের লিংক পাঠিয়েছি তো। একবার আড্ডা হোক। ছায়া? ছায়া?'

সন্তর্পণে দরজা যৎসামান্য ফাঁক করে মহিলা চিকিৎসাকর্মী উঁকি দিলেন,

'গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন ম্যাডাম। সাধারণ ঘুমের মত নয়, একটু অন্যরকম। আমি স্যারকে জানিয়েছি। উনি এক্ষুনি আসছেন।'

বুকটা ছ্যাঁক করে উঠলো সূর্যর। মনে কু ডাকছে আবার। চোখেমুখে অন্ধকার দেখছে। ধীরে ধীরে কি ছায়ামিতার অবস্থার অবনতি হচ্ছে? নিজের বাড়ির কথা মনে পড়ছে সূর্যর। ছায়ামিতার বাড়ির সবাইকে মনে পড়ছে। একদিকে দাদা-বৌদি-ভাইপো, আরেকদিকে শ্বশুর-শাশুড়ি-শ্যালক। ছায়ামিতা ভাইরাস আক্রান্ত হওয়া মাত্রই সূর্য সবাইকে ফোনে খবরটি জানিয়ে দিয়েছিল।

ভাইরাসের প্রকোপে পরিবহন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত। তাছাড়া এখানে সশরীরে এসে বাড়ির লোকের করণীয় তো কিছু নেই। উল্টে বরং ভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি। একবার সংক্রামিত হয়ে পড়লে ভোগান্তির শেষ নেই। সরকারি হাসপাতালে এমন রোগীদের নানা অছিলায় ফিরিয়ে দেয়ার হিড়িক। বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার নামে প্রতারণা। কেউ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লে শবদেহ পরিবারের হাতে তুলে না দিয়ে অজানা পরিণতি। গোটা দেশ জুড়ে কমবেশি একই চিত্র। মৃত্যুমিছিলের ভীড়ে ছায়ামিতা কি মৃত্যুপথযাত্রী? নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে ডুকরে কেঁদে ওঠে সূর্য। আপনজনদের ছেড়ে হাজারো মাইল দূরে থেকে সুখ-দুঃখ-হাসি-কান্নার একমাত্র সাথী ঘুরেফিরে ছায়ামিতা, অথচ সেই ছায়ামিতা এখন ধরাছোঁয়ার বাইরে। সব কথা, আবেগ, অনুভূতি, এসব কি ফোন বা ভিডিও চ্যাট দিয়ে হয়! ছায়ামিতাকে বুকে জড়িয়ে ধরা তো দূরের কথা, ওর ত্রিসীমানায় যাওয়া মানেই তো নিজের বিপদ ডেকে আনা। সূর্যর বড্ড একা মনে হয় নিজেকে। কিছুটা সামলে নিয়ে সূর্য ফোনে ধরে বন্ধু-চিকিৎসককে,

'প্রীতম, খুলে বল ভাই। ছায়ামিতা কি বিপদে আছে? আমায় লুকানোর চেষ্টা করিস না ভাই!'

তাও ভাগ্যিস বন্ধুটি আছেন। স্কুলজীবনে একটানা ঠিক দুই বছর পড়াশোনা বন্ধুটির সাথে। ক্লাসে একসাথে বসা, টিফিন পিরিয়ডে একসাথে বসে খাবার ভাগাভাগি করে খাওয়া, একসাথে অঙ্ক করা, কত মজার স্মৃতি। ঘনিষ্ঠতা ছিল তুঙ্গে। তারপর সূর্য ও স্কুলের মায়া ত্যাগ করে বাবার কর্মসূত্রে বন্ধুটির অন্যত্র চলে যাওয়া। শেষে দুই দশক পার করে এই পুনে শহরে এসে বন্ধুকে একদিন নাটকীয়ভাবে ফিরে পাওয়া এখানকার নামকরা চিকিৎসক রূপে।

ফোনের ঐ প্রান্তে বন্ধু-চিকিৎসকের যৎসামান্য কথায় এই প্রথম আত্মবিশ্বাসের অভাব ধরা পড়ে। মাথায় বাজ পড়ে সূর্যর। ফোনের সংযোগ কেটে যায়। বর্ষীয়ান চিকিৎসককে নিয়ে ডা. প্রীতম মাত্র কয়েক মুহূর্ত পরেই ঢুকে যান সূর্যর ফ্ল্যাটবাড়িতে। পি-পি-ই কিট পরিহিত দু'জন চিকিৎসক ও একজন মহিলা চিকিৎসাকর্মীর উপস্থিতিতে ভেতর থেকে বন্ধ হয়ে যায় ছায়ামিতার ঘর। এদিকে, ঘরময় অস্থির পায়চারি করতে থাকে সূর্য। বাড়ি ও শ্বশুরবাড়ি থেকে পর্যায়ক্রমে রুটিনমাফিক ফোন আসে। অনিশ্চয়তার ঘেরাটোপে নিজেকে সামলানোই যেখানে দুরূহ ব্যাপার, সেখানে বাকিদের কীভাবে আশ্বস্ত করতে পারে সূর্য! তাই ব্যস্ততার অজুহাতে কথা বাড়ায় না দুই বাড়ির সাথে। মাঝপথে গুগল মিট ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হয়েছিল। শিকাগো থেকে আরণ্যক আঁচ করতে পেরেছিল, ছায়ামিতা খুব ভাল নেই। তর সইতে না পেরে সরাসরি তাই সূর্যকে আই-এস-ডি কল করে বসেছে আরণ্যক। সূর্য ফোন ধরতেই আরণ্যকের সরাসরি জিজ্ঞাসা,

'ছায়ামিতা কি ভাল নেই রে? তুই হাসপাতালে ভর্তি করাচ্ছিস না কেন বল তো?'

পরে কথা বলবে জানিয়ে সূর্য আপাতত ফোন রাখল। এই প্রথমবার সূর্যর গৃহীত সিদ্ধান্তকে কেউ প্রশ্নচিহ্নের মুখে ফেলল, যদিও সূর্য কার্যত কোনও সিদ্ধান্ত নিজে থেকে নিচ্ছে না। তাহলে কি বন্ধু-চিকিৎসক ডা. প্রীতমের ওপর অতি-নির্ভরতা কাল হয়ে দাঁড়াতে পারে? নিজেই নিজের বিবেকের কাছে প্রশ্ন করছে সূর্য। কিন্তু ডা. প্রীতম চক্রবর্তী তো একা নন। বর্ষীয়ান চিকিৎসক ডা. অমল কান্তি দাসের ছায়াসঙ্গী হয়েই তো ছায়ামিতার যাবতীয় চিকিৎসা করে চলেছেন প্রীতম। এঁদের দুজনের সম্মিলিত পরামর্শ মেনেই তো ঘরবন্দি হয়ে ভাইরাস মোকাবিলায় ছায়ামিতার পথ চলা। অস্থির ভাবনার দোলাচলে সূর্য দিশেহারা। ছায়ামিতাকে নিয়ে নেতিবাচক চিন্তা গ্রাস করলেই অলক্ষ্যে চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসছে। শেষ কবে এমন চোখের জল ফেলেছিল সূর্য? এক, বার্ধক্যজনিত কারণে বাবার চিরবিদায়ের দিনে।

ভাইরাসের প্রকোপে পরিবহন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত। তাছাড়া এখানে সশরীরে এসে বাড়ির লোকের করণীয় তো কিছু নেই। উল্টে বরং ভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি। একবার সংক্রামিত হয়ে পড়লে ভোগান্তির শেষ নেই। সরকারি হাসপাতালে এমন রোগীদের নানা অছিলায় ফিরিয়ে দেয়ার হিড়িক। বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার নামে প্রতারণা। কেউ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লে শবদেহ পরিবারের হাতে তুলে না দিয়ে অজানা পরিণতি। গোটা দেশ জুড়ে কমবেশি একই চিত্র।

দুই, হঠাৎ চিহ্নিত কর্কট রোগে মায়ের আকস্মিক চিরবিদায়ের দিনে। কিন্তু ছায়ামিতার এই বিপর্যয় মানে তো সুখের সংসারে মহাসঙ্কট।

হঠাৎ দরজা খুলে যায় ছায়ামিতার ঘরের। ঘরের ভেতর আলো নেভানো। এক এক করে বেরিয়ে আসেন ডা. অমল কান্তি দাস ও ডা. প্রীতম। মহিলা চিকিৎসাকর্মী বেরিয়ে মূল দরজা দিয়ে বাইরে চলে যান। দুই চিকিৎসক গম্ভীর মুখে সূর্যের দিকে তাকিয়ে একটু দাঁড়ান।

'তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিতে হবে। ভেন্টিলেশনে দিতে হবে। ভগবানকে ডাকুন।'

'তোকে শক্ত হতে হবে সূর্য। ভেঙে পড়লে চলবে না। দেখা যাক। আমার টিম পাঠাচ্ছি।'

।। চার ।।

কারোর নাম যে ছায়ামিতা হতে পারে, সূর্যবিকাশের জানা ছিল না। কারোর নাম যে সূর্যবিকাশ হতে পারে,

এই প্রথমবার সূর্যর গৃহীত সিদ্ধান্তকে কেউ প্রশ্নচিহ্নের মুখে ফেলল, যদিও সূর্য কার্যত কোনও সিদ্ধান্ত নিজে থেকে নিচ্ছে না। তাহলে কি বন্ধু-চিকিৎসক ডা. প্রীতমের ওপর অতি-নির্ভরতা কাল হয়ে দাঁড়াতে পারে? নিজেই নিজের বিবেকের কাছে প্রশ্ন করছে সূর্য। কিন্তু ডা. প্রীতম চক্রবর্তী তো একা নন। বর্ষীয়ান চিকিৎসক ডা. অমল কান্তি দাসের ছায়াসঙ্গী হয়েই তো ছায়ামিতার যাবতীয় চিকিৎসা করে চলেছেন প্রীতম। এঁদের দুজনের সম্মিলিত পরামর্শ মেনেই তো ঘরবন্দি হয়ে ভাইরাস মোকাবিলায় ছায়ামিতার পথ চলা।

ছায়ামিতার জানা ছিল না। অজানাকে জানা হয়েছিল ভিড়ে ঠাসা নৈহাটি লোকালে। বারো বছর আগের একটি আপাতসাধারণ দিন। চৈত্রের বিকেল। ভ্যাপসা গরম। জানলা ঘেঁষা মুখোমুখি আসন। দুজনের চোখ জানলার বাইরে। একজন কর্পোরেট দুনিয়ায় চাকরিজীবনের চৌকাঠে। আরেকজন প্রফেশনাল কোর্স নিয়ে পড়াশোনা করা কলেজ জীবনের মধ্যগগনে। আড়চোখে একে অন্যকে দেখা। হঠাৎ চোখে চোখ। দুষ্টুমিষ্টি হাসি। টুকরো টুকরো আলাপ। সেদিন থেকে শুরু। আলাপ থেকে ভাল লাগা। ভাল লাগা থেকে ভাল বাসা। গোটা কলকাতা জুড়ে এক দশকের বিবাহপূর্ব প্রেম। পুনেতে গিয়ে দুই বছরের বিবাহ-পরবর্তী প্রেম। সব মিলিয়ে বারো বছর। বারো বছরের সুখানুভূতি আজ গভীর সংকটে।

ডা. প্রীতমের পাঠানো 'টিম' এক্ষুনি চলে আসবে। চোখের সামনে দিয়ে ছায়ামিতাকে নিয়ে যাওয়া হবে সূর্যর ধরাছোঁয়ার আরো বাইরে। ছায়ামিতার এই চলে যাওয়া কি 'না ফেরার দেশে' পাড়ি দেওয়া? পাগল পাগল লাগছে। পায়ের তলায় মাটি সরে গিয়ে শরীরের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছে সূর্য। গুচ্ছ গুচ্ছ বিধিনিষেধ। কীসের জন্য? ছায়ামিতাকে ছাড়া নিজের জীবনটাই তো কাঠফাঁটা রোদের মত দুর্বিষহ। নিজেকে আর এতটুকু সামলাতে পারে না সূর্য। কান্না চেপে মূল দরজায় ছিটকিনি লাগিয়ে সূর্য অবলীলায় ঢুকে যায় ছায়ামিতার অন্ধকার ঘরে। আলো জ্বালিয়ে বিছানায় তাকাতেই ছায়ামিতার চোখে চোখ পড়ে। ছায়ামিতার চোখের কোণে জলরাশি। সূর্যের অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি। অসহায়ত্ব অজান্তেই ফুটে উঠেছে কষ্টে লালিত সেই হাসিতে। চোখমুখে ক্লান্তির নিশানা। ক্লান্তি কেড়েছে শরীরী ঔজ্জ্বল্য। সূর্যর দুই হাত নিশপিশ করছে। বুকে পাথর চেপে মন চাইছে হাত দুটি বাড়িয়ে ছায়ামিতাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বুকে জড়িয়ে ধরতে। পাগলের মত চুমু খেতে খেতে ওর বুকের ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ে স্বপ্নের এক ছায়ানীড় খুঁজে পেতে ইচ্ছে করছে। সূর্যর শরীরী ভাষাকে বুঝতে ভুল করে না ছায়ামিতা। ছাইপাশ না ভেবে দুটি রক্তমাংসের মানুষ কাছে টেনে নেয় একে অন্যকে। শরীরী নৈকট্য। স্পর্শসুখ। আদর। ভালবাসা। ভাইরাস সংক্রমণের চোখরাঙানি তথা বিধিনিষেধের চোরাস্রোত একদিকে। নিঃশর্ত তথা নির্ভীক ভালবাসার আস্বাদন আরেকদিকে...। সময় থেমে থাকে না। থামে না ভালবাসার জোয়ার। সম্বিত ফিরে আসে মুঠোফোনের শব্দে। ডা. প্রীতম ফোন করেছেন,

'কী রে সূর্য! আমার মেডিকেল টিম তোর দরজায় কড়া নাড়ছে। তুই খুলছিস না যে? সময় চলে যাচ্ছে তো...'

তাজ্জব মহাভারত

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

সুদূর দিস্তং নদীর পাড় থেকে ভুসুকু এসেছিল হস্তিনাপুরে। তারপর জড়িয়ে গেল এক সাংঘাতিক পরিকল্পনার সাথে। কুরু-পাণ্ডবদের মধ্যে বিভেদ ধরিয়ে হস্তিনাপুর ধ্বংস করতে চায় সৈন্ধবরা। তাঁদের প্রতিনিধি মহামায়াবী অল্লরাজ অঙ্গার। তাঁর শিষ্য পুন্ডরীকাক্ষ ধূর্জটিবর্মার সাথে বন্ধুত্ব হয়েছে দুর্যোধনের। নানা ঘটনার পর যুধিষ্ঠিরকে নিয়ে দেবদূতাবাসের দিকে গেলেন ভীষ্ম। পুষ্পক রথে বায়ুমার্গে তাঁদের নিয়ে আসা হল। দুর্যোধনকে যুবরাজ রূপে তুলে ধরার জন্য ভুসুকুকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন অল্লরাজ। তাঁকে সম্মোহিত করাও হয়েছিল, কিন্তু ভুসুকু তা হয় নি। শেষ পর্বে অতঃপর অপেক্ষা করছে ধুন্ধুমার ঘটনাবলী।

৪৬

কিছুক্ষণ ওড়ার পর পাহাড়ে ঘেরা একটা সমতল ভূমি চোখে পড়ল যুধিষ্ঠিরের। অন্ধকারে সেটা দেখতে পাওয়ার কথা নয়, কিন্তু কোথা থেকে অদ্ভুত নরম আলো এসে পড়েছিল সেই ভূমির ওপর। রথটা হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে নেমে এল সেই ভূমিতে। নিঃশব্দে খুলে গেল রথের দরজা। মন্ত্রমুগ্ধের মত ওরা দু-জন রথের বাইরে সেই অপূর্ব, মনোরম আলোকের মধ্যে ভূমিতে পা রাখলেন। জায়গাটা যেন ছোট্ট একটি গ্রাম। বিচিত্র ধরনের কয়েকটি কুটির আর অট্টালিকা, অর্ধগোলাকার ভবন, ছোট্ট একটি উদ্যান— তবে কোনও লোকজন চোখে পড়ল না। ভীষ্ম এদিক ওদিক তাকিয়ে বুঝতে পারলেন না ঠিক কী করা কর্তব্য।

'দেবদূতাবাসে স্বাগতম!'

সামনেই একটা গাছের আড়াল থেকে এক ব্যক্তি বেরিয়ে এলেন। ব্যক্তির আকার সাধারণ হস্তিনাপুরিদের তুলনায় সামান্য দীর্ঘ, উন্নত নাসা, প্রশস্ত কপাল, শান্ত দুটি চোখ। গাত্রবর্ণ গমের মত উজ্জ্বল। পরনের বস্ত্র হস্তিনাপুরিদের মতই— কিন্তু একাধিক বর্ণে বিচিত্র রূপে রঞ্জিত। কোনও সন্দেহ নেই যে ইনি একজন দেবদূত।

'আমি আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছিলাম।' তিনি সহস্যে বললেন।

'আমাদের প্রণাম গ্রহণ করুন।' ভীষ্ম একটু ঝুঁকে প্রণাম জানালেন। যুধিষ্ঠির অনুসরণ করলেন পিতামহকে। 'আপনাদের সৌজন্য অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা হল। আমরা শূন্যমার্গে বিচরণের সুযোগ পেলাম।'

'বীরশ্রেষ্ঠ ভীষ্মকে আমরা দিন কয়েকের জন্য দেবদূতাবাসের আতিথ্য গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।' দেবদূত বললেন। 'যুবরাজ যুধিষ্ঠিরকে ফিরে যেতে হবে। তবে তাঁকে আমি কিছু বলতে চাই।'

যুধিষ্ঠির বিস্মিত হলেন। দেবদূতাবাসে একজন দেবদূতের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকার মত সুযোগ এক কথায় অবিশ্বাস্য। ফিরে যাওয়ার কথা শুনে তিনি অবাক হন নি। তাঁর বিস্ময়ের কারণ ছিল দেবদূতের শেষ কথাটা। পিতামহ ভীষ্মের উপস্থিতিতে তাঁকে কী এমন বিশেষ কিছু বলার থাকতে পারে? ইতিমধ্যে আরও তিন চারজন দেবদূত কোথা থেকে জানি বেরিয়ে এসেছেন। তাঁরা প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন যুধিষ্ঠিরের দিকে। দেবদূতদের চেহারার মধ্যে অনেক মিল চোখে পড়ল যুধিষ্ঠিরের। সকলেই যেন অনেকটা একই রকম দেখতে।

'ভীষ্মকে আপনারা অতিথিশালায় নিয়ে যান।' বাকিদের উদ্দেশে বললেন দেবদূত। যুধিষ্ঠিরের মনে হল এই দেবদূত সম্ভবত বাকিদের নেতা। তাঁরা ভীষ্মকে তাঁদের সাথে যাওয়ার জন্য হাত দিয়ে ইশারা করল। ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এগিয়ে গেলেন তাঁদের সাথে। কিছুটা যাওয়ার পর তাঁরা সবাই কোথায় জানি মিলিয়ে গেল।

'এখানে একটু দূরে কেউ থাকলে তাঁকে আপনি দেখতে পারবেন না।' দেবদূত হাসলেন। 'আপনার মনে হচ্ছে এখানে কেউ নেই। আসলে সবাই দূরে দাঁড়িয়ে আপনাদের লক্ষ্য করছিল। নিরাপত্তার কারণেই এই দৃষ্টিভ্রম আমরা ঘটিয়ে থাকি।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে যুধিষ্ঠির বললেন, 'অবিশ্বাস্য এ মায়া!'

'মায়া নয়। বিজ্ঞান।' দেবদূত হাঁটতে শুরু করলেন। 'একদিন মানবজাতি এই বিজ্ঞান আয়ত্ত করবে।'

'কবে?' দেবদূতকে অনুসরণ করতে শুরু করলেন যুধিষ্ঠির।

'বিজ্ঞান রাতারাতি আয়ত্ত করা যায় না যুধিষ্ঠির। ধাপে ধাপে শিখতে হয়। বহু শত বছরের শিক্ষার বিনিময়ে একদিন তোমরা আবিষ্কার করবে প্রকৃতির অপূর্ব রহস্য। সেদিন মানুষেরও হাতে আসবে পুষ্পক রথ। কিন্তু সে কথা এখন নয়। এখন আমরা সামনের ওই অর্ধগোলাকার ভবনে প্রবেশ করব।'

ভবনটি দূরে নয়। হাঁটতে হাঁটতে আরও দু-চারজন দেবদূতকে দৃশ্যমান হতে দেখলেন যুধিষ্ঠির। তবে ভবনটির সামনে কেউ ছিল না। তাঁরা কাছাকাছি আসতেই ভবনের মসৃণ দেয়ালে একটি ফাঁক সৃষ্টি হল। তার মধ্যে দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলেন দু-জন। যুধিষ্ঠির দেখলেন একটি বৃহদাকৃতি গোলাকার কক্ষের পরিধিতে তিনি পা রাখলেন। কক্ষের দেয়াল অতি মসৃণ কোনও উপাদানে তৈরি। তার রঙ অতি উজ্জ্বল সাদা। কক্ষটি নরম-নীল আলোয় পরিপূর্ণ। সে আলো

পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার মত নরম অথচ সকালের প্রথম আলোর মত উজ্জ্বল।

বৃহৎ সেই কক্ষের মেঝে জুড়ে বড় বড় বর্গাকার সাদা-কালো ছক কাটা। গোটা মেঝেটাই আসলে একটা পাশার ছক। তবে ছকটি অনেক বেশি জটিল। যুধিষ্ঠির নিজেও দ্যূতক্রিয়ায় পারদর্শী। এমন জটিল পাশার ছকের কথা তিনি শুনেছিলেন, কিন্তু কখনও দেখেন নি। অনেকগুলি সাদা কালো ঘুঁটি ঘুরে বেড়াচ্ছিল ছকের মধ্যে। ঘুঁটিগুলি নিজে থেকেই ঘর বদল করছিল। মনে হচ্ছিল দু-জন অদৃশ্য ব্যক্তি চাল দিচ্ছেন। এটাই তবে সেই পাশা যার কথা যুধিষ্ঠির শুনেছিলেন নারদের মুখে। এই পাশাতেই খেলা হচ্ছে হস্তিনাপুরের ভবিষ্যৎ।

'যুবরাজ যুধিষ্ঠির নিশ্চই বুঝতে পারছেন যে মেঝেতে কী ঘটছে?'

'সাদা ঘুঁটি হারছে।' ছকের দিকে কিছুক্ষণ নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকার পর যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন। 'পরাজয় নিশ্চিত, তবে চেষ্টা করলে কালো ঘুটিকে অনেকক্ষণ আটকে রাখা যায়।'

'সাধু যুধিষ্ঠির!' দেবদূতের সুরে প্রশংসা। 'তুমি সম্ভবত অবহিত হয়েছ যে এই পাশা আসলে কী?'

'শুভ পরাজিত হতে চলেছে। সাদা ঘুটি হল হস্তিনাপুর।'

'আরও নির্ভুল ভাবে বললে সাদা ঘুটি হল পাণ্ডব। এটা আসলে হস্তিনাপুরের ভবিষ্যৎ ইঙ্গিত করছে যুধিষ্ঠির। হস্তিনাপুরের রাজার এতদিন কোনওরকম আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয় নি। কিন্তু সেটা এবার ঘটতে চলেছে। কুরু-পাণ্ডবের সংঘাত অনিবার্য। এই সংঘাতের ফলে হস্তিনাপুর ধ্বংস হয়ে যাবে। যারা জিতবে তাঁদের হাতে গড়ে উঠবে নতুন কোনও নগরী। হয়ত সে নগরীও কালক্রমে হয়ে উঠবে ঐশ্বর্যবান।'

'কারা জিতবে দেবদূত?'

দেবদূত মৃদু হাসলেন। 'ভবিষ্যৎ অজ্ঞাত। আমরা অনুমানের সাহায্যে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ অনিবার্য বলে জেনেছি। ফলাফল জানা অসম্ভব।'

'তা হলে কেন এ কথা আমাকে বললেন দেবদূত?'

'তোমাকে একটি উপদেশ প্রদানের সিদ্ধান্ত দেবতারা নিয়েছেন। তাঁদের নির্দেশে সেটা জানাতেই তোমাকে এই সব দেখালাম আর বললাম।' নরম স্বরে বলছিলেন দেবদূত। 'চেষ্টা করবে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ যতদিন পারো ঠেকিয়ে রাখতে। তার জন্য জীবনে যা করতে হয় করবে। যতদিন না যুদ্ধ অনিবার্য হয়, চেষ্টা করবে এড়িয়ে চলতে।'

'দেবতাদের উপদেশ শ্রবণে আমি সম্মানিত দেবদূত। উপদেশ আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করব। আমি প্রতিশ্রুতি দিলাম।'

'যুবরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতিশ্রুতি অতীব মূল্যবান। দেবতারা তা জানেন। কোনও প্রশ্ন আছে যুবরাজ?'

'প্রশ্ন নেই দেবদূত। কেবল একটি অনুরোধ করতে চাই।'

'বলুন।'

'পিতামহ আপনাদের আতিথ্য গ্রহণ করে যথাকালে হস্তিনাপুর ফিরে যাবেন জানি, কিন্তু আমার অনতিবিলম্বে সেখানে যাওয়া দরকার।'

'সামান্য অনুরোধ যুবরাজ। এ ব্যাপারে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েই রেখেছি। পুষ্পকরথ আপনাকে হস্তিনাপুরে সূর্যোদয়ের আগেই পৌঁছে দিয়ে আসবে। আপনি কোথায় অবতরণের ইচ্ছা করেন।'

কিছুক্ষণ পর একা যুধিষ্ঠিরকে নিয়ে রথ আবার আকাশে উড়ল। পর্বতমালাকে পেছনে ফেলে বায়ুমার্গে ছুটল হু হু করে। যুধিষ্ঠির প্রায় পলকহীন চোখে তাকিয়েছিলেন বাইরের দিকে। শূন্য থেকে তিনি মন দিয়ে দেখে নিচ্ছিলেন প্রকৃতির অলৌকিক রূপ। এই রূপদর্শন মানুষের ভাগ্যে জোটে না। এ এক স্বর্গীয় অভিজ্ঞতা।

দেবদূতেরা তাঁকে এই রথে চড়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। তাঁরা যুধিষ্ঠিরকে ভরসা করেছেন। তাঁর প্রতি দেবতাদের ভরসা আছে। এ এক পরম পাওয়া। যুধিষ্ঠিরের মনোবল তাই হু হু করে বাড়ছিল।

ভীষ্ম হস্তিনাপুরে অনুপস্থিত থাকাকালীন তাঁকে একটা কিছু করতেই হবে।

৪৭

সকাল সকাল কর্ণের আগমন সংবাদ পেয়ে বিস্মিত অঙ্গরাজ তাঁকে ডেকে পাঠালেন। কর্ণের চোখমুখ দেখে মনে হল সে বিশেষ কিছু একটা বলতে এসেছে।

‘কী ব্যাপার অঙ্গরাজ? সব কুশল তো?’ অল্লরাজ কৌতুহলের সুরে জানতে চাইলেন। কর্ণ এদিক ওদিক তাকিয়ে নিচুস্বরে বললেন, ‘ভুসুকুর সংবাদটা সত্যি। মাছের ঝোল তাঁর কাছ থেকে পাণ্ডবেরা লোক পাঠিয়ে নিয়মিত নিয়ে যায়। ইদানীং অবশ্য বন্ধ আছে।’

‘এটা খুব একটা অপ্রত্যাশিত সংবাদ নয় কর্ণ। এ তুমি আগেই অনুমান করেছিলে।’

‘পরের সংবাদটা অতি গুরুত্বপূর্ণ। পুন্ডরীকাক্ষ যেই রাতে সাগর দূতাবাসে ফিরে আসে, সেই রাতে অজ্ঞাত পরিচয় কয়েকজন ব্যক্তি দূতাবাসে গোপনে প্রবেশ করেছিল।’

‘তাঁরা কারা?’ অল্লরাজের ভুরু একটু কুঁচকে গেল। ‘পুন্ডরীকাক্ষ তো এটা আমাকে বলে নি।’

‘গুরুত্বটা প্রথমে বোঝা যায় নি। হস্তিনাপুরে যে সব ছোট ছোট রাজ্যের দূতাবাসগুলিতে দস্যুদের অনুপ্রবেশ বিরল নয়। আপাতদৃষ্টিতে সাগর দূতাবাস প্রায় ফাঁকা বলেই মনে হবে। কিন্তু পুন্ডরীকাক্ষর মুখে দস্যুদের একজনের শরনিক্ষেপের বিবরণ শুনে আমি বিস্মিত হয়েছি। এত দক্ষ তীরন্দাজ দস্যুদের মধ্যে অসম্ভব। সত্যি কথা বলতে হস্তিনাপুরে এই ধরনের শরক্ষেপণের কৌশল জানা তীরন্দাজ আছে আঙুলে গোণা কয়েকজন।’

‘কী বলতে চাও?’ অল্লরাজের মুখ থমথমে হয়ে উঠল।

‘দস্যুদের একজন দৈহিক শক্তি এবং ক্ষিপ্রতার যে পরিচয় দিয়েছে সেটাও অতি বিরল।’

‘সে কি ভীম?’

‘ঠিক ধরেছেন।’ কর্ণ একটা শ্বাস ছাড়লেন ফোঁস করে। ‘আমার অনুমান এই যে সে রাতে পাণ্ডবরা সাগর দূতাবাসে প্রবেশ করেছিল।’

‘এটা আরও আগে বোঝা উচিত ছিল! অপদার্থ!’ অল্লরাজের মুখ পাথরের মত কঠিন হয়ে গেল। গলার স্বর শোনাল বরফের মত ঠান্ডা। ‘আমার সন্দেহ হচ্ছিল যে ভুসুকু আদৌ সম্মোহিত হয় নি। আশ্রমে তাঁর প্রচারের নমুনা দেখে তোমরা সন্তুষ্ট হলেও আমার সব শুনে খুশি হতে পারি নি। সম্মোহিত ব্যক্তির কাজে আর আচরণে কয়েকটি বিশেষত্ব থাকে। তোমাদের বিবরণে তার কোনও উল্লেখ পাই নি।’

‘ভুসুকু সম্মোহিত হয় নি?’ কর্ণ একটু ঘাবড়ে গেলেন। এটা সে আশা করে নি। তাহলে অল্লরাজের মত মায়াবীরও ভুল হয়!

‘বঙ্গ ও কামরূপীরা নিয়মিত মাছের ঝোল খায় বলে তাঁদের সম্মোহিত করা খুব কঠিন।’ অল্লরাজ বলতে লাগলেন। ‘ভুসুকু যে হস্তিনাপুরে এসেও নিয়মিত মাছের ঝোল খাবে তা অপ্রত্যাশিত। তোমরা ভুসুকু সম্পর্কে ভালমত অধ্যয়ন করো নি।’

অল্লরাজ চোখ বুঁজে একটু চিন্তা করলেন। কর্ণ পরিস্থিতির গুরুত্বটা এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। ভুসুকু সম্মোহিত না হওয়ার অর্থ হল সে সব জানে এবং তাঁর সাথে পাণ্ডবদের যোগাযোগ স্থাপন অসম্ভব নয়।

‘পাণ্ডবরা তবে সব জেনে গেছে গুরুদেব?’ কর্ণ বেশ চিন্তিত ভাবে প্রশ্নটা করল। অল্লরাজ চোখ খুলে সামান্য হাসলেন। ‘সে ক্ষেত্রে পুন্ডরীকাক্ষের কাজটা একটু কঠিন হবে। আপাতত সমস্যা হল ভুসুকু। তাঁকে বধ করার ব্যবস্থা করো কর্ণ!’

কর্ণ একটু চমকে উঠে বললেন, ‘অ্যাঁ?’

‘আজ রাতের মধ্যে ওকে ধরে আনো। আনতে না পারলে বধ করবে। এ ব্যাপারে দুর্যোধনের সাহায্য দরকার হবে তোমার।’

‘কিন্তু ভুসুকু তো আশ্রমে— ।’

অল্লরাজ এগিয়ে এসে কর্ণের একেবারে মুখোমুখি দাঁড়ালেন। হিমশীতল চোখে কয়েক পলক চেয়ে থেকে ফিসফিস করে বললেন, ‘ভুসুকুর সাক্ষ্যের ওপর ভিত্তি করে যুধিষ্ঠির যদি পুন্ডরীকাক্ষের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনে তবে তাঁকে এবং আমাকে বন্দী হতে হবে কর্ণ! অর্থাৎ আমাদের হস্তিনাপুর ত্যাগ করে পালাতে হবে। সাগর দূতাবাসের সবাইকে পালিয়ে যেতে হবে। দুর্যোধন যেমনই হোক না কেন, সে এখনও যুবরাজ হয় নি। রাজদ্রোহের অভিযোগ যে প্রমাণিত হবেই তার কোনও অর্থ নেই। আমরা শেষাবধি মুক্তি পেয়েও যাব। কিন্তু সে ক্ষেত্রে আমাদের পরিকল্পনার আর কোনও ভবিষ্যৎ থাকবে না।’

‘সব্বোনাশ!’ কর্ণ এতক্ষণে বাকি গুরুত্বটা অনুভব করলেন। না, ভুসুকুর বেঁচে থাকাটা তাঁদের পক্ষে অতি বিপদজনক। দুর্যোধন যদি এই ধরনের গোপন

হত্যাকান্ডে দক্ষ গুপ্তঘাতকদের কাজে লাগায় তবে আশ্রমে রাতের বেলা ভুসুকুর ঘরে ঢুকে তাঁকে বধ করাটা কোনও সমস্যা নয়। চেষ্টা করতে হবে জ্যান্ত ধরে আনতে। হত্যা করলে দেহটা নিয়ে আসতে হবে। তবে গোটা ব্যাপারটা ঘটাতে হবে গোপনে।

'আজ আর কাল সময় দিচ্ছি কর্ণ।' অল্লরাজ বললেন। 'পরশু আমি হস্তিনাপুর ত্যাগ করব কি না তা নির্ভর করছে তোমাদের ওপর। অবশ্য যদি আমাকে তোমাদের প্রয়োজন হয়!'

'অসম্ভব!' কর্ণ লাফিয়ে উঠলেন। 'ভুসুকুকে জীবিত অথব মৃত অবস্থায় আমরা আপনার কাছে নিয়ে আসব গুরুদেব! যে কোনও মূল্যে আমরা আপনাকে হস্তিনাপুরে রেখে দিতে চাই। একটি সাধারণ অসুরকে হত্যা করা খুব সামান্য কাজ।'

অল্লরাজ একটু হাসলেন। ভুসুকুকে ধরতে না পারলেও হত্যা করা আদৌ কোনও কঠিন কাজ নয়। এইটুকু গোপনে করতে না পারলে দুর্যোধনও বা ভবিষ্যতের শাসক হবেন কী ভাবে? কুরু-পাণ্ডবের মধ্যে বিভেদ ঘটাতে নেমে এখনও অবধি কোনও রক্তপাত হয় নি। ভুসুকুই না হয় প্রথম রক্ত দেবে!

কর্ণকে বিদায় দিয়ে নিজের প্রিয় কক্ষটিতে বসলেন অল্লরাজ। এই বাড়িতে অনেক সময় ব্যয় করে তিনি বিশেষ কিছু কাজ করেছেন। এমন কিছু যন্ত্র স্থাপন করেছেন যা তাঁকে আত্মগোপন করতে সাহায্য করবে। হস্তিনাপুর এখনও তাঁর কাছে বিপদজনক হয়ে ওঠে নি। কিন্তু ভুসুকু বেঁচে থাকলে এই নগরী তাঁর কাছে আর নিরাপদ থাকবে না। সব চাইতে বড় কথা হল যে পাণ্ডবরা নিশ্চিত হবে যে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মায়াবী অল্লরাজ অঙ্গার সত্যিই হস্তিনাপুরে বসবাস করছেন। এটা জানতে পারলে যুধিষ্ঠির তাঁকে সাদর আমন্ত্রণ জানাবেন হস্তিনাপুরের সভাসদ হওয়ার জন্য। অল্লরাজ সবিনয়ে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান নিশ্চই করতে পারবেন, কিন্তু এমন ঘটলে তাঁর মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে বাধ্য।

বেলা দ্বিপ্রহর গড়ালে পুন্ডরীকাক্ষ এলেন। অল্লরাজ তাঁকে প্রথমে মৃদু ভর্ৎসনা করলেন। 'সাগর দূতাবাসে বহিরাগতের অনুপ্রবেশের বিষয়টি তোমার গুরুত্ব দিয়ে ভাবা উচিত ছিল।' ক্ষুব্ধ স্বরে বললেন তিনি। 'দুর্যোধনের সাথে থেকে আশা করি চিন্তাশক্তিটা তাঁর মত করে ফেলো নি! অনুপ্রবেশকারীরা পাণ্ডব হওয়ার অর্থ হল তাঁরা সাগর দূতাবাসের গোপন কাজকর্ম বিষয়ে তাঁদের কাছে সংবাদ ছিল এবং সে সংবাদের একমাত্র সূত্র হতে পারে কেবল ভুসুকু। পাণ্ডবদের সাথে ভুসুকুর যোগাযোগের ব্যাপারে তোমরা সত্যিই কোনও কিছু জানতে না!'

পুন্ডরীকাক্ষ নীরবে মাথা নিচু করে থাকলেন। ভুলটা খুবই মারাত্মক। মাছের ঝোল খাওয়ার সাথে সম্মোহনের সম্পর্ক অবশ্য তাঁর জানা ছিল না, কিন্তু ভুসুকু সম্পর্কে বিস্তারিত সংবাদ তিনি যদি অল্লরাজকে সময়মত দিতে পারতেন তবে ঘটনাটা এই অবস্থায় এসে দাঁড়াত না। সম্মোহিত না হওয়া ভুসুকু তাঁদের

অল্লরাজ এগিয়ে এসে কর্ণের একেবারে মুখোমুখি দাঁড়ালেন। হিমশীতল চোখে কয়েক পলক চেয়ে থেকে ফিসফিস করে বললেন, 'ভুসুকুর সাক্ষ্যের ওপর ভিত্তি করে যুধিষ্ঠির যদি পুন্ডরীকাক্ষের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনে তবে তাঁকে এবং আমাকে বন্দী হতে হবে কর্ণ!

পক্ষে অতিশয় বিপদজনক। ইতিমধ্যেই সে অভিনয় করে অনেকটাই ফাঁকি দিয়ে ফেলেছে পুন্ডরীকাক্ষদের। তাঁকে হত্যা করা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

'মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ করতে হবে পুন্ডরীকাক্ষ।' অল্লরাজ বললেন। 'বিভাজন শুরু হয়ে গেছে। এ আর থামবে না। যদি ভুসুকুকে আরও একবার অপহরণ করে, একপক্ষ মাছের ঝোল না খাইয়ে আটকে রেখে সম্মোহন করতে পারি, তবে অতি উত্তম। অন্যথায় তাঁর বেঁচে থাকার আর অধিকার নেই।'

৪৮

যজ্ঞ প্রায় শেষের দিকে। কাল মহাযজ্ঞ। পরের দিন আগত মুনিঋষিদের সাথে নগরীর গণমান্য ব্যক্তিদের

সাক্ষাৎ শুরু হবে। মেলাও চলবে। সব মিলিয়ে কাল যজ্ঞ সমাপ্ত হলেও উৎসব থাকছে আরও কয়েকদিন। আগামিকালের মহাযজ্ঞে বিরাট বিরাট বলি হবে। যজ্ঞের আগুনও উঠবে সব চাইতে ওপরে। এ ছাড়াও আরও রকমারি নিয়ম তো রয়েইছে। আহূতির জন্য একশ আট রকম দ্রব্য মিলিয়ে নেওয়াটাই তো বিরাট একটা কাজ। যজ্ঞবেদীর জ্যামিতিতে গোলমাল থাকলে আগুন মাথা তুলবে না। শেষ মুহূর্তে সেটা আরেকবার মেপে নেওয়াটাও বেশ বড় একটা ঝক্কির কাজ। এইসব কারণে আশ্রমের প্রায় সবাই সেখানে সারা রাত কাজ করবে।

ভুসুকু আর চার্বাক অন্ধকারে বসে বসে গল্প করছিল। ভুসুকু কুটির থেকে বেরিয়ে অল্প দূরে একটা ঝোপের পাশে বসেছিল তাঁরা। আসলে ঘুম আসছিল না বলেই দু-জন বেরিয়ে এসে গল্প করছিল সেখানে। অল্প জ্যোৎস্নায় চারপাশে সবই আবছা, কালো কালো দেখাচ্ছে। গল্প করতে করতে মাঝে মাঝেই ওদের চোখ চলে যাচ্ছিল কিছুটা দূরে, যেদিকে একটি প্রবেশ পথ আছে। সেদিকে দু-একবার ছায়ামূর্তির নড়াচড়া টের পেয়েছিল ওরা। হতে পারে আশ্রমের কেউ। আজ গোটা রাতটাই সবাই এখানে জেগে আছে, তবে এদিকটায় ওরা দু-জন ছাড়া কেউ নেই। থাকার কথাও নয়। যজ্ঞের আয়োজনে ভুসুকুর কোনও ভূমিকা নেই এবং চার্বাক এই আশ্রমের কেউ নয়।

এক সময় চার্বাক কথা থামিয়ে হঠাৎ এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকল প্রবেশ পথটার দিকে। মনে হল সে বিশেষ কিছু একটা দেখেছে। ভুসুকুও তাকাল। কিন্তু তাঁর চোখে কিছু পড়ল না।

'পস্ট দেখলাম কয়েকটা ছায়া মূর্তি।' ফিসফিসে স্বর শোনা গেল চার্বাকের গলায়। 'আশ্রমের লোক কি না জানি না।'

আশ্রমের কেউ পেছন দিক থেকে ঢুকতেই পারে। কিন্তু তাঁদের হাতে মশাল থাকবে। ভুসুকু সেটা ফিসফিস করে জানিয়ে দিল চার্বাককে। চার্বাক শুনে বলল 'দমবন্ধ করে বসে থাকো। কেউ ভেতরে এলে এক্ষুনি চোখে পড়বে।'

চার্বাকের কথা শেষ হওয়ার আগেই ভুসুকু পরিষ্কার দেখতে পেল কয়েকটা ছায়ামূর্তি ঝোপঝাড়, গাছপালার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। সংখ্যায় চার-পাঁচজন হবে। মলিন চাঁদের আলোয় অন্তত দু-জনের হাতের তরোয়াল যে ঝিলিক দিচ্ছিল সেটা দু-জনেরই বুঝতে পারছিল। ওরা একটু এগিয়ে আসতেই বোঝা গেল দু-জন তিরন্দাজও রয়েছে। তাঁরা ধনুকে তির যোজনা করে এগিয়ে আসছিল। কিন্তু যেদিকে ভুসুকুরা ছিল সেদিক আসছিল না কেউ। ওরা খুব সন্তর্পণে, বেড়ালের মত পায়ে এগিয়ে যাচ্ছিল ভুসুকুর কুটিরের দিকে।

'ওরা তোমাকে ধরতে আসছে ভুসুকু। ওরা ভেবেছে তুমি তোমার ঘরে।'

ভুসুকুরও সেটাই মনে হচ্ছে। কিন্তু ওরা কারা? যে ভাবে সশস্ত্র হয়ে এসেছে তাতে মনে হচ্ছে ভুসুকুকে বধ করতেও কোনও আপত্তি নেই ওদের।

'ওরা কারা হতে পারে?'

'ভাল করে দেখ। পঞ্চমজনকে চেনা ঠেকবে তোমার।'

মুখের ওপর একটা ছায়া থাকায় অস্ত্রহীন পঞ্চমজনকে চিনতে পারছিল না ভুসুকু। লোকটি এবার ওদের পঞ্চাশ হাতের মধ্যে দাঁড়িয়ে ইশারায় বাকিদের কিছু একটা নির্দেশ দিচ্ছিল। হঠাৎ সে দু-পা এগিয়ে যেতেই ছায়াটা সরে গেল মুখ থেকে। ভুসুকু প্রচন্ড অবাক হয়ে বলল, 'পুন্ডরীকাক্ষ ধূর্জটিবর্মা!'

'এমন তো হওয়ার কথা নয়।' চার্বাক ঝোপটাকে ঢাল বানিয়ে খুব ধীরে পিছিয়ে যাওয়া শুরু করল। 'তোমার মুখে যতটা জেনেছি তাতে তুমি তো এখন ওদের লোক। সম্মোহিত হয়ে আছ।'

'সেটাই তো বুঝছি না। এখন কর্তব্য?'

চার্বাক তখনই কোনও উত্তর দিল না। দু-জন তরোয়ালধারি ইতিমধ্যে উঠোন পেরিয়ে কুটিরের ভেতরে ঢুকে পড়েছে। চার্বাক পিছিয়ে যাওয়া থামিয়ে দেখতে লাগল কী ঘটে। কিছুক্ষণ পর তরোয়ালধারিরা উত্তেজিত ভঙ্গিতে বেরিয়ে এসে বাকিদের কিছু বলতে শুরু করল। এবার পুন্ডরীকাক্ষ ছাড়া সবাই ভেতরে হানা দিল আরেকবার। ফের বেরিয়ে এসে তাকাতে লাগল এদিক ওদিক।

'ভাগ্য ভাল আমরা ভেতরে ছিলাম না।' চার্বাক ফিসফিস করল। 'তোমার কুটিরে অস্ত্রশস্ত্র কিছু আছে?'

'দাওয়ায় ওঠার মুখে একটা খুঁটিতে একটা ধনুক আর ঝোলার মধ্যে কিছু তির রাখা আছে।'

'অভাবনীয়!'

'তুমি কি তির-ধনুক আনতে আবার বাসায় ঢুকবে?'

'ওরা এদিক-ওদিক দেখছে। এই সুযোগে আমরা দু-জন পেছন দিক দিয়ে তোমার কুটিরে ঢুকে অস্ত্রগুলো নিয়ে নেব।'

দু-জন উঠে দাঁড়াল, কিন্তু তখনই নড়ল না। কারণ আশ্রমের দিক থেকে আরও তিনটে ছায়ামূর্তি ব্যস্ত পায়ে বেরিয়ে এসেছে। তাঁরা সম্ভবত আগন্তুকদের পরিচিত। চাঁদের আলোয় আসতেই তিনমূর্তিকে চিনতে মোটেও অসুবিধে হলো না ভুসুকু। দুই অনুচর সমেত অদত্ত।

'ওরা কথাবার্তায় ব্যস্ত। এই সুযোগ—।'

আধো অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে গাছপালা-ঝোপঝাড় বাঁচিয়ে হরিণের মত দৌড়ল চার্বাক। সমান দক্ষতায় ভুসুকু অনুসরণ করল তাঁকে। এক দৌড়ে কুটিরের পেছন দিকে এসে একবার দাঁড়াল। আগন্তুকদের সাথে অদত্তদের কথাবার্তা তখনও বোধহয় চলছে। সেদিকে একবার তাকিয়ে চার্বাক বলল, 'চারদিক গুছিয়ে নিয়ে তোমাকে ধরতে এসেছিল ভুসুকু। এখন ওরা একটু বিভ্রান্ত। আমাদের এখান থেকে পালাতে হবে।'

নির্দিষ্ট স্থান থেকে তির-ধনুক তুলে নিতে সময় লাগল না। কুটিরের ভেতর যে ওরা দু-জন এই মুহূর্তে থাকতে পারে সেটা ছিল পুন্ডরীকাক্ষের ধারণার বাইরে। ওরা তাই নিশ্চিন্তে অপেক্ষা করতে লাগল। একটু পরে দেখা গেল পুন্ডরীকাক্ষের লোকজন এদিক ওদিক অনুসন্ধান শুরু করেছে। কুটিরের বাইরে কেবল একজন তরোয়ালধারি দাঁড়িয়ে থাকল।

'আমি বলা মাত্রই তুমি দৌড় দিয়ে আশ্রম থেকে বেরিয়ে যাবে।' ধনুকে একটা তির এঁটে বলল চার্বাক।

'আশ্রমে রক্তপাত করবে নাকি?'

'উপায় নেই।'

হুস করে একটি তির উড়ে গিয়ে বিঁধল তরোয়ালধারির গলায়। কয়েক পলক দাঁড়িয়ে থেকে কাটা কলাগাছের মত পড়ে গেল সে। ভুসুকু শুনল চার্বাকের গলা 'যাও!'

তিরবেগে দৌড়ল ভুসুকু প্রবেশ দ্বারের কাছাকাছি আসতেই পেছন থেকে একটা চাপা চিৎকার শুনল সে। অদত্তর গলা। ওরা দেখে ফেলেছে ভুসুকুকে। দৌড়োতে দৌড়োতেই লম্বা একটা লাফ দিল ভুসুকু। তাঁর শরীর ঘেঁসে একটা তির বেরিয়ে গিয়ে আটকে গেল সামনের গাছটায়। প্রাণপণ শক্তিতে দ্বিতীয় লাফটা দিয়ে ভুসুকু প্রায় উড়ে গিয়ে পড়ল প্রবেশদ্বারের মুখে। খট করে একটা তির এসে বিঁধল খুলে থাকা কাঠের বিরাট পাল্লা দুটোর একটায়। ভুসুকু তৃতীয় লাফে বাইরে বেরিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ল মাটিতে।

পেছনে একজন তিরন্দাজ দৌড়ে আসছিল। এবার সে দাঁড়িয়ে পড়ে তাক করল পড়ে থাকা ভুসুকুর দিকে। তারপরেই একটা ঝাঁকুনি দিয়ে পড়ে গেল দড়াম করে। ভুসুকু দেখতে পেল আরও একজন দৌড়ে আসছে বাইরের দিকে। সে চার্বাক।

'ওই রথটা। শিগগির!'

চার্বাকের কথায় তড়াক করে লাফিয়ে উঠে ভুসুকু একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা একটা রথের দিকে দৌড়ল। রথটায় সারথি নেই। ঘোড়াটা চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। হতে পারে পুন্ডরীকাক্ষরা এটা নিয়ে এসেছে। ভুসুকু লাফিয়ে রথে উঠে লাগাম ধরে দিল একটা ঝাঁকুনি। চার্বাক ততক্ষণে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। ঘোড়াটা চলতে শুরু করেছিল। চার্বাক একটু দৌড়ে ধরে ফেলল রথটাকে। তারপর ক্ষিপ্র গতিতে রথে উঠে বলল, 'ছোটাও! ওরা পিছু নেবে!'

ঘোড়াটা বেশ শক্তিশালী। সে টগবগিয়ে ছুটল। তবে মূল নগরের দিকে না গিয়ে ছুটছিল উল্টো দিকে। চার্বাকের অনুমান সত্যি প্রমাণ হতে দেরি হল না। পর পর দু-জন অশ্বারোহী আশ্রম থেকে বেরিয়ে দ্রুত এগিয়ে আসতে লাগল। তাঁদের ঘোড়ার গতি কিছু বেশি। রথের সাথে প্রথম জনের ব্যবধান কমে আসছিল একটু একটু করে। এক সময় প্রথম অশ্বারোহী ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে বসেই ধনুকে তির যোজনা করল আশ্চর্য দক্ষতায়।

'অশ্বারোহী তিরন্দাজ!' চার্বাক সতর্ক করল ভুসুকুকে। তারপর ধনুকে তির এঁটে তাক করল অশ্বারোহীর দিকে। প্রায় একই সময় দুটো তির দু-জনের ধনুক থেকে ছিটকে বের হলো। অশ্বারোহীর

তির এক চুলের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হল, কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর ধনুকটাকে হাত থেকে ছিটকে বের করে দিল চার্বাকের তির। ধনুক হারিয়ে অশ্বারোহী তাঁর আক্রোশটা প্রকাশ করল লাগামের ওপর। ফলে তাঁর ঘোড়া ছোটা শুরু করল প্রায় বায়ুবেগে।

দ্বিতীয় অশ্বারোহী একটু পেছন থেকে এবার তির ছুঁড়ল। চার্বাক সময় মত বসে পড়ায় পতাকাবাহী দন্ডটাকে দু-টুকরো করে দিয়ে বেরিয়ে গেল সেই শর। অর্ধেক দন্ড সমেত চূড়ার অংশটা পথের ওপর আছড়ে পড়ল ঠকাস করে। বসে থাকা অবস্থাতেই পরের তিরটা ছুঁড়ল চার্বাক। হতভাগ্য প্রথম অশ্বারোহীর বুক ফুটো করে দিল সেটা। ঘোড়ার কাঁধে হুমড়ি খেয়ে পড়ল তাঁর প্রাণহীন দেহ।

'আরেকটু এগিয়ে দক্ষিণের পথটা ধরবে।' শান্ত গলায় সামনে প্রায় শুয়ে থাকার ভঙ্গিতে বর্তমান ভুসুকুকে নির্দেশ দিল সে। দ্বিতীয় অশ্বারোহী আবার একটা তির ছুঁড়ল। কিন্তু দু-জনেই নিচুতে থাকায় তিরটা শনশন করে, চার্বাকের চুলে হাওয়া লাগিয়ে বেরিয়ে গেল কেবল। অশ্বারোহী এবার পায়ে ভর দিয়ে উঁচু করল নিজেকে। কিন্তু তিরটা ভালমত তাক করার সময়টুকুও পেল না। সে উঁচু হওয়া মাত্রই বিদ্যুৎ ঝলকের মত ছিটকে আসা তিরটা এফোঁড় ওফোঁড় করে দিল তাঁর গলা।

আর কেউ নেই। একটু পরে দক্ষিণের পথে রথটাকে ঘুরিয়ে দিল ভুসুকু। কিছুটা এগিয়ে যেতেই চোখে পড়ল একটি চমৎকার উদ্যান। হস্তিনাপুরের উদ্যানগুলি রাতে সম্পূর্ণ নিরাপদ। ভেতরে রাজকীয় প্রহরীরা থাকে। উদ্যানের সামনে রথ দাঁড় করিয়ে ভুসুকু বলল, 'অতঃপর?'

'বাকি রাতটা উদ্যানেই কাটাই। মনে রেখো, ওরা তোমাকে বধ করতে এসেছিল।'

উদ্যানের পথ দিয়ে চুপচাপ হাঁটতে লাগল দু-জন। ভুসুকু ভাবছিল চার্বাকের কথা। সাধারণ মানের ধনুক দিয়ে সে যে শরক্ষেপণ কৌশলের প্রমাণ সে সদ্য রেখেছে তা বিস্ময়কর। চার্বাক না থাকলে পুন্ডরীকাক্ষ তাঁকে হত্যা করত আজ। কিন্তু সে এমন করল কেন? সে কি বুঝতে পেরেছে যে ভুসুকুর সম্মোহিত হওয়াটা একটা ভান মাত্র?

ওরা হাঁটতে হাঁটতে উদ্যানের এক প্রান্তে চলে এসেছিল। সামনেই একটা সরোবর। দু-জন সবিস্ময়ে দেখল সরোবরের অপর প্রান্তে রথের মত কিছু একটা বাতাসে ভেসে নেমে আসছে। তা থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে অপূর্ব আলো। সেই আলোকিত রথ ভূমি স্পর্শ করল নিঃশব্দে। একটা দ্বার যেন খুলে গেল। সেই দ্বারপথ দিয়ে বেরিয়ে এসে ঘাসের ওপর পা রাখলেন যুবরাজ যুধিষ্ঠির।

৪৯

সুখবরটা দুর্যোধনই নিয়ে আসলেন দিবা দ্বিপ্রহরের একটু পর পর। তাঁর প্রাসাদে তখন কর্ণ আর পুন্ডরীকাক্ষ বিশ্রামে থাকলেও অন্তরে ছটফট করছিলেন। পুন্ডরীকাক্ষের অস্থিরতা ছিল বেশি। সে স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি যে ভুসুকু তাঁদের নাগাল এড়িয়ে কেবল পালিয়েই যাবে না, তাঁর সাথে থাকা চার্বাক নামের ছেলেটি অসামান্য তীরন্দাজির দৃষ্টান্ত স্থাপন করে দুর্যোধনের গুপ্তঘাতক বাহিনীর কয়েকটার ভবলীলাও সাঙ্গ করে দেবে! দুর্যোধন অবশ্য আশা ছাড়েন নি। ভুসুকু আর চার্বাকের সংবাদ সংগ্রহের জন্য তাঁর গুপ্তচরেরা হস্তিনাপুরে ছড়িয়ে পড়েছে। 'আমি সত্যিই ওদের ব্যাপারে ভাল করে সংবাদ নিই নি।' মনে মনে ভাবছিল পুন্ডরীকাক্ষ। চার্বাক যে অমন শরক্ষেপণ করতে পারে এই সংবাদ জানা থাকলে পরিকল্পনাটা অন্য ভাবে ভাবা যেত। কাল সূর্যোদয়ের আগে যদি ভুসুকুকে ধরা অথবা বধ করা সম্ভব না হয় তবে দুর্যোধন তাঁকে নিজের একটি প্রমোদ কাননে আশ্রয় দেবেন বলে জানিয়েছেন। অবশ্য সাথে এটাও বলেছেন যে ভুসুকুর সন্ধান পেতে সময় লাগবে না। তারপর আজ রাতে তাঁকে বধ করাটা কেবল সময়ের অপেক্ষা। প্রয়োজনে কর্ণ নিজে যাবেন।

দুর্যোধনকে উৎফুল্ল মুখে আসতে দেখে পুন্ডরীকাক্ষ শয্যা ত্যাগ করে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। কর্ণও উদগ্রীব। 'সুখবর পেয়েছ মনে হচ্ছে?' তিনি জিগ্যেস করলেন। দুর্যোধন বাঁ হাতের তালুতে ডান মুষ্ঠি দিয়ে একটা আঘাত করে বললেন, 'জানা গেছে ওই দুটো কোথায় আশ্রয় নিয়েছে। স্থানটা হস্তিনাপুর একেবারে পশ্চিম সীমানার কাছে গঙ্গার ধারে।

পরিত্যক্ত একটা আশ্রমে ওরা আশ্রয় নিয়েছে। একজন গুপ্তচর সেই আশ্রমে লুকিয়ে ঢুকে পড়েছিল। সে ওদের কথাবার্তা শুনেছে। তা থেকে বোঝা গেছে যে কয়েকদিন সেখানে থাকবে তাঁরা।'

'পাণ্ডবদের সাথে দেখা হয়েছে ওদের?'

'গুপ্তচরেরা ওদের সকাল বেলায় একটা উদ্যান থেকে বের হতে দেখে। পাণ্ডবদের সাথে দেখা হওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই। তা ছাড়া রাজমহলের দিকে যাওয়া মাত্রই ওদের ওপর গুপ্তঘাতকের আক্রমণ হত।'

'তার মানে ওরা ওখানে লুকিয়ে থেকে পাণ্ডবদের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করবে।' একটা হাসি ফুটে উঠল কর্ণের মুখে। 'কিন্তু সে সুযোগ আর পাবে না বন্ধু। পুন্ডরীকাক্ষ বাছাই করে পঁচিশ ত্রিশ জন স্বেচ্ছাসেবী সৈন্য সাগর দূতাবাস থেকে নিয়ে সেখানে যাবেন। পথে আমি তাঁর সাথে মিলিত হব। আমরা রাত দ্বিপ্রহরের পর ওই আশ্রমে ঢুকব। সাথে থাকবে মশাল। ভেতরে কোনও কুটির দেখলেই মশাল ছুঁড়ে আগুন ধরিয়ে দেব। ওরা হয় পুড়ে মরবে নয় তো আমাদের শরে বিদ্ধ হবে।'

'চমৎকার বন্ধু!' দুর্যোধন মুগ্ধ হয়ে গেল কর্ণের পরিকল্পনায়।

'মন দিয়ে শুনুন পুন্ডরীকাক্ষ!' কর্ণ আদেশের সুরে বলতে লাগলেন। 'দশ-বারো জন দক্ষ তীরন্দাজ যেন আপনার বাহিনীতে থাকে।'

পরিকল্পনা মতই কাজ হল। রাত ঠিক দ্বিপ্রহরে হস্তিনাপুরের পশ্চিম সীমানার কাছে এক পরিত্যক্ত ঘাটে দুটো বড় বড় নৌকো এসে লাগল। পঁচিশ-তিরিশ জন সৈন্য নিয়ে ঘাটে পা রাখলেন পুন্ডরীকাক্ষ ধূর্জটিবর্মা। নৌকোয় গুঁজে রাখা একটি জ্বলন্ত মশাল থেকে ছ-সাতজন নিজেদের মশালগুলো ধরিয়ে নিতেই চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল হলুদ আলো। সেই আলোয় দেখা গেল একটি ছোট রথ এগিয়ে আসছে। কর্ণ চালাচ্ছিলেন সে রথ। তাঁর গায়ে বর্ম, মাথায় শিরস্ত্রাণ, হাতে কুচকুচ কালো রঙের একটি বিকট ধনুক।

'সবাই প্রস্তুত?' তিনি জানতে চাইলেন। চাপা, সমবেত স্বরে উত্তর এল 'প্রস্তুত!'

'চলো।'

নিঃশব্দে দলটি এগিয়ে যেতে লাগল পরিত্যক্ত আশ্রমের দিকে। বিরাট একটা ঢিবির মাথায় আশ্রমটা। প্রায় পঁচিশ-তিরিশ হাত উঁচুতে। ঢিবির মাথাটা কেটে আশ্রমটা তৈরি হয়েছিল। বর্তমানে সেটা নানা আকারের গাছপালা-ঝোপজঙ্গলের আড়ালে। ওপরে ওঠার জন্য ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে পায়ে চলা পথ রয়েছে।

'স্থানটি লুকিয়ে থাকার পক্ষে উত্তম।' উঠতে উঠতে ভাবছিলেন কর্ণ। ওপরে ওঠার পর মশালের আলোয় দেখা গেল সামনে একটি উদ্যান। তবে পরিচর্যার অভাবে আগাছাপূর্ণ। প্রায় একশ হাত দূরে একটা কুটির রয়েছে বলে মনে হল। কর্ণ এবার ইশারা করলেন। দু-জন তীরন্দাজ তাঁদের ধনুকে কাপড়

ভুসুকু আর চার্বাক ছাড়াও বিপরীত দিকে আসলে আরও চারজন ছিলেন। তাঁরা হলেন বাহুবলী, মহিষাসুর, যুধিষ্ঠির এবং অর্জুন। এটা ছিল আসলে পুন্ডরীকাক্ষের জন্য পাতা একটা ফাঁদ। জ্বলন্ত কুটিরের পেছনে আরও একটা কুটিরের আড়ালে ছিলেন তাঁরা।

জড়ান তীর লাগিয়ে মুখটা মশালের আগুনে ধরতেই সেটা জ্বলে উঠল দপ করে। নির্ভুল লক্ষ্যে উড়ে গিয়ে পড়ল কুটিরের গায়ে। শীতের শুকনো পরিবেশে কুটির জ্বলে উঠল দাউ দাউ করে। পরক্ষণেই অগ্নিবাণ নিক্ষেপকারী দু-জন 'আঁক' করে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। কোথা থেকে দুটো তীর এসে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়েছে তাঁদের বুক।

কর্ণ কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখলেন আরো দু-জন তীরন্দাজ ভূমিশয্যা নিল। এবার তিনি চিৎকার করে বললেন, 'সাবধান! তীর ছুঁড়ছে। আড়াল নাও!'

ঝপাঝপ সবাই গাছের আড়ালে লাফ মারল। তার মধ্যেই আরও দু-জনের ভবলীলা সাঙ্গ হলো শরাঘাতে। কিন্তু কর্ণও একজন অতি কুশলী এবং দক্ষ তীরন্দাজ।

তিনি অনুমানে বিপক্ষের তীরন্দাজদের অবস্থান বুঝে নিয়েছেন তীরের গতি লক্ষ্য করে। একটা ছোট ঢিবির আড়াল থেকে তিনি তীরন্দাজদের জানাতে লাগলেন কোনদিক নিশানা করতে হবে। তাঁরা লক্ষ্য স্থির করে একসাথে ছুঁড়ল তীর।

ভুসুকু আর চার্বাক ছাড়াও বিপরীত দিকে আসলে আরও চারজন ছিলেন। তাঁরা হলেন বাহুবলী, মহিষাসুর, যুধিষ্ঠির এবং অর্জুন। এটা ছিল আসলে পুন্ডরীকাক্ষের জন্য পাতা একটা ফাঁদ। জ্বলন্ত কুটিরের পেছনে আরও একটা কুটিরের আড়ালে ছিলেন তাঁরা। এতক্ষণ নিখুঁত লক্ষ্যে চার্বাক আর অর্জুন বিপক্ষের সেনাদের যমালয়ে পাঠাচ্ছিলেন। আচমকা এক ঝাঁক তীর তাঁদের চমকে দিয়ে কুটিরের দেয়ালে গেঁথে গেল। অল্পের জন্য বাঁচলেন কেউ কেউ।

'আক্রমণ!' বলেই লাফিয়ে বেরিয়ে এলেন অর্জুন। সাথে বাকিরা। লম্বা একটা তীর কুটিরের এই দেয়াল দিয়ে ঢুকে ওই দেয়াল দিয়ে বেরিয়ে গেল। সময় মত বেরিয়ে না এলে কোনও একজনের ভবলীলা সাঙ্গ করে দিত কর্ণের ছোঁড়া সেই কালান্তক বাণ। আগুনের পেছনে কয়েকজন ছায়ামূর্তিকে বেরিয়ে আসতে দেখে তীরন্দাজেরা টপাটপ তীর ছুঁড়তে লাগলেন। অর্জুন আর চার্বাক অদ্ভুত ছন্দোময় পদক্ষেপে একবার আড়ালে লুকিয়ে পড়ছিল এবং অকস্মাৎ ছিটকে বেরিয়ে এসে ছুঁড়ে দিচ্ছিল তীর। ফলে শত্রুপক্ষের তীরগুলি তাঁদের স্পর্শ করতে না পারলেও কর্ণের দিকের সেনারা একে একে প্রাণ হারাচ্ছিল। এবার বাধ্য হয়ে তরোয়ালধারীদের পাল্টা আক্রমণের নির্দেশ দিলেন কর্ণ। বাহিনী ছুটল সামনের দিকে। আগুনের ওপাশ থেকে বাঘের মত লাফিয়ে এলেন বীরবাহু আর মহিষাসুর। দু-জনের হাতে ঝকঝকে খাঁড়া।

শুরু হল তরোয়ালে-খাঁড়ায় তুমুল যুদ্ধ। ঠোকাঠুকির ধাতব শব্দে মুখর হয়ে উঠল স্থানটি। কর্ণের সেনারা সকলেই দক্ষ অসিচালক, কিন্তু মহিষাসুরের অলৌকিক খাঁড়াবিদ্যার কাছে তাঁরা যেন বালকমাত্র।. দু-হাতে দুটি খাঁড়া নিয়ে মহিষাসুরের দেহটি অবিশ্বাস্য দ্রুততায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল বিপক্ষের অসিধারীদের মধ্য দিয়ে এবং ক্ষণে ক্ষণে এক-একজন সেনার হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছিল তলোয়ার। তারপরেই সে হতভাগ্যের কণ্ঠনালী ছিন্ন হচ্ছিল অব্যর্থ কোপে। কামরূপ দূতাবাসের প্রধান বাহুবলী বীরবলীও কম যাচ্ছিলেন না, কিন্তু মাঝে মাঝে তিনিও মহিষাসুরের খাঁড়াচালন বিদ্যা প্রতক্ষ্য করে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছিলেন।

ধনুর্ধরেরা একে একে শয্যা নিচ্ছে দেখে কর্ণ এবার ধনুকে শর যোজনা করে মহিষাসুরকে তাক করলেন। কিন্তু ছুঁড়তে পারলেন না। খটাস করে একটা তীর তাঁর ধনুক দু-টুকরো করে বর্মে ধাক্কা খেয়ে নিচে পড়ল। কর্ণ সে ধাক্কা সামলে উঠতেই পরের তীরটা শিরস্ত্রাণের মাথায় লেগে ছিটকে গেল। তীরটা এত জোরে এসেছিল যে কর্ণ টাল খেয়ে গেলেন। পড়ে যাওয়া থেকে বাঁচতে হাত বাড়িয়ে সামনের গাছটাকে ধরতেই আঙুলের ঠিক ওপরে একটা তীর ঠক করে গেঁথে গেল গাছের কান্ডে। হতচকিত পুন্ডরীকাক্ষ কর্ণের দিকে এগিয়ে যেতেই ঠকাং করে একটা তীর ধাক্কা মারল তাঁর হাতের তলোয়ারে। হাত থেকে ছিটকে গেল সেটা।

কর্ণ গাছে হাত দিয়েই দাঁড়িয়ে আছেন। তীরটা সামান্য নিচে থাকলে তাঁর হাতের তালু ফুটো হয়ে যেত। শিরস্ত্রাণ নাড়িয়ে দেওয়া তীরটাও বিদ্ধ করতে পারত তাঁর গলা। কিন্তু যিনি তীরন্দাজ তিনি সেটা চান নি। এই জাতের তীরন্দাজ হস্তিনাপুরে তিনি ছাড়া আর একজনই আছেন। তিনি কি তবে এখানে?

আগুন পেরিয়ে দু-জন এগিয়ে আসছে। একজন নিরস্ত্র, অপরজনের হাতে ধনুর্বান। আগুনের আলোয় তাঁদের চিনতে পারলেন কর্ণ। যুধিষ্ঠির আর অর্জুন।

'আপনাকে বন্দী করতে এসেছি পুন্ডরীকাক্ষ ধূর্জটিবর্মা।' কিছুটা দূরে দু-জন দাঁড়িয়েছেন। যুধিষ্ঠিরের কথা শুনে পুন্ডরীকাক্ষ গর্জন করে বললেন, 'আমি দুর্যোধনের বন্ধু। আমাকে বন্দী করার অধিকার আপনার নেই!'

কর্ণ এবার গাছে ভর দেওয়া ছেড়ে সোজা হলেন। বিদ্রুপের সুরে বললেন, 'স্বয়ং যুবরাজ যুধিষ্ঠির কোন অভিযোগে পুন্ডরীকাক্ষকে বন্দি করতে চাইছেন জানতে পারি কি?'

ইতিমধ্যে শেষ তরোয়াল চালক শয্যা নিয়েছেন। তীরন্দাজদেরও কেউ অবশিষ্ট নেই। রক্তাক্ত খাঁড়াটা

ফেলে দিয়ে মহিষাসুর এগিয়ে এসে কঠিন স্বরে বললেন, 'যুধিষ্ঠির আপনাকে বন্দি রূপে আমার হাতে তুলে দেবেন পুন্ডরীকাক্ষ ধূর্জটিবর্মা! আমি আপনাকে কামরূপের রাজদূতের হাতে সমর্পণ করব। কারণ, আপনি কামরূপের এক নিরীহ নাগরিককে ছলেবলে-কৌশলে এক মারাত্মক অপরাধে নিয়োগ করতে চেয়েছিলেন।'

মহিষাসুরের উপস্থিতি পুন্ডরীকাক্ষকে হতবাক করে দিয়েছিল। এবার তিনি চিৎকার করে বললেন, 'অসম্ভব!' তারপর পরম হতাশায় হাঁটু মুড়ে বসে পড়লেন ভূমির ওপরে। কুটিরটি তখনও জ্বলছে হু হু করে। ছিটকে পড়া মশাল থেকে আগুন লেগে গেছে ছড়িয়ে থাকা শুকনো পাতায়। চারদিকে বেশ আলো। ভুসুকু কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে সব দেখছিল। এতগুলো মানুষের মৃত্যু সে চোখের সামনে কখনও দেখে নি। সে কখনও যুদ্ধে যায় নি।

অকস্মাৎ ধনুকের ছিলার মত ছিটকে সোজা হয়ে একটা ছোট তরোয়াল ছুঁড়ে দিলেন পুন্ডরীকাক্ষ। সতর্ক মহিষাসুর যদি ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে না দিতেন তবে সে তরোয়াল ঢুকে যেত যুধিষ্ঠিরের গলায়। তার বদলে সেটা উড়ে গেল জ্বলন্ত কুটিরের দিকে। পরক্ষণে অর্জুনের ধনুক থেকে ছিটকে আসা বাণ পুন্ডরীকাক্ষের বুক ফুঁড়ে দিল। দাঁড়িয়ে থাকার প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন পুন্ডরীকাক্ষ, কিন্তু শেষাবধি বসে পড়লেন। তাঁর মাথাটা ঝুলে পড়ল সামনের দিকে।

'ব্যাপারটা তবে ফুরিয়ে গেল রাজা কর্ণ!' কয়েক মুহূর্ত সবাই চুপ থাকার পর যুধিষ্ঠিরের গলা শোনা গেল। 'আশা করি দুর্যোধনকে এবার থেকে তুমি সৎ পরামর্শ দেবে।'

কর্ণ ক্রোধে থরথর করে কাঁপছিলেন। কিন্তু এই মুহূর্তে কিছু করার নেই। যুধিষ্ঠির আর কিছু বললেন না। পা বাড়ালেন সামনের দিকে। নিঃশব্দে বাকিরা তাঁকে অনুসরণ করলেন। কর্ণ এবার ছুটে গেলেন পুন্ডরীকাক্ষের দিকে। গায়ে হাত দিতেই বসে থাকা শরীরটা ধপ করে পেছন দিকে পড়ে গেল।

পুন্ডরীকাক্ষ এখন মৃত। কর্ণ চিৎকার করে বললেন 'আমি প্রতিশোধ নেব পুন্ডরীকাক্ষ!'

আগুন বাড়ছিল। হয় তো গোটা আশ্রম পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। হাওয়া বইছিল ধীরে ধীরে। সেটা বাড়ছে একটু একটু করে। হু হু শব্দে বেড়ে উঠছিল হুতাশন। সেই আগুনের ধোঁয়ার মত কর্ণের চিৎকার ছড়িয়ে গেল বাতাসে। তা পৌঁছল যুধিষ্ঠিরের কানে। তিনি বিষণ্ণ সুরে বললেন, 'কর্ণ মহাবীর। কিন্তু অকারণ বিদ্বেষ তাঁকে দুর্বল করে দিয়েছে।'

ছল ছল করে বইছিল গঙ্গা। তাঁর পাড় ধরে হাঁটতে লাগলেন তাঁরা।

পরিশিষ্ট

বসন্ত কাল।

পুন্ডরীকাক্ষের মৃত্যু হওয়ায় যুধিষ্ঠির আর কোনও উদ্যোগ গ্রহণ করেন নি। চরমুখে সংবাদ পেয়েছেন যে সাগররাজের দূতাবাসে কেউ আর থাকে না। অম্লরাজ অঙ্গারও হস্তিনাপুর ত্যাগ করে কোথাও চলে গেছেন। একটি পরিত্যক্ত আশ্রমে ভয়াবহ অগ্নিকান্ড এবং অনেকগুলি মৃতদেহ আবিষ্কারের সংবাদ অবশ্য হস্তিনাপুরে লোকজনের মুখে মুখে ঘুরেছিল কয়েকদিন। কিন্তু বিষয়টা রহস্যই থেকে গেছে। যুধিষ্ঠিরের নির্দেশে সকলেই মৌনব্রত অবলম্বন করায় সব কিছু গোপনই রয়েছে। অদত্তকেও কেউ আশ্রম থেকে বহিষ্কার করে নি। তবে হস্তিনাপুরে আর্যতত্ত্ব এখন অন্যতম আলোচ্য বিষয়। প্রতিদিনই তার পক্ষে-বিপক্ষে ঘোরতর আলোচনা হচ্ছে পণ্ডিতমহলে।

চমৎকার ফুরফুরে বসন্তের বিকেলে হস্তিনাপুরে একটি অভিজাত পাড়ায় একটা রথে চেপে টুক টুক করে যাচ্ছিল ভুসুকু। রথ চালাচ্ছিল মধুক্ষরা। ভুসুকু তাঁর পাশে বসে গল্প করছিল। এই পাড়ায় ভুসুকুর জন্য একটি ছোট উদ্যানবাটিকা উপহার দিয়েছেন ভীমসেন। যেই বিশেষ রান্নাটি ভীমসেনকে খাওয়াবে বলে হস্তিনাপুরে এসে ভুসুকু ভেবেছিল, যার জন্য সে যোগাযোগ করতে চেয়েছিল মধ্যম পাণ্ডবের সাথে, সেই রান্নাটি অবশেষে করতে পেরেছিল সে। সেটা খেয়েই এই বাটিকা উপহার দিয়েছেন ভীমসেন। ভোজনরসিক ভীমসেন সেই রান্নাটিকে আখ্যায়িত করেছেন পরমাশ্চর্যম শুষ্কং মৎস্যং নামে। সেটা আসলে শুটকি মাছ। আসার সময় যত্ন করে কয়েকটি

শুঁটকি এনেছিল দেশ থেকে ভুসুকু।

চলতে চলতে ভুসুকুর চোখে পড়ল একটি স্থানে একজন বক্তৃতা করছে। তাঁকে ঘিরে কয়েকজন শ্রোতা। বক্তার গলাটা কানে আসতেই ভুসুকু কৌতূহলী হল। অদত্ত বক্তৃতা করছে।

'দুর্যোধনের ভক্তসঙ্ঘের নতুন নিয়মটি এবার বলি। এটা কঠোর ভাবে মানতে হবে। কোনও অবস্থাতেই আমাদের ভক্তভাইরা মাছ খেতে পারবেন না। যত খুশি মাংস খান। যার মাংস ইচ্ছে হয় খান। রামচন্দ্রও খেয়েছেন। কিন্তু মাছ একেবারে চলবে না। আমরা অচিরে প্রমাণ করব যে মাছ হল অনার্য খাদ্য— ।'

ভুসুকু চমৎকৃত হল। মধুক্ষরা মুচকি হেসে বলল, 'তা তো বলবেই! শত হলেও মাছের ঝোল খেতে বলেই না সম্মোহিত হও নি।'

ভুসুকু রথের গতি বাড়াতে বলল। মধুক্ষরা পাকা চালিকা। খটখট শব্দ তুলে ছুটতে লাগল রথ। ভুসুকুর বেশ আরাম লাগছিল। কিছুদিনের মধ্যেই হস্তিনাপুর বাজারের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে তাঁর নতুন বিক্রয়কেন্দ্রের সূচনা হবে। উদ্বোধন করবেন স্বয়ং ভীমসেন। সেখানে পাওয়া যাবে 'খাঁটি কামরূপী মাছের ঝোল'। বিক্রয়কেন্দ্রের দেয়ালে একটি শিলালিপি থাকবে। লিপিতে থাকবে ভূতমিত্রের লেখা একটা শ্লোক। বেদব্যাসের মতে সে শ্লোকে ব্যাকরণের কিঞ্চিৎ ত্রুটি থাকলেও ভাবের বিচারে অতি উচ্চাঙ্গের। ভীষ্মও সে শ্লোক পড়েছেন এবং আপ্লুত হয়ে মোটা উপহার ঘোষণা করেছেন ভূতমিত্রের জন্য। 'কামরূপস্যমৎস্য রন্ধনশৈলীসমুচ্চয়' নামে একটি মাছ রান্নার পুঁথি রচনা করার জন্য ভীমসেন কয়েকজন সংস্কৃতজ্ঞ রচয়িতা নিয়োগ করেছেন ঠিকই, কিন্তু মাছের ঝোল-এর সংস্কৃত কী হবে তা নিয়ে মতানৈক্য দূর না হওয়ায় পুঁথি আটকে গেছে।

ভূতমিত্রের শ্লোকটি ভুসুকুরও বেশ ভাল লাগে। ফুরফুরে হাওয়া মুখে মাখতে মাখতে সে আবৃত্তি করল—

ধনং ক্ষীণং ভবেৎ ভোজনাৎ।
উদরং ভোজনাৎ বিবর্দ্ধতে।।

(সমাপ্ত)

নদীর দিকে আর কবে নজর ঘুরবে কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে

(৪৭ পাতার পর)

কোচবিহারের বাসিন্দা হলেও আলিপুরদুয়ারের নদীর বর্তমান অবস্থা নিয়ে ভীষণ চিন্তিত। তার কথায় ডলোমাইট মাইনিং ভারতের অংশে নিষিদ্ধ হলেও ভুটানে তো চলছে। ফলে সমস্যা বেড়েই চলেছে।

আর আছে অবৈধ মৎস্যশিকার। আগে এই নদীগুলিতে কত মাছ পাওয়া যেত। কিন্তু বর্তমানে মহাশোল, সরপুঁটি, ছোট ভেটকির দেখা মেলে না। পয়া, গুচি, চ্যাং ও অমিল। চ্যাপ্টা, চাঁদা, চ্যালা, বোরোলি মাছও কমেছে। বিষ প্রয়োগে বা ব্যাটারি দিয়ে জলের মধ্যে হালকা বিদ্যুৎ দিয়ে মাছ ধরেন অনেক মৎস্যজীবী। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় কালচিনি, ফালাকাটা, বীরপাড়া, কুমারগ্রাম,আলিপুরদুয়ার সহ বিভিন্ন এলাকায় দল বেঁধে নদীতে যান মৎস্যজীবীরা। একজন দুটি বাঁশের মাথায় লোহার রডে বিদ্যুতের তার লাগিয়ে তার সংযোগ করে দেন ব্যাটারিতে। নদীতে কোনও জায়গায় মাছ দেখলে নেগেটিভ ও পজিটিভ তার দুটি ওই জায়গায় লম্বা বাঁশের সাহায্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার মাছগুলি মরে নদীতে ভেসে ওঠে। তৎক্ষণাৎ মাছগুলি তুলে নেওয়া হয়। কুমারগ্রামের পুখুরি এলাকার ঘোলানি নদীতে প্রচুর মরা মাছ ভাসে। এইসব উপায়ে মাছ ধরার কথা তোর্ষা ও হলং নদীর ক্ষেত্রেও শুনেছি।

আলিপুরদুয়ার জেলার পরিবেশকর্মীরা কিন্তু বিভিন্ন সময়েই নদী ও পরিবেশরক্ষার জোরালো দাবি তুলেছে। রাজ্য নদী বাঁচাও কমিটির আহ্বায়ক হিসাবে বলতে পারি আলিপুরদুয়ার জেলার অনেক নদী বনাঞ্চলের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। ফলে এই অসীম বনসম্পদ, বন্যপ্রাণদের কথা ভাবতেও নদীগুলির কথা ভাবা জরুরি। এই ব্যাপারে সর্বতোভাবে স্থানীয় ও জেলা প্রশাসন, রাজ্য সরকার এবং ডলোমাইট মাইনিং ও জয়ন্তী নদীর সমস্যায় প্রসঙ্গে কেন্দ্র সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করব।

আমচরিত কথা

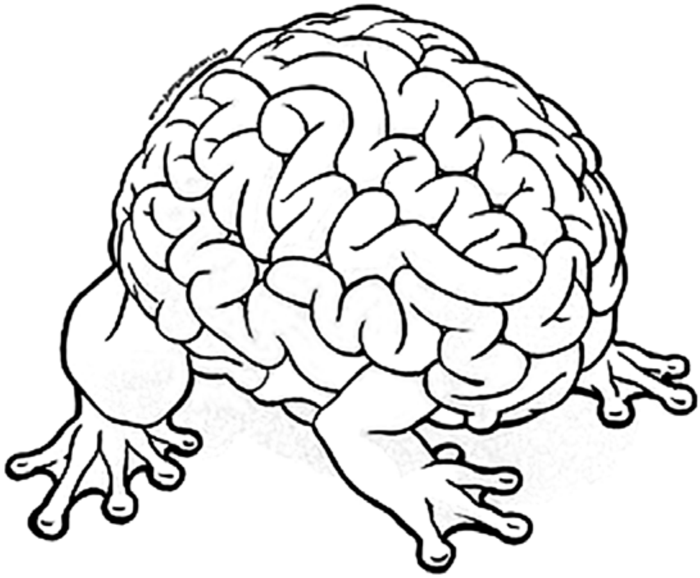

শখ-আহ্লাদ-নেশা

তনুশ্রী পাল

জীবন নামের পুস্তিকাটির প্রতি পাতায় কত শত রহস্য রোমাঞ্চ! সে আর অস্বীকারের উপায় কী? মানুষটি রাজার ঘরে (উদাহরণে শাক্যবংশীয় রাজা শুদ্ধোধন পুত্র বুদ্ধদেব) বা তস্য গরীবের (মিলপাড়ার পটা) ঘরেই জন্মাক; কারও জীবনই সরল মসৃণ নয় মোটে। জীবনে এত দুঃখের কারণ আর দুঃখ নিবারণের পথ খুঁজতে গিয়েই না রাজপ্রাসাদ, সিংহাসন সব ছেড়ে সিদ্ধার্থের বুদ্ধ হয়ে ওঠা। মিলপাড়ার পটার যদি ঘন ঘন প্রেমে পড়ার নেশা না থাকত তবে কি সে অমন 'পাগলা পটা' নাম ধারণ করে বাসস্ট্যান্ডের পাশের গাছতলায় বসে সারাদিন বিড়বিড় করত? সবই জীবনের নাটকীয় মোচড়! আমচরিতের আজকের পর্বে থাকছে একটু অন্যরকম নেশাগ্রস্ত, একটু অন্যরকম স্বভাবের দুচারজন মানুষের কথা।

আবার নেশাটুকু না থাকলে, মোচড়গুলো না থাকলে জীবন শুধু দিনযাপনের প্রাণধারণের গ্লানি ছাড়া কী? প্রাণবায়ুটুকু পদ্মপাতায় জল, সদাই করতেছে টলমল! জীবন মহার্ঘ্য, শরীর ধারণের নিমিত্তে দুবেলার দুমুঠো জোগাড়ের কত তরতারিকা, কত লড়াই! কিন্তু ওই যে মানুষ বড় বিচিত্র প্রাণী, সে তো শুধু দেহে বাঁচে না, মনেও বাঁচে। এই মন বাঁচে কীসে, না মনের চাষে। হ্যাঁ তাই তো অক্ষরে, তুলিতে, সুরে, ছন্দে, নূপুরে,মঞ্চে, সেলুলয়েডে আরও কত মাধ্যমে মানুষের আত্মপ্রকাশের আকাঙ্খা। সে

আকাঙ্খার পেছনে শখ, নেশা আর সাধনা। নেশায় পাগল সুকঠিন উচ্চতম পর্বতশিখরে উঠে পড়ে প্রাণ বাজি রেখে! ডাইভিং, রাফটিং, বাঙ্গি জাম্প, গ্লাইডিং আরও কত এ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস। মৎস্য মারিব খাইব সুখে থেকে শুরু করে ব্যাঘ্র হরিণ নানা জন্তু শিকার; রাজারাজড়ার আমলে হাতির পিঠে চেপে শিকারখেলার দস্তুর ছিল কিনা বলুন। খেলাধুলার নেশাও কি কম নাকি, মাঠে না নামলেও টিভিতে চোখ সেঁটে ক্রিকেট ফুটবলের হাড্ডাহাড্ডি লড়াই দেখেনা আমজনতা? বেটিং হয় না?

থাকগে বড়বড় নেশাড়ুর বড়সড় ব্যাপার; ছোট নেশাড়ুদের কথাই বলি। এক জ্ঞাতি দাদুর কথা শোনাই, তিনি ছিলেন পেশায় পোস্টমাষ্টার। গ্রামদেশের

আবার নেশাটুকু না থাকলে, মোচড়গুলো না থাকলে জীবন শুধু দিনযাপনের প্রাণধারণের গ্লানি ছাড়া কী? প্রাণবায়ুটুকু পদ্মপাতায় জল, সদাই করতেছে টলমল! জীবন মহার্ঘ্য, শরীর ধারণের নিমিত্তে দুবেলার দুমুঠো জোগাড়ের কত তরতারিকা, কত লড়াই! কিন্তু ওই যে মানুষ বড় বিচিত্র প্রাণী, সে তো শুধু দেহে বাঁচে না, মনেও বাঁচে।

মান্যজন, কিন্তু তরুণ বয়সে অবিবাহিত কন্যাদের প্রতি বিশেষ টানবশত অন্যের বাগান থেকে ফুলচুরি করে সেই রমণীদের নিবেদন করতেন। এভাবে মায়ের অতিযত্নের গোলাপ বাগান ন্যাড়া হয়ে গেল! তাঁর এহেন প্রেমে পড়া আর ফুলচুরির শখ বা নেশায় গ্রামসুদ্ধ লোক তাঁর প্রতি খুব বিরূপ ছিল। চিঠিপত্র বা মানিঅর্ডার এলে যদি হাপিশ করে ফেলে এই ভয়ে সামনে তাকে কেউ কিছু না বললেও পেছনে ডাকত 'ফুলচোরা'।

দ্বিতীয় কাহিনী মৎস্য শিকারের নেশাগ্রস্ত আমার এক মামা। অফিস ছুটি থাকলেই মাছ শিকার। ওই হাড় জিরজিরে শরীরে সারাদিন নাওয়া খাওয়া ভুলে বড় পুকুরে বড়শি পেতে ঠায় ফাৎনার দিকে চেয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকা। তার আগের রাত থেকে নানা মিশ্রণ সহযোগে অতিসুগন্ধি মাছের চাড় বানানো। প্রচুর অর্থব্যয় হয়ে যেত নানা সরঞ্জাম কিনতে। বাড়িতে তা নিয়ে ঝামেলাও ছিল বিস্তর। কিন্তু ঐ শখ বা নেশা। এক অফিস, আরেক মৎস্য শিকার— ব্যাস এর বাইরে পৃথিবীর আর কিছুতে তাঁর কোনও আগ্রহ ছিল না। ছেলেমেয়েদের নাম বা কোন ক্লাসে তারা পড়ে তাও সঠিক মনে থাকত না। এই মাছমারার শখ যত্নে লালন করে দীর্ঘ জীবন কাটিয়ে গেছেন।

গ্রামের হাড়কৃপণ যতন কাকা। ভয়ংকর টাকার নেশা মানুষটির। লোকে বলত সাইকেলের টায়ার ক্ষয়ে যাবার ভয়ে মাইল মাইল হেঁটে মেরে দেয়। অতি সামান্য আহার গ্রহণ করে বাড়িসুদ্ধ লোক অপুষ্টির রুগী! টিমটিমে বাল্বে সারাবাড়ি অন্ধকার, বাচ্চাদের রাতের পড়া বন্ধ। নানা প্রকারের ব্যাবসা আর সুদের কারবারি যতনকাকার শেষতক মৃত্যু হল যক্ষায়। ছেলেমেয়েরাও ভালমানুষ হয় নি।

গান গাইবার নেশা বা শখ ছিল খুব বেবি পিসির। তাঁর ইচ্ছে করত মঞ্চে মঞ্চে গান গেয়ে মাতিয়ে দেবে সবাইকে। তার গানের সিডি হবে এবং তা দেদার বিক্রি হবে। সত্যি কথা বলতে তার কন্ঠে সুর ছিল না মোটেও! গানের দিদিমনিও হতাশ ছিলেন পিসির ব্যাপারে। এমন বেসুরো কণ্ঠ সত্যি কম শুনেছি! কিন্তু এই তার শখ বা নেশা। সকাল দুপুর সন্ধেয় তার রেওয়াজ কানে গেলে মনে হত এই দেশ ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাই। বিয়ে হয়ে গিয়ে তার সুরসাধনা সমাপ্ত হল। সম্ভবত তাঁর সহৃদয় স্বামীটি তাঁকে প্রকৃত অবস্থা ও অবস্থানটি বোঝাতে সক্ষম হয়েছিল।

বিরাট বড়সড় চেহারার কৃষ্ণ ঘোষ কাকা, বড় বড় চোখ, প্রাণখোলা হা হা হাসি, গলা ছেড়ে গান। সবার খুব প্রিয় মানুষ ছিলেন তিনি। খুব খেতে ভালবাসতেন। ওই খাওয়া আর খাওয়ানো ছিল তার শখ বা নেশা। সেকালে বিয়েবাড়িতে খাওয়ার প্রতিযোগিতা চলত আর ঘোষকাকা অবশ্যই তাতে অংশ নিতেন। কে কত বেশি মাছ আর মিষ্টি খেতে পারে গুণে দেখা হত। বেশি খেলে সে জিতে গেল। কখনও কখনও এবিষয়ে বাজিও ধরা হত। সবটাই ছিল মজার ছলে। এমন

খেতে খেতেই ধরা পড়ল গুরুতর লিভারের সমস্যা। খুব অল্পবয়সে চলেও গেলেন।

এবারে আসি নবেন্দুর কথায়। ভারি চমৎকার ছেলে সে। স্বপ্নদর্শী মানুষ। ব্যক্তিগত শখ-আহ্লাদ মাত্র নয়। তার স্বপ্ন অনেক বড়, অনেক মানুষকে নিয়ে তার ভাবনা। বয়সে অনেক ছোট হলেও নবেন্দু আমার বন্ধু কাম ভাই। মনের নানা সুখ দুঃখ আশা স্বপ্নের কথা বলে। মেলা গুণও আছে ছেলের। বাঁশি বাজায়, গান লেখে, নাটক লেখে। গলায় মোটে সুর নেই বলে গায় না। ফুটবল খেলে। সাহিত্য ভালবাসে। সে প্রকৃতই এক স্বপ্নদর্শী যুবক। আবার আকাশের চাঁদ তারা দেখে শুধু হা-হুতাশ করে এমনটাও নয়। হাতে কলমে সব কাজ করে ফেলে; ওর উৎসাহ দেখে, উৎসাহিত হই। দেখতে শুনতে মন্দ নয়, মেয়েরাও তাকে খুউব পছন্দ করে। সেও মেয়েদের অপছন্দ করে এমনটাও নয়, কিন্তু বেশিদূর এগোতে পারে না। পারিবারিক কিছু বাধা আছে মনে হয়; এব্যাপারে সে খুব একটা বিপ্লবী হতে পারে নি।

নবেন্দু হঠাৎ আসে হঠাৎ যায় এ বাড়িতে। সেক্ষেত্রে কোনও টাইমটেবিলের ধার ধারে না। ভোর পাঁচটা বা রাত দশটাও হতে পারে। এমনই এক ভোরে বাইরের গেট টপকে ঢুকে বেল বাজায়। কে রে বাবা এত ভোরে। বাড়িসুদ্ধ লোক জেগে ওঠে। কী জানি কী দুঃসংবাদ হাজির হল ঘরের দরজায় সাতসকালে! হুড়মুড়িয়ে উঠে গ্রিলের চাবি নিয়ে নিচে দৌড়াই। দেখি হাসিমুখে নবেন্দু, 'ওমা তুই? কী খবর? ঘরে আয়।' 'ঘুমাচ্ছ? হে হে হে আমি ক্লাবের মাঠে যাচ্ছি। প্র্যাকটিস।' সে কাঁধের ঝোলা থেকে একতারা কাগজ বের করে গ্রিলের ফাঁক দিয়ে হাতে ধরিয়ে বলে, 'একটু প্রুফ দেখে রাখবা তো দিদি। সন্ধ্যার সময় নিয়ে যাব। পয়লা বৈশাখে বার করব। পত্রিকা, ওই তোমার ফোল্ডার। উত্তরবঙ্গের পুরাতত্ত্ব নিয়া দারুণ প্রবন্ধ আর রাজবংশী সমাজের বিবাহ আচার নিয়াও ভাল লেখা আছে,আর কবিতাও। সন্ধ্যার সময় আসব কিন্তু, হ্যাঁ। রেডি রাখবা।' হা হা করে পাড়া কাঁপিয়ে হেসে আবার সে গেট টপকায়, ওধারে তার বাইকে উঠে পড়ে। 'ওমা কীরে, চা খেয়ে যা। কী ছেলে রে তুই? কী পত্রিকা, হঠাৎ... এতগুলো লেখা, সন্ধ্যার মধ্যে...' আমার কথায় সে আদৌ কান দেয় না, 'পরে পরে' বলেই সাঁ করে বেরিয়ে যায়। কথা তো বলার ছিল; কবে আবার তোর পত্রিকার ভূত...। আমার খাতা দেখাও আছে, এরমধ্যে এতগুলো লেখা! অগত্যা কাগজের বান্ডিল নিয়ে ওপরে আসতেই ঘরের মন্তব্য শুনি, হুঃ! সব পাগলের কারবার। রাত দশটা নাগাদ ঝড়ের বেগে এসে নবেন্দু প্রুফ নিয়েও যায়। তারপর বেশ কিছুদিন খবর নেই।

হঠাৎ একরাতে তার আবির্ভাব, খানিক চুপচাপ বসে থেকে বলে 'দিদি চা দাও।' মুড়িমাখা আর দুকাপ চা নিয়ে বসি, 'বল খবর কী? পত্রিকা বেরোল? কেমন হয়েছে দেখালি না একটু।' 'আর বাদ্দেও ওগুলা কথা।

গান গাইবার নেশা বা শখ ছিল খুব বেবি পিসির। তাঁর ইচ্ছে করত মঞ্চে মঞ্চে গান গেয়ে মাতিয়ে দেবে সবাইকে। তার গানের সিডি হবে এবং তা দেদার বিক্রি হবে। সত্যি কথা বলতে তার কন্ঠে সুর ছিল না মোটেও! গানের দিদিমনিও হতাশ ছিলেন পিসির ব্যাপারে। এমন বেসুরো কণ্ঠ সত্যি কম শুনেছি! কিন্তু এই তার শখ বা নেশা। সকাল দুপুর সন্ধেয় তার রেওয়াজ কানে গেলে মনে হত এই দেশ ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাই।

একটা নাটক লিখচি। ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে করাবো। ছাত্রদেরকে সচেতন করতে গেলে নাটক সবচেয়ে ভাল মাধ্যম। তো নিয়াসচি দাঁড়াও শুনাই।' সে ল্যাপটপ বের করে ব্যাকপ্যাক থেকে।

নবেন্দু অরণ্যঘেঁষা এক ছোট্ট গ্রামের জুনিয়র হাইস্কুলে পড়ায়, এটাই তার প্রথম চাকরি। খুব পিছিয়ে পড়া অঞ্চল। নাটকের নাম লড়াই— সত্যি চমৎকার লিখেছে। বাল্যবিবাহ সহ নানান কুপ্রথার বিরুদ্ধে লড়াই। ফ্ল্যাশব্যাকে বারবার আনা হয়েছে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের সংগ্রামী জীবন, ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। 'স্কুলের ছাত্রদের দিয়ে করাব বুঝলা। খুব উৎসাহ ওখানকার গার্জিয়ানদের কিন্তু খুব গরীব

তো পোশাক-টোশাক সব আমাদের জোগার করতে হবে। আর শুনো ওই পত্রিকার কথা আর কী বলব, চোখে জল আসে!' 'এমা! কেন?' 'ওই প্রকাশ করা হল পয়লা বৈশাখের দিন সুবীরদার বাড়ির সাহিত্যের আড্ডায়। কেউ পাত্তাই দিল না তার উপর শিঙাড়া আর চা খাওয়াইলাম আমি। ওই পত্রিকার পাতা ছিঁড়ে প্লেট বানায়ে শিঙাড়া দিল সবাইকে!' 'মন খারাপ করিস না। বড়বড় কথা বললে আর লিখলেই হয়, মন বড় না হলে, অপরকে সম্মান না করতে পারলে এরা কীসের কবি কীসের লেখক?' ওকে সান্ত্বনা দিই।

ওদের স্কুলে, আশেপাশের স্কুলে অভিনীত হল নবেন্দুর নাটক। এরপর জেলাশহরে ছোটদের নাটক

> হঠাৎ একরাতে তার আবির্ভাব, খানিক চুপচাপ বসে থেকে বলে 'দিদি চা দাও।' মুড়িমাখা আর দুকাপ চা নিয়ে বসি, 'বল খবর কী? পত্রিকা বেরোল? কেমন হয়েছে দেখালি না একটু।' 'আর বাদ্দেও ওগুলা কথা। একটা নাটক লিখচি। ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে করাবো। ছাত্রদেরকে সচেতন করতে গেলে নাটক সবচেয়ে ভাল মাধ্যম। তো নিয়াসচি দাঁড়াও শুনাই।' সে ল্যাপটপ বের করে ব্যাকপ্যাক থেকে।

প্রতিযোগিতায় জনা তিরিশেক ছাত্রছাত্রী নিয়ে চলে এল নবেন্দু। ফোন করে 'দিদি চারটায় নাটক,অবশ্যই দুটোর মধ্যে চলে আসো।' হাত লাগাই মেকআপ, পোশাক পরানোয়। ওমা! দেখি গ্রামের খড়ের বাড়ির চালা, একদিকের বাঁশের বেড়া এসেছে, অন্যধারের বেড়াটি আসে নি! কী করে সেট বসবে মঞ্চে! মাথায় হাত! বাড়ির দিকে ছুটি, সারা বাড়ি তছনছ করে বাদামী রঙের একটা চেককাটা পুরনো কম্বল পাই। এধারের খুঁটিও আনা হয় নি। নবেন্দু বলে 'আর কোনও উপায় নেই দিদি, বাচ্চাগুলা হাইটে ছোট, এই সিনটার সময় কম্বলটা টানটান করে ধরে পিছনে দাঁড়ায় থাক তুমি।' অগত্যা ঘেমে নেয়ে কম্বলের বেড়া ধরে দাঁড়াই। টনটন করে হাত। তবে নাটকটি দ্বিতীয় হল।

মহা উৎসাহে কাজ করছিল ও, এর মধ্যে বাড়ি থেকে পাত্রী দেখে ধুমধাম করে বিয়ে হল। পাত্রী উচ্চশিক্ষিত, খানিক গুরুগম্ভীর। স্কুল, নতুন বউ, নতুন কর্মপরিকল্পনা নিয়ে ভালই চলছিল। বছরখানেক খবর নেই। কাগজে নাম আর ছবি দেখি; জেলার ঐতিহাসিক পুরাতত্ত্ব নিয়ে চমৎকার কাজের জন্য তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর ওকে পুরস্কৃত করেছে। ডিএমের হাত থেকে পুরস্কার নিচ্ছে নবেন্দু।

রাত ন'টা নাগাদ দু'দিন পরে ওর হঠাৎ আগমন। একটু ম্লান, চুপচাপ। 'তোর বউ ভাগ্য ভাল রে নবেন্দু। দ্যাখ বৌ ঘরে আসার পর তোর যশ খ্যাতি হচ্ছে। কবে খাওয়াবি বল।' 'আর খাওয়া। আর বউ।' বড় হতাশ মুখে সে শেল্ফের ওপরে রাখা 'লাফিং বুদ্ধে'র দিকে চেয়ে কেন যে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে! ঘটনা বুঝে উঠতে পারি না! কিছু তো সমস্যা বটেই। চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে বলি 'নে খা। কেন রে? কী হল?'

বিষণ্ণ চোখে কাপের দিকে চেয়ে সে বলে 'আমার ল্যাপটপটা ভাইঙ্গে দিল। একেবারে টুকরা টুকরা...।' 'এমা! বলিস কীরে? কে এমন কান্ড করল? কেন?' ভারি আশ্চর্য হই আমি।

ওইদিন ম্যারেজ ডে ছিল, বাইরে খাওয়াদাওয়া বেড়ানোর কথা ছিল, আমি তো আসলে ভুইলে গেছিলাম। তো ডিএমের হাত থেকে ফুলের তোড়া, উত্তরীয়, মিষ্টির প্যাকেট, মেমেন্ট সব নিয়া ভাবলাম ওর হাতে দিব, অবাক হবে, খুশি হবে। ঘরে ঢুকলাম, আমার ল্যাপটপটা হাতে নিয়া বইসাই ছিল। আমাকে দেখল তারপর এক আছাড় দিয়া একদম টুকরা টুকরা, কী রাগ! বাপরে বাপ!'

এমন সব 'দুর্ঘটনা'র কারণে নবেন্দু তার শখ বা নেশা ছেড়ে দিয়েছে ভাবলে বিরাট ভুল হবে। প্রতিকূল আবহাওয়ায় তার সৃষ্টিকাজ মাঝে মাঝে থমকালেও নেশা বা শখ কোনওটাই কিন্তু বিদূরিত হয় নি। ভাগ্যিস হয় না! ভাগ্যিস নেশা বা শখের প্রাণশক্তি বেশি তবেই না জীবন এমন হাজার প্রতিকূলতার মধ্যেও সহজ ও সবুজ! সুন্দর ও আলোময়।

গোষ্ঠী বিবাদের আত্মঘাতী কংগ্রেসী বিষ দলে প্রথম ব্যাপক ব্যবহার করেন সিদ্ধার্থশংকর রায়

রাজনগরের রাজনীতি

(৬)

অরবিন্দ ভট্টাচার্য

পাঁচের দশকের শুরু থেকে সাতের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত কোচবিহারে কংগ্রেস রাজনীতির গ্রামীণ জনসংযোগের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হয়ে উঠেছিল সমবায় ব্যবস্থা। গান্ধীজীর গ্রাম স্বরাজ ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কৃষি কল্যাণের আদর্শকে সামনে রেখে কংগ্রেস নেতা অতুল্য ঘোষ আর প্রফুল্ল সেনের অনুপ্রেরণায় কোচবিহারে সন্তোষ রায় আর সুধীর (বিশু) নিয়োগীদের উদ্যোগে একের পর এক গ্রামীণ সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি গড়ে উঠতে থাকে। কয়েক বছরের মধ্যেই মাকড়শার জালের মত জেলা জুড়ে প্রায় দুশো সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি গড়ে ওঠে। কৃষিজীবিদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করা যেত এই সব সমবায় সমিতিগুলির মাধ্যমে। এর কিছুদিন আগেই গ্রামীণ সমবায় সমিতির সদস্যদের কৃষি ঋণের যোগান দিতে জেলা শহরে কেন্দ্রীয় ভাবে গড়ে ওঠে কোচবিহার ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক (যা এখন ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক) আর কৃষকদের দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের যোগান দিতে গড়ে তোলা হয়েছিল ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক। মতদজীবিদের জন্য গড়ে তোলা হয়েছিল কোচবিহার সেন্ট্রাল ফিশারমেন্স কোঅপারেটিভ

সোসাইটি। আর শহরের মানুষজন যাতে ন্যায্য মূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পেতে পারেন সে জন্য কোচবিহার শহরে গড়ে তোলা হয়েছিল কোচবিহার হোলসেল কঞ্জুমার্স কোঅপারেটিভ সোসাইটি, যা এখন সমবায়িকা নামে পরিচিত। পাশাপাশি খাদি ও গ্রামীণ বয়ন শিল্পকে জনপ্রিয় করে তুলতে তন্তুজ, তন্তুশ্রী ও খাদি গ্রামদ্যোগ ভাণ্ডারের বিপনী কেন্দ্র গড়ে উঠলো শহরের বুকে। কৃষি সমবায় সমিতির সাথে সাথে জেলা জুড়ে অসংখ্য তন্তুজীবি সমবায় সমিতি ও মতনজীবি সমবায় সমিতি গড়ে তোলা হলো তদানীন্তন কংগ্রেস সরকারের উদ্যোগে। একদিকে জেলার রাজবংশী কৃষক সমাজ আর অন্য দিকে উদ্বাস্তু বয়ন শিল্পী আর মতনজীবিদের নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছিল স্বাধীনতা পরবর্তি কংগ্রেস নেতৃত্ব। এর ফলশ্রুতিতে অতি সহজেই কংগ্রেসের ভোট ব্যাঙ্ক শক্তপোক্ত হয়েছিল এ জেলায়। ভোটের প্রচারে গ্রামে গঞ্জে কংগ্রেস নেতারা এই সমবায় সমিতির মঞ্চকে পুরোদমে কাজে লাগাতেন। বিদেশের কমিউন রাজনীতির পোষক বাম দলগুলোর কংগ্রেসের এই নির্বাচনী কৌশল বুঝে উঠতে প্রায় তিন দশক কেটে গিয়েছিল।

মহাজনী শোষণের হাত থেকে অব্যাহতি দিয়ে কৃষকদের স্বাবলম্বী করে তুলতে সমবায়ের সে সময় কোনও বিকল্প ছিল না। গ্রামের বিরাট সংখ্যক কৃষিজীবি মানুষকে একটি ছাতার তলায় নিয়ে আসতে সমবায় প্রথা তখন টনিকের মত কাজ করেছিল। বলা বাহুল্য সমবায় সমিতিগুলোর পরিচালক মণ্ডলীতে গণতান্ত্রিক আধিপত্য কায়েম করে কংগ্রেস নেতারা সাধারণ নির্বাচনগুলোতে এর সুফল সুদে আসলে তুলে নিয়েছিলেন।

সফল সংগঠক ও ক্যাবিনেট মন্ত্রী সন্তোষ রায় গোটা জেলাটাকে হাতের তালুর মত করে চিনতেন। জেলা কংগ্রেসে তাঁর কথাই ছিল শেষ কথা। তাই সদ্য ফরওয়ার্ড ব্লক থেকে কংগ্রেসে আসা এ্যাডভোকেট বিনয়কৃষ্ণ দাশচৌধুরীকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিতে তিনি কখনই প্রস্তুত ছিলেন না। বিনয়কৃষ্ণ দাশচৌধুরীও কখনোই বিশ্বসিংহ রোডে ধর্মসভার দোতলায় জেলা কংগ্রেসের অফিসে আসতেন না। তিনি তাঁর নিউটাউনের বাড়ি থেকেই নিজস্ব স্টাইলে গোষ্ঠী পরিচালনা শুরু করেন। এদিকে সিদ্ধার্থশংকর রায়ের নেতৃত্বে ১৯৭২-এ রাজ্যে কংগ্রেস সরকার গঠিত হল। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসেও তখন তুমুল গোষ্ঠী কোন্দল শুরু হয়ে গেছে। একদিকে সন্তোষ রায়, জয়নাল আবেদিন, ভোলা সেন, অজিত পাঁজা, ডঃ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, তরুণকান্তি ঘোষ, অরুণ মৈত্র, প্রিয়-সুব্রত, সুদীপ-সৌগত, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় কুমুদ ভট্টাচার্যরা। আর অন্যদিকে এবিএ গনি খান চৌধুরী, আব্দুস সাত্তার, লক্ষ্মীকান্ত বসু, সুনীতি চট্টরাজ, সোমেন মিত্র, বীরেন মহান্তি, বারিদবরণ দাস, নির্মলেন্দু ভট্টাচার্য প্রমুখ। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের দৌহিত্র লব্ধ প্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টার সিদ্ধার্থশংকর রায় তখন ছিলেন ইন্দিরা গান্ধীর অত্যন্ত প্রিয়ভাজন এবং দোর্দন্ড প্রতাপশালী এক বিরাট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। দলে তাঁর নিষ্কন্টক নেতৃত্ব কায়েম রাখতে "ডিভাইড এন্ড রুল" অথবা বানরের পিঠে ভাগের নীতি অবলম্বন করে তিনি উভয় গোষ্ঠীকেই মদত দিতে শুরু করলেন।

কোচবিহারের বিনয়কৃষ্ণ দাশচৌধুরী গোষ্ঠী এই সুযোগ হাতছাড়া করলেন না। তাঁরা প্রদেশে সন্তোষ রায়দের বিরোধী গোষ্ঠী গণি খানচৌধুরীদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করলেন। কলকাতার মত কোচবিহারেও ছড়িয়ে পড়ল দুপক্ষের আলাদা সভা সমিতি এবং তীব্র গোষ্ঠী সংঘর্ষ। কলেজে কলেজে বোমাবাজি। লোহার রড, সাইকেলের চেন আর ধারালো অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দুই গোষ্ঠীর সমর্থকদের মারপিটে কোচবিহারের রাজপথ রক্তাক্ত হয়ে উঠল। কাকে ধরবে আর কাকে ছাড়বে — পুলিশও পড়ে গেল মহা বিপাকে। সন্তোষ রায় তখন ছিলেন ক্যাবিনেট মন্ত্রী আর তার বিরুদ্ধ গোষ্ঠীর নেতা মহঃ ফজলে হক তখন স্বরাষ্ট্র দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী। একজনকে খুশি করলে অন্য জনের গোঁসা হবে। তাই "ধরি মাছ না ছুই পানি" নীতি অবলম্বন করে চললো কোচবিহার পুলিশ। গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের উত্তাপ একটু একটু করে বেড়ে চললো।

শুধু জেলা নয় রাজ্য কংগ্রেস সংগঠনেও সন্তোষ রায় বেশ প্রভাবশালী ছিলেন। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় ভেতর থেকে তাঁকে খুব একটা পছন্দ করতেন না।

মন্ত্রী সন্তোষ রায়ের বিরুদ্ধে হুডনি সাহেবের

কাছ থেকে টাকা খাওয়ার জলো অভিযোগ ধোপে টিকাতে না পেরে, বিনয়কৃষ্ণ গোষ্ঠী অন্য সুযোগ খুঁজতে লাগলো। সুযোগ মিলেও গেল। এবার বিএ পাশ না করা বোনকে গ্রাজুয়েট পোস্টে সরকারি চাকরি পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ আনা হলো তাঁর বিরুদ্ধে। স্বজন পোষনের এই অভিযোগে ১৯৭৪ সালে রাজ্য রাজনীতিতে তোলপাড় শুরু হয়ে গেল। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় নিজের ইমেজ রক্ষা করতে নিজের মন্ত্রীসভার সদস্যদের বিরুদ্ধে তড়িঘড়ি সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি কৈলাশ নাথ ওয়ানচুর নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করলেন। এই কমিশনে ত্রাণমন্ত্রী সন্তোষ রায়, স্বাস্থ্যমন্ত্রী অজিত পাঁজা, বনমন্ত্রী সীতারাম মাহাতো, স্বাস্থ্য রাষ্ট্রমন্ত্রী গোবিন্দচন্দ্র নস্কর, সেচ ও বিদ্যুৎ রাষ্ট্রমন্ত্রী সুনীতি চট্টোরাজ ও স্বরাষ্ট্র দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়র বিরুদ্ধে প্রাথমিক ভাবে স্বজন পোষণ ও দুর্নীতির অভিযোগ আনা হয়েছিল মূলত বিরোধী গোষ্ঠীর সমর্থকদের তরফ থেকে। সুব্রত মুখার্জি হুংকার দিয়ে বলেছিলেন, "ওয়ানচুকে মেরে ভাঙচু করে দেবো"। সুব্রত মুখার্জি তখনো এ রাজ্যের অবিসম্বাদি ছাত্র নেতা। তাই বিপদ বুঝে তাঁর বিরুদ্ধে আনা সমস্ত অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিলেন কৌশলী নেতা সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়। অন্যদের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল। বিনয়কৃষ্ণ গোষ্ঠীর তরফ থেকে সন্তোষ রায়ের বিরুদ্ধে কমিশনে হলফ নামা জমা দেওয়া হলো। সন্তোষবাবুর বিরুদ্ধে অভিযোগ হলো, তিনি তাঁর মন্ত্রীত্বের প্রভাব খাটিয়ে নিজের নন-গ্রাজুয়েট বোনকে সোসাল ওয়েলফেয়ার বিভাগে গ্র্যাজুয়েট পদে চাকরি পাইয়ে দিয়েছেন। কলকাতায় কমিশনের কাজ শুরু হলো। সন্তোষ রায় তদানিন্তন দুঁদে ব্যারিস্টার শঙ্করদাস ব্যানার্জীকে নিয়োগ করলেন। আর বিনয়কৃষ্ণ শিবিরের পক্ষে দাঁড়ালেন কোচবিহারের স্বনামধন্য এডভোকেট অরুণকুমার ভট্টাচার্য।

গোটা রাজ্য রাজনীতি তখন ওয়ানচু কমিশনের শুনানি নিয়ে সরগরম। প্রতিদিন সমস্ত প্রথম শ্রেণীর দৈনিকগুলোতে ধারাবাহিকভাবে এই কমিশনের শুনানির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ ছাপা হতে লাগলো। প্রথম দিনের শুনানি চলাকালীন অরুণ ভট্টাচার্যের একটি ইংরাজি শব্দের উচ্চারণে ব্যঙ্গ করে শঙ্করদাস ব্যানার্জী তাঁকে বটতলার উকিল বললেন। আর যায় কোথায়, অরুণবাবু সঙ্গে সঙ্গে মুখের ওপর উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ স্যার, আপনি ঠিকই বলেছেন। আসলে বিলেতে পড়া কিছু ব্যারিস্টারের মত আমি হ্যাট-কোট-টাই পরিহিত কোনও ইংরেজের সন্তান নই! আমার শ্রদ্ধেয় পিতৃদেব ছিলেন একজন খাঁটি বঙ্গজ সাত্বিক ব্রাহ্মণ সন্তান"। আর কথা না বাড়িয়ে শঙ্করদাস ব্যানার্জী মুখ কালো করে বসে পড়লেন। কমিশনের শুনানি এগিয়ে চললো।

সন্তোষ রায়ের বিরুদ্ধে প্রধান সাক্ষী হিসেবে দাঁড় করানো হলো নিউটাউন উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা শ্রীমতি সবিতা রায়কে। তখনো তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে আসেন নি। সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়ানোর আগে অরুণ ভট্টাচার্য তাঁকে পাখি পড়ানোর মত করে

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের দৌহিত্র লব্ধ প্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টার সিদ্ধার্থশংকর রায় তখন ছিলেন ইন্দিরা গান্ধীর অত্যন্ত প্রিয়ভাজন এবং দোর্দন্ড প্রতাপশালী এক বিরাট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। দলে তাঁর নিষ্কন্টক নেতৃত্ব কায়েম রাখতে "ডিভাইড এন্ড রুল" অথবা বানরের পিঠে ভাগের নীতি অবলম্বন করে তিনি উভয় গোষ্ঠীকেই মদত দিতে শুরু করলেন।

তৈরি করে দিলেন। দুঁদে ব্যারিষ্টার শঙ্করদাস ব্যানার্জী অনেক চেষ্টা করেও স্পষ্ট বক্তা সবিতা দেবীকে তাঁর যুক্তি থেকে এক বিন্দু টলাতে পারলেন না। জেরার পর জেরাতেও তিনি কিন্তু অবিচল থাকলেন তাঁর ব্যক্তব্যে। মূলত সবিতাদেবীর সাক্ষীতেই মন্ত্রী সন্তোষ রায়কে স্বজন পোষনের অভিযোগে অভিযুক্ত করলেন বিচারপতি ওয়ানচু। দোষী সাব্যস্ত করা হলো সেচ ও বিদ্যুৎ রাষ্ট্রমন্ত্রী সুনীতি চট্টরাজকে। কমিশনের রায় মাথা পেতে নিয়ে ১৯৭৫ এর ২৯ জানুয়ারী ত্রাণমন্ত্রী সন্তোষ রায় তাঁর পদ থেকে ইস্তফা দিলেন। ইস্তফা দিলেন সেচ ও বিদ্যুৎ রাষ্ট্রমন্ত্রী সুনীতি চট্টোরাজ। তবে স্বাস্থ্যমন্ত্রী অজিত পাঁজা, বনমন্ত্রী সীতারাম মাহাতো ও

স্বাস্থ্য রাষ্ট্রমন্ত্রী গোবিন্দচন্দ্র নস্করকে তাঁদের বিরুদ্ধে ওঠা স্বজন পোষণ ও দুর্নীতির অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দিলেন বিচারপতি কৈলাশ নাথ ওয়ানচু।

সন্তোষ রায়ের পদত্যাগের সাথে সাথেই কোচবিহারে কংগ্রেসের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ শুরু হয়ে গেল। আলিপুরদুয়ার থেকে এমএলএ দেবব্রত চ্যাটার্জী (ভীষ্মদা) সাইকেল নিয়ে এসে আমাদের বোমা দিয়ে যেতেন। ভীষ্মদা দারুন বোমা বাঁধতেন। সুভাষের কাছে তখন একটা ছয় ঘরা ছোট্ট জাপানী রিভলবার ছিল। ওর মোটর সাইকেলের শব্দ শুনলে বিরোধীরা আগে ভাগেই কেটে পড়ত। রাস্তাঘাট ফাঁকা হয়ে যেত। এরই মধ্যে এক দিন দিনহাটার কংগ্রেস সমর্থক অশোক ভট্টাচার্য এসেছিল কোচবিহারে। ওর নামে তখন একটা কেস ছিল। ষ্টেশন মোড়ে নারায়ণ সিংএর চায়ের দোকানে ও সবে এসে ঢুকেছে, আড্ডা দেবে। পুলিশের এক দারোগা আর সেপাই খবর পেয়ে এসে হাজির। ওকে ধরে টানাহ্যাঁচড়া শুরু করে দিয়েছে, নিয়ে যাবে থানায়। যুবনেতা মৃণাল ভদ্র, সুভাষ কুণ্ডু, রতন বোস চ্যালেঞ্জ করে বসল দারোগাকে। অশোককে নিয়ে শুরু হল টানাটানি। এরপর শুধু অশোককেই নয়, ওই দারোগার বেল্ট জামা প্যান্টও খুলে নিল ওরা। সঙ্গের সিপাই তখন দে দৌড়। রিক্সা চেপে কোনও ক্রমে ওই দারোগা থানায় পৌছলেন। এ খবর থানাতে পৌঁছাতেই পুলিশ ক্ষোভে ফুঁসতে লাগল। তখনকার মত সবাই গা ঢাকা দিল। পরে অবশ্য পুলিশ সাহেবের কথা মত সবাই কোর্টে সারেন্ডার করল। টিআই প্যারেডে উকিল ওই পুলিশ অফিসারকে জিজ্ঞেস করলেন, দেখুন তো এদের মধ্যে কাকে কাকে আপনি চিনতে পারেন। চাপে পড়ে পুলিশ অফিসারটি বললেন, “স্যার চিনতে তো পারি, কিন্তু চেনাতে পারবো না”। ব্যাস খেল খতম! মামলা শেষ।

তখন কোচবিহারে নতুন পুলিশ সুপার এসেছেন সুন্দর সিং। তিনি কলকাতায় যোগাযোগ করলেন। মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয় থেকে সম্মতি নিয়ে আইজি রঞ্জিত গুপ্ত নির্দেশ দিলেন, দুই গোষ্ঠীর নেতাদের ধরে ধরে মেন্টেনেন্স অফ ইন্টার্নাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট (MISA) এ জেলে ভরে দাও। শুরু হল ব্যাপক ধর পাকড়। আমি তখন বিএ পাস করে চাকরির খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরছি। কলেজে ছাত্র পরিষদ করতাম। আমরা ছিলাম সন্তোষ রায়ের সমর্থক। ১৯৭৫ এর ২৭ ফেব্রুয়ারী রাতে বন্ধুর বিয়ের নেমন্তন্ন খেয়ে বাড়িতে শুয়ে আছি। ভোরবেলায় পুলিশ এসে আমায় তুলে নিয়ে গেল। বেশ কয়েকটা মিথ্যা মামলা সাজিয়ে দেওয়া হল আমার বিরুদ্ধে। জামিন-টামিনের বলাই নেই। দিন শেষে সোজা জেলখানা। মারামারি তো দূরের কথা জীবনে কাউকে একটা থাপ্পড়ও মারি নি আমি। বরাবর গোলমাল দেখলেই নিরাপদ দূরত্বে সরে পড়তাম। বিনা দোষে জেলে ঢুকে গেলাম। গারদের শিক ধরে শুধু চোখের জল ফেলা ছাড়া আমার আর করার কিছুই ছিল না।

জেলে গিয়ে পরিচয় হল মাথাভাঙার কংগে এস কর্মী রাম পান্ডেদের সাথে। ওদের সিপিএম নেতা রেবতী ভট্টাচার্যকে খুনের অভিযোগে ধরে আনা হয়েছে। পরদিন বন্ধু ছাত্রপরিষদ নেতা সুভাষ কুণ্ডুকে মিসায় আটক করা হলো। একটু পরেই দেখি আমাদের বিরুদ্ধ গোষ্ঠীর সমর্থক নগেন ঘোষকে ধরে আনা হয়েছে মিসাতে। এমনি করে দুই গোষ্ঠী থেকে হিটলার, কাজল গুপ্ত সবাইকে একে একে মিসাতে জেলে পুড়ে দেওয়া হল। বাইরে মারামারির সম্পর্ক হলেও জেলের ভেতর সবাই গলা জড়িয়ে ধরে কান্নাকাটি জুড়ে দিল আর সাথে সাথে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের গুষ্ঠির ষষ্টি পুজো শুরু হয়ে গেল কোচবিহার জেলখানার ভেতরে। কপালজোরে কয়েক মাস পর আমার জামিন হয়ে গেল। কিন্তু বাকিরা জেলেই থেকে গেলেন বছর ধরে। ভাল ছেলে সুনামের ছাত্র পরিষদ নেতা মিহির গোস্বামীর কালীঘাট রোডের বাড়িতে সাত সকালে ডিআইবি কালীবাবু গিয়ে খবর পৌঁছে দিল, “বড় সাহেব বলেছে তুমি এখনই জেলার বাইরে চলে যাও, না হলে এরেস্ট হয়ে যাবে”। মিহির সহ অনেক কংগ্রেস সমর্থক গ্রেপ্তারি এড়াতে জেলা ছেড়ে বাইরে পালিয়ে গেল। দলের যুবকদের মধ্যে একটা ত্রাস সৃষ্টি হয়ে গেল। এভাবেই নিজের ইমেজ তৈরি করতে কালিদাসের মত যে ডালে বসেছেন সেই ডালই কাটতে শুরু করে দিলেন বাংলার ব্যারিষ্টার মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়।

উত্তরীয় অভিমান প্রিয়রঞ্জন আজ বড় প্রাসঙ্গিক

প্রদোষ রঞ্জন সাহা

তাঁর সঙ্গে আমার কোনওদিন আলাপ-পরিচয়ের সুযোগ ঘটে নি। তাঁকে কয়েক ফুটের ব্যবধানে প্রথম দেখি ১৯৮৮ সালের ৫ই অগাস্ট কোচবিহারের শ্মশানঘাটে। তাঁর নিজের মৃতদেহর মত নিথর হয়ে যাওয়ার ঠিক কুড়ি বছর আগে এক গুমোট বিষণ্ণ বিকেলে, যুব কংগ্রেসের বিক্ষোভ মিছিলে পুলিশের গুলিচালনায় নিহত আমাদের প্রিয় বন্ধু বিমানের মৃতদেহের পাশে। স্বতস্ফূর্ত হরতালে স্তব্ধ

রাজনগরের শোকাতুর পথে সেদিন আমাদের সঙ্গেই পায়ে হেঁটে মিছিলে গিয়েছিলেন তিনি। তার আগের বছরই বিধানসভা ভোটের আগে রাজীব গান্ধীর সঙ্গে খোলা জীপে নির্বাচনী প্রচারে 'এই হতাশা ভাঙ্গতে চাই নতুন বাংলা গড়তে চাই' স্লোগান নিয়ে দেশের তরুণতম প্রধানমন্ত্রীর মতই তিনিও আমাদের হৃদয়ে অজান্তে অনুপ্রবেশ করেছিলেন। তখন উত্তর থেকে উঠে আসা দেবপ্রসাদ রায় বা মিহির গোস্বামীর মত জনপ্রিয় নেতা বা যুব নেতাদেরও প্রিয় নেতা ছিলেন তিনি, প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী।

আমার মতই সেসময় সদ্য আঠারো পার হওয়া অসংখ্য প্রতিবাদী ছাত্রদের বারবার মনে হত, উত্তর বাংলার লোক হয়েও কেন তিনি কেন শুধু আমাদের উত্তর বাংলার নেতা হলেন না! কেন তিনি কলকাতা দিল্লিতে গিয়ে রাজনীতি করে বেড়ান! কেন তিনি রায়গঞ্জ ছেড়ে গিয়ে সুদূর হাওড়া থেকে সংসদে যান! সেসব আক্ষেপ তখন অবোধ ছিল, কারণ তখনও আমাদের বুঝবার ক্ষমতা হয় নি, গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের বিষ পোকা কংগ্রেসের সংগঠনকে গ্রাস করেছে, নিজের মাটির লোকই তাঁকে ঘরে ফিরতে দিচ্ছিল না।

অবশ্য তারও কুড়ি বছর আগে থেকে তিনি গোটা বাংলার ছাত্রযুবদের হিরো হতে শুরু করেছেন। কমিউনিস্ট বিরোধী আন্দোলনে তিনিই তখন বাংলা তরুণসমাজের মসীহা। মনে আছে আশির দশকের গোড়ার দিকের কথা। একবার দিনহাটা শহরের পুরভোটে কংগ্রেসের প্রচারে এসে তাঁর একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণ আশ্চর্য আলোড়ন তুলে দিয়েছিল তখনকার ডাকসাইটে বাম নেতা কমল গুহদের মধ্যে— 'কমলবাবু কলকাতায় সকালে কোথায় যান সন্ধ্যায় কোথায় থাকেন কী করেন কাদের সঙ্গে ওঠাবসা করেন, সব খবর আমার কাছে আছে, কথা দিচ্ছি কিছুদিনের মধ্যেই এসব খবর আপনাদের জানিয়ে যাব।' সামান্য কটি নিরীহ কথা অথচ এতে কী নিদারুণ ক্ষেপে উঠেছিলেন কমলবাবুরা তা পরের কদিন প্রত্যক্ষ করেছি। এমনই জাদু কৌশল ছিল তাঁর বাগ্মিতায়। প্রতিবাদী ছাত্রযুব সমাজকে জাগিয়ে তুলবার যে চাবিকাঠি ছিল তাঁর কাছে, দুর্ভাগ্যবশত আজ অবধি বাংলায় তার কোনও দ্বিতীয় সংস্করণ মেলে নি।

আমার মতই সেসময় সদ্য আঠারো পার হওয়া অসংখ্য প্রতিবাদী ছাত্রদের বারবার মনে হত, উত্তর বাংলার লোক হয়েও কেন তিনি কেন শুধু আমাদের উত্তর বাংলার নেতা হলেন না! কেন তিনি কলকাতা দিল্লিতে গিয়ে রাজনীতি করে বেড়ান! কেন তিনি রায়গঞ্জ ছেড়ে গিয়ে সুদূর হাওড়া থেকে সংসদে যান! সেসব আক্ষেপ তখন অবোধ ছিল, কারণ তখনও আমাদের বুঝবার ক্ষমতা হয় নি, গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের বিষ পোকা কংগ্রেসের সংগঠনকে গ্রাস করেছে, নিজের মাটির লোকই তাঁকে ঘরে ফিরতে দিচ্ছিল না। কিন্তু তবু আজও মাঝেমধ্যেই ঘুরেফিরে প্রাসঙ্গিক মনে হয় সেই বাল্যকালের অবুঝ আক্ষেপ— প্রিয়রঞ্জন তাঁর নিজের জেলায় শেষ পর্যন্ত ফিরেছিলেন ঠিকই, কিন্তু আর দশটা বছর আগে ফিরে এলে উত্তরবঙ্গ যোগ্য এক লড়াকু নেতৃত্ব পেত নিজের পরিচয় ও অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করবার। সত্যি কথা বলতে, উত্তর বাংলা আর দ্বিতীয় প্রিয়রঞ্জনের জন্ম দিতে পারে নি।

অবিভক্ত পশ্চিম দিনাজপুরেই প্রিয়রঞ্জনের ছাত্র রাজনীতির সূচনা হয়েছিল। বাংলা জুড়ে তখন চূড়ান্ত রাজনৈতিক অস্থিরতা। কমিউনিস্টরা অন্যান্য বামপন্থী দোসরদের সঙ্গে নিয়ে বিপ্লবের পথ থেকে সরে এসে বাংলার মসনদে বসবার স্বাদ পেতে চাইছে। তখন কলকাতা থেকে রায়গঞ্জ আসবার পথ ছিল জটিল। গঙ্গার ওপরে তখনও সেতু নির্মাণ হয় নি, অতএব রাজমহল অবধি ট্রেন, তারপর ফেরিতে গঙ্গা পার হয়ে মানিকচক, মানিকচক থেকে সড়কপথে কালিয়াগঞ্জ হয়ে রায়গঞ্জ। কালিয়াগঞ্জের বাড়ি থেকে থেকে ২২ কিমি দূরের রায়গঞ্জ কলেজে পড়তে আসতেন প্রিয়রঞ্জন, বাংলায় অনার্স। গোড়ায় স্টুডেন্ট

ফেডারেশনের সমর্থক হলেও অচিরেই ছাত্র পরিষদে যোগ দেন। তাঁর বাগ্মিতা তাঁকে চিনিয়ে দিতে দেরি করে নি। সেসময় আন্তঃকলেজ ডিবেট প্রতিযোগিতা অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। ডিবেটে রায়গঞ্জ কলেজের ছাত্র প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সীর মূল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন বালুরঘাট কলেজের পিএসইউ (আরএসপি) ছাত্র নেতা ক্ষিতি গোস্বামী। কেউ কাউকে জমি ছেড়ে দিতে নারাজ। দলমত নির্বিশেষে ছাত্রছাত্রীদের সেই ডিবেট নিয়ে কাটত চরম উত্তেজনাময় দিনগুলি। অতি সঙ্গত কারণেই প্রিয়রঞ্জন যে অতি দ্রুত ছাত্রছাত্রীদের অতীব প্রিয় উঠলেন তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না!

এরপর প্রিয়রঞ্জন কলকাতায় চলে গেলেন আইন পড়তে। রাজ্যস্তরের প্রতিবাদী ছাত্র রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়তে দেরি হয় নি, তাঁর কেরিয়ার গ্রাফ উঠেছে রকেটের গতিতে। সাতষট্টিতে শ্যামল ভট্টাচার্যকে হারিয়ে রাজ্য ছাত্র পরিষদ সভাপতি, সত্তরে রাজ্য যুব কংগ্রেস সভাপতি, একাত্তরে অল ইন্ডিয়া ইয়ুথ কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট এবং দক্ষিণ কলকাতা কেন্দ্রের এমপি ডাকাবুকো সিপিএম নেতা সত্তরোর্ধ প্রবীণ গণেশ ঘোষকে হারিয়ে সাংসদ। বয়স তখন মাত্র ছাব্বিশ। ভাবা যায়? অন্তত সেসময়ের বার্ধক্য-বেষ্টিত বঙ্গ রাজনীতিতে তো নয়ই! প্রিয়রঞ্জনের সেই ইয়াং ব্রিগেডে যোগ দিয়েছিলেন কলকাতার তরুণ তুর্কী সৌগত রায় সুব্রত মুখোপাধ্যায় সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়রা। ছাত্র পরিষদ থেকে সরাসরি যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে লড়াইতে রাজনীতির এক নতুন অধ্যায় সৃষ্টি হয়েছিল সন্দেহ নেই। কলকাতা লেক মার্কেটে লক্ষ্মীকান্ত বসুর ডাকা প্রথম বনধের মতই আলিপুরদুয়ারে জ্যোতি বসুর আগমনের প্রতিবাদে ডাকা সফল হরতাল তারই উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করে। উত্তরবঙ্গের এক কোণ থেকে উঠে আসা এক 'পেডিগ্রিবিহীন ছোকরা' প্রিয়রঞ্জনের নেতৃত্বকে মাথা পেতে মেনে নিয়েছিল কলকাতার যুব নেতারা, এই নজির কলকাতা-মুখাপেক্ষী বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে এর আগে বা পরে কখনও হয় নি। আজকের 'অবজার্ভার' নিয়ন্ত্রিত রাজনীতিতে সদা-হাত-কচলানো উত্তরের তথাকথিত যুব নেতারা এ জিনিস স্বপ্নেও ভাবতে পারেন কি?

কিন্তু পঞ্চাশ বছর আগেও যুবনেতা প্রিয়রঞ্জনের এই ঝড়ের গতিতে উত্থান মেনে নিতে পারেন নি দিল্লিতে গিয়ে হাত-কচলানো বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতারা। কেবলমাত্র সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় ও মায়া রায়কে দায়ী করলে চলবে না, পশ্চিম দিনাজপুর জেলার জয়নাল আবেদিন বা মোহিত শিকদারদের মত কংগ্রেস নেতৃত্বও তরুণ প্রিয়রঞ্জনকে স্বীকৃতি বা সমর্থন দিতে উৎসাহী হন নি বলেই শোনা যায়। তাই আজকের দিনে দাঁড়িয়েও বুঝতে অসুবিধা হয় না, নিজের জেলা থেকেই সক্রিয় বিরোধিতার আঁচ প্রিয়রঞ্জনকে তখন নিজের মাটি থেকে আরও দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। আজ আর অস্বীকার করবার কোনও যুক্তি বা উপায়ও নেই, ইতিহাস সাক্ষী, একদিকে যুক্তফ্রন্টে ক্ষমতাসীন বামেদের উগ্র রাজনীতি, অন্যদিকে চারু মজুমদারদের অতিবাম 'বন্দুকের নল ক্ষমতার উৎস' মতবাদ ও কার্যকলাপ- এই দুইয়ের বিরুদ্ধে জঙ্গী আন্দোলনকে যে উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিল প্রিয়রঞ্জনের নেতৃত্ব, তার ডিভিডেন্ড দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে নি দলের বর্ষীয়ানদের এই অহেতুক অপদার্থতায়। বাহাত্তরে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় মসনদে বসেছিলেন ঠিকই, কিন্তু মূলত তাঁর পৃষ্ঠপোষকতাতেই চরম গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে দীর্ণ দল বামেদের ফিরে আসার পথ সুগম করেছিল। আর টানা চৌত্রিশ বছরের শাসনকাল সুনিশ্চিত করেছিলেন সিদ্ধার্থ রায়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু জ্যোতি বসু।

বাহাত্তরের সরকারে মন্ত্রীত্ব পেয়েছিলেন সুব্রত-সৌগত-র মত অনুগামীরা, কিন্তু উত্তরের উদীয়মান তারকা প্রিয়রঞ্জন যে রাজ্য রাজনীতিতে ফিরে আসেন নি তার কারণও তাই আজ সুস্পষ্ট। কিন্তু সেসময় তার দিল্লির দিনগুলিও সুখকর ছিল কি? পঁচাত্তর সাল অব্দি থেকে গিয়েছিলেন সর্বভারতীয় যুব কংগ্রেস সভাপতি পদে, কিন্তু তারপর আর পারেন নি খোদ ইন্দিরাপুত্র সঞ্জয় গান্ধীর ইচ্ছের বিরুদ্ধে টিঁকে থাকতে। তৎকালীন 'যুবরাজ' সঞ্জয় গান্ধীর তখন অতি পছন্দের নেত্রী ক্যারিশ্মাটিক অম্বিকা সোনি বসবেন ওই আসনে, অতএব সে লড়াইতেও হার মানাই স্বাভাবিক ছিল এই উত্তরবঙ্গ তনয়ের। পেছনের ইতিহাস বা এআইসিসি-র অন্দরের রাজনৈতিক কহানি কী বলে আমার জানা নেই, তবে এটা ঠিক যে উনআশিতে জিহাদি হয়ে দল ছাড়লেও সঞ্জয় গান্ধীর জীবিত কালে

কিন্তু তিনি ফেরেন নি দলে। তারপর ফিরলেও দিল্লির রাজনীতিতে প্রিয়রঞ্জন প্রকৃত পুনর্বাসন পেয়েছিলেন চুরাশিতে ইন্দিরাজির মৃত্যুর পর। রাজীব গান্ধীর হাত ধরে পঁচাশিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় জায়গা করে নিয়েছিলেন প্রিয়রঞ্জন। রাজনীতিতে নবীন রাজীবের প্রিয়রঞ্জনে আস্থা তৈরি হয়েছিল মায়ের চাইতেও কয়েক গুণ বেশি।

এখানে উল্লেখ করতেই হয়, তরুণ প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী সেসময় বাংলার যে দুজনের মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন নবীন প্রজন্মকে নেতৃত্ব দেওয়ার সম্ভাবনা, তাঁরা দুজনেই উত্তর বাংলার। একজন অবশ্যই

বাহাত্তরের সরকারে মন্ত্রীত্ব পেয়েছিলেন সুব্রত-সৌগত-র মত অনুগামীরা, কিন্তু উত্তরের উদীয়মান তারকা প্রিয়রঞ্জন যে রাজ্য রাজনীতিতে ফিরে আসেন নি তার কারণও তাই আজ সুস্পষ্ট। কিন্তু সেসময় তার দিল্লির দিনগুলিও সুখকর ছিল কি? পঁচাত্তর সাল অব্দি থেকে গিয়েছিলেন সর্বভারতীয় যুব কংগ্রেস সভাপতি পদে, কিন্তু তারপর আর পারেন নি খোদ ইন্দিরাপুত্র সঞ্জয় গান্ধীর ইচ্ছের বিরুদ্ধে টিঁকে থাকতে।

প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী, অপরজন প্রিয়রঞ্জন-অনুগামী জলপাইগুড়ির ডিপি রায় ওরফে মিঠু। ডিপি-কে তিনি কাজে লাগালেন দেশের নানা প্রান্তে ছাত্রযুব কর্মীদের প্রশিক্ষণ দিতে। আর আমরা উত্তরের ছাত্রযুব সমাজ সেসময় রোমাঞ্চিত হতাম প্রধানমন্ত্রীর হুডখোলা জোঙ্গা জীপ চালিয়ে গ্রাম বাংলা ঘুরে বেড়াবার ছবি দেখে, আর সঙ্গী হিসেবে দেখতাম প্রিয়রঞ্জনকে। রাজনীতিতে পাশার দান উলটে গেছে, নিজের জেলা থেকে, উত্তরবঙ্গ থেকে, এমনকী দিল্লির মঞ্চ থেকে একপ্রকার বিতাড়িত হয়েও জাতীয় রাজনীতিতে ফের প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠলেন নিজের যোগ্যতাতেই। হোয়াট আ কামব্যাক, প্রিয়রঞ্জন!

সে কামব্যাক শুধু রাজনৈতিক কেরিয়ারেই নয়, এরপর বোধহয় উত্তরে নিজের ঘরে ফেরার তাগিদও অনুভব করতে শুরু করলেন তিনি। সাতাশির বিধানসভায় তাঁর প্রদেশ সভাপতিত্বে কংগ্রেস ভাল ফল করতে পারে নি। উননব্বইতে সাধারণ নির্বাচনে রাজীব গান্ধীর কংগ্রেস হেরে গেল ভিপি-বাম-বিজেপির নীতি-বিসর্জিত জোটের কাছে, একানব্বইতে কংগ্রেস ফিরলেও তিনি জিততে পারেন নি। তার ওপর একানব্বইতে রাজীবজির হঠাৎ চলে যাওয়া এবং মসনদে বসা নরসিংহ রাওয়ের তাঁর প্রতি অপ্রসন্নতা— এই দুইয়ের কম্বাইন্ড এফেক্ট তো ছিলই। উত্তরের প্রবীণ কংগ্রেস নেতারা কেউ কেউ মনে করেন, তিরাশিতে কলকাতা এআইসিসি অধিবেশনে বিদেশ নীতি নিয়ে প্রস্তাব বক্তৃতায় শেষ মুহূর্তে ইন্দিরাজীর নরসিংহ রাওকে পালটে সদ্য দলে ফেরা প্রিয়রঞ্জনকে সুযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত তাঁর নরসিংহের বিরাগভাজন হওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল। কেউ আবার বলেন, রাও আগাগোড়াই প্রিয়-বিরোধী ছিলেন। তবে সবাই একমত, প্রিয়রঞ্জনের সৌভাগ্য যে উননব্বই থেকে ছিয়ানব্বই সাল, এই সাত বছর সংসদের বাইরে কাটাতে হয়েছে তাঁকে, সেসময় কংগ্রেসের চূড়ান্ত অন্তর্কলহ এবং বাবরি মসজিদের মত কালো অধ্যায় থেকে দূরে জাতীয় ফুটবলের উন্নয়নে মগ্ন থাকতে পেরেছিলেন তিনি। সেইসময়ই তাঁর উত্তরে ফেরার জন্য উত্তরবঙ্গের অনুগামীদের ক্রমাগত অনুরোধ উপরোধ বাড়ছিল, অবশেষে আটানব্বইতে হাওড়া থেকে পাকাপাকি ফিরলেন রায়গঞ্জে।

দীর্ঘ তিন দশক পরে নিজের জমিতে লড়াই করতে ফিরলেও ময়দান কিন্তু অচেনা অপ্রস্তুত ছিল না প্রিয়রঞ্জনের কাছে। কারণ মালদা থেকে কোচবিহার সর্বত্র যুব কর্মী নেতাদের তো বটেই, অনেক সিনিয়র কংগ্রেস নেতাদের কাছেও তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ছিল অবিসংবাদিত। কেবলমাত্র বাগ্মিতাই নয়, বিরল স্মরণশক্তির অধিকারী প্রিয় দাসমুন্সি ব্লক স্তরের নেতা কর্মীদের নাম মনে রাখতেন অক্লেশে। তাঁর অনুগামী তৈরি করে নেওয়ার আশ্চর্য জাদুশক্তি প্রশ্নাতীত না

হলেও বাস্তবে যে অত্যন্ত কার্যকরী ছিল তা নিয়ে কোনও অবকাশ থাকে না। তাঁর নিজের জেলাতেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। কিন্তু তবু তাঁর আটানব্বইয়ের নির্বাচনে রায়গঞ্জে মাত্র ছ হাজার ভোটে (শতাংশের হিসেবে ব্যবধান ০.৭১) হেরে যাওয়ার সদুত্তর বা ব্যাখ্যা খুঁজতে আজও অনেকেরই ভুরু কোঁচকায়। যদিও তার ঠিক এক বছর পরেই ফের অনুষ্ঠিত লোকসভা নির্বাচনে সেই ব্যবধান বাড়িয়ে ৮.৬ শতাংশ করে জয়ী প্রিয়রঞ্জন যেমন প্রতিষ্ঠা করলেন নিজের মাটিতে তাঁর ম্যাজিকাল কামব্যাক, তেমনই প্রমাণ করলেন তিনিই নিজেই হয়ে উঠেছেন একটি প্রতিষ্ঠান।

নিজভূমিতে ফিরে প্রিয়রঞ্জন জোর দিয়েছিলেন উত্তরবঙ্গ জুড়ে উন্নয়নমূলক কাজে, নিজের জেলার জন্য তো বটেই। এইসময় তাঁর ঘনিষ্ঠ ছায়াসঙ্গীদের কথায়, কোনও কাজ কাকে দিয়ে কী ভাবে করিয়ে নিতে হয় সেই দুর্লভ দক্ষতা ছিল প্রিয়দার। সেসময়ই বাংলায় শুরু হয়েছে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের বাম রাজত্বকাল। প্রিয়রঞ্জনের বাম বিরোধিতা নিয়ে কখনই প্রশ্ন উঠতে পারে না, কিন্তু সমবয়সী নতুন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সখ্যতার সম্পর্ক ছিল তাঁর। দুজনের সাহিত্য-সংস্কৃতিমনস্কতা এর একটা বড় কারণ হতে পারে, তবে প্রিয়দা বিশ্বাস করতেন উত্তরের উন্নয়নের জন্য কিছু করতে হলে নৈতিক বিরোধিতার ঊর্ধ্বে গিয়ে কাজটা করিয়ে নিতে হবে, এবং তা কখনই এক পক্ষের উদ্যোগে সম্ভব নয়। প্রথম ইউপিএ সরকারে স্বাভাবিক দোসর ছিল বামেরা, এছাড়াও ছোট বড় বাম নেতাদের তিনি যেমন দিল্লিতে নানা প্রয়োজনে সাহায্য করেছেন অকাতরে, তেমনই বুদ্ধদেবের কাছে দরবার করে তিনিও উত্তরবঙ্গের নানা প্রান্তে ছোটবড় নানা কাজ আদায় করে নিয়েছেন এমন উদাহরণ নেহাৎ কম নয়। প্রিয়দার এই সৌজন্যের রাজনীতিতে আজও বিশ্বাস রাখেন উত্তরবঙ্গে তাঁর অনুগামী বেশ কিছু কংগ্রেস বা কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে যাওয়া নেতা, উত্তর বাংলার রাজনীতিতে প্রিয়রঞ্জনের এই মৌলিক অবদান অস্বীকার করবার উপায় নেই।

প্রিয় দাসমুন্সীর উদ্যোগে উত্তরবাংলার উন্নতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তার তালিকা তাই বেশ দীর্ঘ, যার সবটা লিপিবদ্ধ করা দুঃসাহস এই স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়, অনেক পাঠকেরও এ নিয়ে মতভেদ বা আপত্তিও থাকতে পারে। তবু ভুলে গেলে চলবে না জলপাইগুড়ি দূরদর্শন কেন্দ্রের আপগ্রেডেশন ও তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পের জাতীয়করণে তাঁর সক্রিয় ভূমিকার কথা। প্রিয়রঞ্জনের উদ্যোগেই ফুলবাড়ির দূরদর্শন কেন্দ্র থেকে স্থানীয় অনুষ্ঠান সম্প্রচার শুরু হয়। সম্প্রতি কেন্দ্রের নতুন নোটিফিকেশনে উত্তরের সেই একমাত্র দূরদর্শন কেন্দ্রটি বন্ধ হয়ে গিয়েছে, অথচ তা নিয়ে কংগ্রেস বা তৃণমূল কংগ্রেস থেকে কোনও সোরগোল বা প্রতিবাদ নেই! আসলে প্রিয়রঞ্জন নেই, তাই দিল্লিতে উত্তরের আওয়াজ পৌঁছে দেওয়ার আজ কেউ নেই।

২০০৭ সালে ইউপিএ-১ সরকারের ঘোষিত ব্যাকওয়ার্ড রিজিওন গ্রান্ট ফান্ড প্রকল্পে দেশের ২৫০টি পিছিয়ে পড়া চিহ্নিত জেলা তালিকায় বাংলার যে এগারোটি জেলার নাম ছিল তার মধ্যে উত্তর বাংলার চারটি জেলার নাম (মালদা, জলপাইগুড়ি, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর) জুড়ে যাওয়ার পেছনে প্রিয়রঞ্জনের অবদান আদৌ ছিল কি? এ নিয়ে উত্তর বাংলার কোথায় কতবার আলোচনা বা গবেষণা হয়েছে আমার জানা নেই। তেমনই ২০০5 সালের ঘোষিত রাজীব গান্ধী গ্রামীণ বিদ্যুতিকরণ প্রকল্পে দেশের সওয়া লাখ গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছনর তালিকায় উত্তরবঙ্গের মালদা, কোচবিহার, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা ও শিলিগুড়ি মহকুমার হাজার কয়েক গ্রামের নাম অন্তর্ভুক্তি করানোর পেছনে প্রিয়রঞ্জনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকা কতটা ছিল সে নিয়ে কংগ্রেস মহল থেকেই কোনও সঠিক তথ্য মিলবে কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কিন্তু কে মনে রাখল বা রাখল না সেসবের পরোয়া বোধহয় বিশেষ করতেন না প্রিয়রঞ্জন। তাই গণিখানের পরবর্তী সময়ে দুই দিনাজপুরের রেল যোগাযোগ উন্নয়নে বিশেষ মনযোগী হয়েছিলেন তিনি। বারসোই থেকে রাধিকাপুর মিটারগেজ থেকে ব্রডগেজে রূপান্তর ও কলকাতা থেকে রাধিকাপুর এক্সপ্রেস ট্রেন চালু করে রায়গঞ্জকে ভারতীয় রেল ম্যাপে নিয়ে আসা এবং ডালখোলায় রেক পয়েন্ট চালু করতে সফল হয়েছিলেন, ডালখোলা থেকে রায়গঞ্জ-ইটাহার নতুন রেললাইনের প্রচেষ্টাও অব্যাহত ছিল। বাংলাদেশের

সঙ্গে পণ্য আমদানি রফতানির উদ্দেশ্যে কালিয়াগঞ্জে রাধিকাপুর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপনের কৃতিত্ব তাঁর নামেই যায়।

উত্তরের বেশিরভাগ মানুষ বলে থাকেন, কেন্দ্রের অনুমোদন আদায় করে নিয়ে এলেও বাম সরকারের অসহযোগিতার ফলেই রায়গঞ্জে এইমস বাস্তবায়িত করে যেতে পারেন নি প্রিয়দা। উত্তরের প্রবীণ কংগ্রেস নেতারা অনেকেই অবশ্য বলেন, রায়গঞ্জে এইমস স্থাপনের অনেকগুলি পরিকাঠামোগত সমস্যা ছিল, অনেকেই তাঁকে পরামর্শও দিয়েছিলেন, উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ক্যাম্পাস ও তার আশপাশে প্রচুর সরকারি জমি ছিল তাই সেটিকেই স্বল্প সময়ে এইমস-এ উন্নীত করা যেতে পারত। বাকি দেশের সঙ্গে শিলিগুড়ির যোগাযোগ ব্যবস্থাও সেক্ষেত্রে অনেক সহজ ছিল। কিন্তু প্রিয়রঞ্জন সম্ভবত তাঁর রায়গঞ্জের মানুষের সেন্টিমেন্ট নিয়ে খেলতে চান নি। নানা কারণে রায়গঞ্জের এইমস বাস্তবায়িত হয় নি, পরবর্তীকালে তাঁর অনুপস্থিতিতে তৃণমূল সরকার সে কফিনে পেরেক পুঁতে দিয়েছিল। উত্তরের প্রতি বঞ্চনা-অবহেলার আরেক উজ্জ্বল উদাহরণ হলেও জমির প্রশ্নে তা পুরোপুরি অযৌক্তিক ছিল তাও বলা যায় না। কিন্তু আজ করোনা বিধ্বস্ত উত্তর বাংলায় সরকারি স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর করুণতম চিত্র দেখলে একটাই কথা মনে হয়, সেসময় সমগ্র উত্তরের কথা ভেবে প্রিয়রঞ্জন তাঁর সিদ্ধান্তে সামান্য পরিবর্তন করলেই, আমরা হয়ত এতদিনে এইমস পেয়ে যেতাম আমাদের নাগালের মধ্যে। আর মালদার গণিখান চৌধুরীর চাইতেও বহুগুণে বড় আকারে, উত্তরের কিংবদন্তী হয়ে যেতে পারতেন রায়গঞ্জের প্রিয় দাসমুন্সী।

নিজভূমিতে ফিরে প্রিয়রঞ্জন জোর দিয়েছিলেন উত্তরবঙ্গ জুড়ে উন্নয়নমূলক কাজে, নিজের জেলার জন্য তো বটেই। এইসময় তাঁর ঘনিষ্ঠ ছায়াসঙ্গীদের কথায়, কোনও কাজ কাকে দিয়ে কী ভাবে করিয়ে নিতে হয় সেই দুর্লভ দক্ষতা ছিল প্রিয়দার। সেসময়ই বাংলায় শুরু হয়েছে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের বাম রাজত্বকাল।

কিন্তু সব তো আর হিসেব মেপে হয় না। তিনি রায়গঞ্জে ফিরে আসার সমসাময়িক কালে বাংলা কংগ্রেসে বহু প্রতীক্ষিত অঘটনটি ঘটল। আনুষ্ঠানিক বিভাজনে কংগ্রেস ভেঙ্গে একটা বিশাল অংশ তৃণমূল কংগ্রেসে চলে যাওয়ায় মূল দলটি যথেষ্ট দুর্বল হয়ে পড়ল, যেখানে প্রিয়রঞ্জনের ভূমিকা আদৌ ছিল কিনা সন্দেহ। কারণ আপাতদৃষ্টিতে এভাবে দল ভাঙ্গা অন্তত যে তাঁর কাম্য ছিল না, সে কথা পরবর্তীকালে বার বার প্রমাণিত হয়েছে। এর আগে উনআশিতে ইন্দিরাজির নেতৃত্বকে অস্বীকার করে দল ছাড়ার পর সঙ্গীরা যেমন কেউ তাঁর সঙ্গে বিশেষ যোগাযোগ রাখত না, তেমনই এবারও দীর্ঘ তিরিশ বছরের পুরনো অনুগামী সঙ্গীসাথীদের তাঁকে ছেড়ে চলে যাওয়া তাঁর আবেগী হৃদয়ে কতটা রক্তক্ষরণ ঘটিয়েছিল তার হিসেব কেউ রাখে নি। তবু তিনি বাংলায় কমিউনিস্ট শাসনের অবসান ঘটাতে তার পরবর্তী দশ বছর ধরে জ্ঞান হারাবার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত চেয়েছিলেন একজোট হয়ে লড়াই। তাই বোধ হয় উত্তরের মূল কংগ্রেসি মানুষজন আজও মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন, তাঁদের প্রিয়রঞ্জন সজ্ঞানে বেঁচে থাকলে বাংলার রাজনৈতিক ছবি কী হত জানা নেই, তবে অবহেলিত উত্তর বাংলার হাল আমূল বদলে যেতে পারত সেটা নিশ্চিত।

২০০৮ সালে কংগ্রেসের অতি সংকটকালে তিনি হঠাৎ নীরব নিথর হয়ে গেলেন, তারপর দীর্ঘ নয় বছর ক্লিনিকালি জীবিত থাকলেও বামেদের বদলে মমতাকে সঙ্গী করে ২০০৯ সালে দ্বিতীয়বার ইউপিএ সরকার গঠন তাঁর দেখা হয় নি, ২০১১ সালে নিজের রাজ্যে দীর্ঘকাঙ্খিত বাম শাসনের সমাপ্তি ঘটার সুখ তিনি উপভোগ করতে পারেন নি। তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর অভাব অনুভব করেছে উত্তর বাংলার ক্ষয়িষ্ণু কংগ্রেস, জাতীয় কংগ্রেস রাজ্যে ও দেশে ক্রমশ শীর্ণ থেকে শীর্ণতর হয়েছে, মমতা বাহিনীর আগ্রাসী রাজনীতিতে তাঁর নিজের জেলায় তো বটেই গোটা উত্তরবঙ্গের কংগ্রেস ঘাঁটিগুলিতে আগাপাশতলা তৃণমূলায়ন

ঘটেছে, ফলে বিরোধিতার শূন্যস্থান পূরণ করতে অভাবনীয়ভাবে উঠে এসেছে বিজেপি।

অবশেষে ২০১৭-র নভেম্বরে তাঁর নশ্বর মরদেহ যখন আকাশপথে এসে পৌঁছুল তাঁর নিজের সাধের রায়গঞ্জে, যাবতীয় ব্যারিকেড ভেঙ্গে দলমত নির্বিশেষে হাজারে হাজারে সাধারণ মানুষ ছুটে গিয়েছে তাদের প্রিয়দা-কে চোখের জলে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে। অর্ধ শতাব্দীর রাজনৈতিক পথ পেরিয়ে রায়গঞ্জ শ্মশানে যখন বেজে উঠেছিল বিদায়ের শেষ বিউগল, তখন সবার অগোচরে উত্তর বাংলার বুকের মাঝে অবিনশ্বর হয়ে গিয়েছে প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী নামটি। সুদূর উত্তরবঙ্গের বলেই হয়ত এমন একটি তুখোর সর্বভারতীয় রাজনৈতিক চরিত্র নিয়ে কেউ কোনওদিন কোনও বায়োপিক করার কথা ভাববে না। এই আশ্চর্য নেতার জীবন নিয়ে কোনও সিরিজ করবার কথা ভাববে না ওটিটি-র কোনও তরুণ চিত্রনির্মাতা!

তরুণ কর্মী বা নেতৃত্বের অভাব হলে যে কোনও দল যে মজে যাওয়া নদীর মত হয়ে যায় এ সময়ের কংগ্রেস বা বামদলগুলির চেয়ে বড় উদাহরণ আর নেই। একদা প্রিয়পন্থী বা প্রিয়বিরোধী পুরনো কংগ্রেস নেতারা আজ যে যেখানে জীবিত ও সুস্থ আছেন, সবাই একবাক্যে স্বীকার করেন, কংগ্রেসের মত সভাপতি-কেন্দ্রিক একটি দলে তারুণ্যের প্লাবন ডেকে এনেছিলেন উত্তরবাংলা থেকে উঠে আসা এই হ্রস্বদেহী মানুষটি। যার ঢেউ সেসময় পৌঁছেছিল দেশের দক্ষিণ প্রান্তের কেরালা অবধি। সাহিত্য অনুরাগী হয়েও কর্মসূচীভিত্তিক গণ আন্দোলন গড়ে তুলতে প্রিয়রঞ্জনের মত বিজ্ঞানমনস্কতা ও সৃজনশীল প্রতিভা সমগ্র ভারতেই তাঁর পরে আর দ্বিতীয়টি হয়েছে কি না সন্দেহ আছে।

অন্তিম শয়নে যাওয়ার মাস কয়েক আগে, ২০০৮ সালের পয়লা মে পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচারে জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারে এসেছিলেন প্রিয়রঞ্জন। দলের ছাত্রযুব কর্মীদের সভায় তিনি একটাই বার্তা দিয়েছিলেন, বামেদের হটাবার এর চাইতে ভাল সময় আর আসবে না। আর যত মতভেদই থাকুক না কেন, এসময় তৃণমুলের সঙ্গে একজোট হয়ে না লড়লে কখনই তা সম্ভব নয়। ছাত্র পরিষদেই উত্তরবাংলা থেকে প্রিয়রঞ্জনের মত মহীরুহ নেতৃত্বের সূচনা হয়েছিল, উত্তরের ছাত্রযুব-র চিরকালীন আইডল ছিলেন তিনি। তাই পরবর্তীকালে দেখেছি উত্তর বাংলা থেকে ছাত্র পরিষদের রাজ্য নেতৃত্ব দিতে উঠে এসেছেন কোচবিহারের জয়ন্ত ভট্টাচার্য ও রাহুল কুমার রায়, আলিপুরদুয়ারের সৌরভ চক্রবর্তী। এরা সবাই যে তাঁর অনুগামী ছিলেন তা নয়, কিন্তু সবার অজান্তেই এঁদের সবার প্রেরণা ছিলেন প্রিয়রঞ্জন। উল্লেখ করবার মত নয় তবু সবশেষে একটা অমূলক সমাপতনের কথা বলতে ইচ্ছে হয়, আজ কংগ্রেসের এই চরমতম

২০০৮ সালে কংগ্রেসের অতি সংকটকালে তিনি হঠাৎ নীরব নিথর হয়ে গেলেন, তারপর দীর্ঘ নয় বছর ক্লিনিকালি জীবিত থাকলেও বামেদের বদলে মমতাকে সঙ্গী করে ২০০৯ সালে দ্বিতীয়বার ইউপিএ সরকার গঠন তাঁর দেখা হয় নি, ২০১১ সালে নিজের রাজ্যে দীর্ঘকাঙ্খিত বাম শাসনের সমাপ্তি ঘটার সুখ তিনি উপভোগ করতে পারেন নি। তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর অভাব অনুভব করেছে উত্তর বাংলার ক্ষয়িষ্ণু কংগ্রেস, জাতীয় কংগ্রেস রাজ্যে ও দেশে ক্রমশ শীর্ণ থেকে শীর্ণতর হয়েছে,

দুর্দিনেও ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতি সৌরভ প্রসাদ ঘটনাচক্রে সেই সাবেক পশ্চিম দিনাজপুরেরই ছেলে। প্রান্তিক উত্তরের সন্তান হিসেবে, একদা ছাত্র পরিষদের সামান্য কর্মী হিসেবে গলার শিরা ফুলিয়ে কেন জানি তাই বলতে সাধ জাগে, পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে ইতিহাস তার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে প্রমাণ করে দিচ্ছে উত্তরবাংলায় এখনও চলছে প্রিয়রঞ্জন কাল।

(নিবন্ধটি শারদীয় 'কণ্ঠস্বর' পত্রিকায় প্রকাশিত এবং সম্পাদকীয় অনুমতিতে পুনর্মুদ্রিত)

রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ বাণী:
নতুন বছর কেমন যাবে
(১লা জানুয়ারি - ৩১শে মার্চ)

কলম সিং

কলিকাগ্রাম কক্ষে সমিতির পক্ষ হইতে আমাকে অনুরোধ করা হইয়াছে যে বৈকুণ্ঠপুর, কোচরাজ্য, আলিগড়— এই তিন রাজ্যে কোন দল কী অবস্থায় অবস্থান করিতেছে, সে বিষয়ে একটি ভবিষ্যৎবাণীমূলক পর্যালোচনা যেন সদস্যদিগের জন্য রচনা করিয়া দিই। করোনাকালে আমি মহাপন্ডিত চাণক্য (২য়) রচিত ‘সমষ্টিভাগ্যানুমানবিদ্যা’ মন দিয়া অধ্যয়ন করিয়াছি। ইহার পাশাপাশি উক্ত রাজ্যের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বিষয়ে বিদগ্ধ সাংবাদিকদের গল্প-প্রবন্ধ নিয়মিত পড়িয়া থাকি। সুতরাং এইরূপ পর্যালোচনা লিখিবার জন্য আমাকে বিশেষ শ্রম করিতে হয় নাই। যাহা হউক, ২০২১ সালের গোড়াতেই পৃথিবীর নিকটবর্তী ব্ল্যাকহোলগুলির বিচিত্র প্রভাবে ভাগ্যফলে বিস্তর উত্থানপতন লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান বৎসরের একাদশ মাস হইতে কালপুরুষের উপর হইতে নেবুলার ছায়া সরিয়া যাইতেছে বলিয়া ‘অবস্থানসঙ্কটযোগ’ ক্রিয়াশীল হইতেছে। ইহার প্রভাবে কোন নেতা কখন কোন দলে থাকিবেন, তাহা স্পষ্ট বুঝা না-ও যাইতে পারে। আপাততঃ নতুন বৎসরের প্রথম তিন মাসের ভবিষ্যৎবাণী লিখিতেছি।

ছোটফুলভ্রাতৃসঙ্ঘ: কোচরাজ্যে এই দলের ছোটসূর্য যে প্রতিবাদ সূচিত করিয়াছে তাহার ফলে উহাদের একখানি অতিরিক্ত আসন ক্ষয় পাইবার সম্ভাবনা। ছোটসূর্য ফুলান্তর করিবেন কি না, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য এখনই উপযুক্ত সময় নয়। লক্ষ্মীপূর্ণিমার পর হইতে ছোটফুলভ্রাতৃসঙ্ঘের কোষ্ঠিতে যে অশুভ প্রভাব

দৃষ্ট হইতেছে তাহার জন্য দায়ি রাহুর সঙ্কটকৌণিক দশা। এই দশায় একাধিক দলত্যাগের সম্ভাবনা থাকে বটে, পাশাপাশি গোষ্ঠিদ্বন্দ্ব চরম হইবারও প্রবল সম্ভাবনা।

অপর দিকে, পৌষ মাসের প্রথম শুক্লপক্ষে ভ্রাতৃসঙ্ঘের কোষ্ঠিতে একটি শুভযোগ দৃষ্ট হইতেছে। ইহার ফলে দলের সেনানিগণ প্রতিকূল দশা কিঞ্চিৎ কাটাইয়া উঠিতে পারিবে বলিয়া মনে করা যায়। নতুন বৎসরে কোচরাজ্যে প্রবল ঘাত-প্রতিঘাত-সংঘাতের যোগ বর্তমান। ফলে দলের কোনও কোনও কর্মিকে অ্যাম্বুলেন্সে উঠিতে হইতে পারে। বৃহস্পতির বক্রী দৃষ্টিহেতু প্রতিশোধ লইতে যাইবার সময় সতর্ক থাকা আবশ্যক।

আলিনগরে শনি-কেতুর যুগ্ম তির্যকদৃষ্টি যে অনেক আগেই লাগিয়াছে তাহা সঙ্ঘের নেতা সুগন্ধীবাবু জানেন। শীতের মাঝামাঝি তাঁহার আচরণে সঙ্ঘ বিস্মিত হইতে পারে। দ্রাঘিমা পার্থক্যের কারণে গ্রহ-ব্ল্যাকহোলাদিজাত শুভকারক শর্তসমূহ পুরাটাই

কোচসীমান্তে আসিয়া লুপ্ত হইয়াছে বলিয়া উক্তরাজ্যে সঙ্ঘ লড়াই করিতে সক্ষম হইলেও আলিগড়ে সুগন্ধবাবুর শুভকারক গ্রহাদি গত এক বৎসর ধরিয়া গ্রহণছায়ায় ঢাকা। আলিনগরের ছোটফুল সঙ্ঘের অনেকেই ভাবিতেছে যে তাঁহাদের বড়ফুল সান্নিধ্যের কথা কেহ জানে না এবং তাঁহারা সকলেই কহিতেছে 'যে যাউক, আমি যাইব না।' এই অবস্থায় চাণক্য (২য়) উপদেশ দিয়াছেন 'এইস্থলে ঠিক বুঝার সম্ভাবনা কম/ কারণ উভয়ই বলে বন্দেমাতরম'।

বৈকুণ্ঠপুষ্ঠপুরে যেহেতু সঙ্ঘের ত্র্যহস্পর্শযোগ চলিতেছে তাই সেইস্থানে দলের ত্রিমুখী সঙ্কট দৃষ্ট হয়। সম্মোহনবাবুর ক্ষমতা গিয়াছে। শনির বলয়ের সপ্তমে প্লুটো আসিয়া বসিবার ফলে দলে 'ওল্ড ইজ গোল্ড নিউ আর সোল্ড' নীতি পোক্ত হইয়াছে। ইহার প্রথম বলি সম্মোহনবাবু। তাঁহার অনুগামীগণ বুঝিয়াছে যে এই দশায় তিনি আর ফিরিবেন না। বসন্তের পূর্বেই তাঁদের কেহ কেহ পাল্টি খাইবেন বলিয়া স্থির করিলেও দক্ষিণবঙ্গের শুভচন্দ্রবাবুর আচরণে কিঞ্চিৎ বিভ্রান্ত হইয়া পার্টি আপিসে যাইতেছেন। সঙ্ঘপতি রাধামাধববাবুর ক্ষেত্রে অনেক বিচার করিয়া একটি আশ্চর্য যোগ পাইয়াছি। ইহার নাম 'পীকরবযোগ'। ইহাতে কোকিল, পিক, পিকে ইত্যাদি বেশি ভাল লাগে। চন্দ্র অনুকূলে থাকায় বৈকুণ্ঠপুরে তিনি ভালই লড়িবেন বলিয়া মনে হইতেছে। বৎসরের গোড়ার দিকে দুই-একজন টেনশন রাখিতে না পারিয়া রামমন্দিরে ইস্টক লইয়া যাইতে পারেন।

বড়ফুলভক্তসঙ্ঘ: কোচরাজ্যে সঙ্ঘের বৃহস্পতির দশা চলিতেছে। আগামি বৎসরের গোড়া পর্যন্ত উহা সক্রিয় থাকিবে। তাই বর্তমান সময় তাঁহাদের পক্ষে অতি গুরুত্বপূর্ণ। ইহার পর অকস্মাৎ বুধের গ্রহণ শুরু হইবে। ফলতঃ তখন সামান্য ভুলের জন্য বড় সংখ্যক ভোটার হারাবার আশঙ্কা। গোটা শীতকাল জুড়িয়া কোচরাজ্যে বড়ফুলভক্তসঙ্ঘের মহাসভাপতির শকটের কাচ ভাঙিবার যোগ বিদ্যমান। অন্যান্য শুভ দৃষ্ট হইলেও প্রচারকদের উপর সম্পূর্ণ ভরসা করিবার ফল ভাল না-ও হইতে পারে। শত্রু দ্বারা গুপ্তগোষ্ঠিদ্বন্দ্ব টের না পাইলে আসনহানীর যোগ প্রবল। রাজ্যে সঙ্ঘীদের উৎসাহ-উদ্দীপনার অভাব না থাকিলেও সমস্ত উদ্দীপনা ইভিএম অবধি যাইব কি না তাহা বিচার করা কর্তব্য। মঙ্গল নিচস্থহেতু অল্পের জন্য গোল ফস্কাইয়া অনুতাপ।

আলিনগরে সঙ্ঘের বৃহস্পতি-মঙ্গল-বুধ একত্রে উচ্চ হওয়ার কারণে বৎসরের প্রথম দুই মাস তাঁহারা স্বস্তিতে থাকিতে পারিবেন। ইহার পর তাঁহাদের রাশিচক্রে কিছু জটিলতা দেখা দিলেও বিপক্ষের বুদ্ধিহীনতার কারণে ক্ষতি সামলাইয়া উঠিতে পারিবেন বলিয়া বিশ্বাস। চা-বলয়ে বামপন্থীরা যেইরূপ বুঝাইত, সেবাইতরাও সেইরূপ বুঝায় বলিয়া বামসঙ্ঘ হইতে আগত ভোটধারা এখনই বন্ধ হইবার কারণ নাই। কোচরাজ্য এবং বৈকুণ্ঠপুরের তুলনায় তাঁহারা আলিনগরে সুখে আছেন। কিন্তু রাশিচক্রে মহাদিদির দুষ্টপ্রভাব দূর হইয়াছে তাহা ভাবিলে হতাশা ও মনস্তাপ।

বৈকুণ্ঠপুরে সর্বত্র ইউরেনাসের প্রভাব সমান নয় বলিয়া এইস্থানে সঙ্ঘের মিশ্র উপস্থিতি দৃষ্ট হয়। রাহু-কেতুর যৌথ ত্রিভঙ্গদৃষ্টির কারণে দলের গোষ্ঠিদ্বন্দ্ব জার্সি গাই-এর চেহারা নিতে পারে। গোঁসাইজি এবং মানিকজি— উভয়ের বুধ ব্রহ্মার দুই পরস্পর বিপরীতপাদে অবস্থান করিতেছে বলিয়া বসন্তের আগে বিরোধ মিটিবার সম্ভাবনা ক্ষীণ। ফলে বৈকুণ্ঠপুরের দুইটি স্থান বাদ দিয়া অন্যত্র দলের লেখচিত্রে ঘন ঘন উত্থান-পতনের যোগ দৃষ্ট হয়। ইহার ফলে 'বিপরীত দলবদল' অর্থাৎ দলে আসিয়া পুনরায় ভাগিয়া যাইবার মত দৃষ্টান্তে কর্মিরা কনফিউজড হইতেছেন। উপযুক্ত প্রার্থীর অভাবে পাওয়া আসন হারাইতে হইতে পারে।

হস্তহাতুড়িবেচারাসঙ্ঘ: উক্ত তিন রাজ্যে যতগুলি আসন রহিয়াছে তাহার মধ্যে কেবলমাত্র একখানি আসনে হস্তহাতুড়িসঙ্ঘের জিতিবার সম্ভাবনা। উহা সদর বৈকুণ্ঠপুর। বাকি আসনে যদি দশ শতাংশ ভোট পাইতে পারে তাহলে ছোটফুলভ্রাতৃসঙ্ঘের উন্নতি। কিন্তু দুই বৎসর পূর্বে উল্কার খোঁচায় হাতুড়ি পরিবারের বৃহস্পতি সে-ই যে ছিদ্রান্বিত হইয়াছিল তাহার প্রভাব দূর হইবার সম্ভাবনা ক্ষীণ। শনি-ইউরেনাস-প্লুটো মিলিয়া উহাদের রাশিচক্রে যেই ত্রিকোণ নির্মাণ করিয়াছে তাহা ক্ষেত্র বিশেষে প্রবল মনোকষ্টের কারণ হইলে অবাক হইবার কিছু নাই। নতুন বৎসরের

গোড়ায় অবশ্য বুধ গ্রহণমুক্ত হইবে, সেক্ষেত্রে ভালমন্দ মিশ্র ফল দৃষ্ট হয়। বসন্তের গোড়ায় রাহু বক্রীভাব গ্রহণ করিলে জোটভঙ্গ দশার যোগ।

এইবার রাশিবিশেষে নেতাদের ভাগ্যফল দিতেছি। ফলাফল নেতার গুরুত্ব বিশেষে পরিবর্তিত হইতে পারে।

মেষ: প্রিয়জনের দলত্যাগে দুঃখ পেলেও সে পথ অনুসরণের সম্ভাবনা দেখা যায়। তেমন সম্ভাবনা দেখা দিলে প্রত্যহ ১০৮ বার ব্রহ্মজপে ভাল ফল পাবেন। বাইরে নিরামিষ খাবেন এবং অন্যের দেওয়া স্যানিটাইজার মাখবেন না।

বৃষ: নতুন দলে পুরনো বন্ধুদের সাথে দেখা হতে পারে। পাব্লিককে অত্যধিক কৈফিয়ৎ দেওয়ার কারণে স্বরভঙ্গযোগ। প্রতিকারে মধু ফুটিয়ে দু-ফোঁটা গোমূত্র (বিকল্পে তৃণরস) মিশিয়ে খেলে তৎক্ষণাৎ ফললাভ।

মিথুন: আপনি লুকিয়ে লুকিয়ে যা করছেন দল তা জানে। চটজলদি সিদ্ধান্ত নিলে পাওনা অর্থ অন্য কেউ তুলে নেবে। অঘ্রাণের পর বহুদিনের প্রত্যাশা পূরণ হতে পারে। মিডিয়ায় দেওয়া বক্তব্য বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করবেন। ভুল ব্যাখ্যায় পদ হারানোর সম্ভাবনা।

কর্কট: গোপনে নতুন দলের উচ্চ নেতাদের সাথে কথাবার্তায় অগ্রগতিহেতু মানসিক বল বৃদ্ধি। পৌষমাসে অসতর্কতার কারণে সর্বনাশ যোগ। নিজের দলের নেতাদের সাথে বৈঠক এড়িয়ে চলাই সমীচীন।

সিংহ: মিছিল-মিটিঙের শেষে পিঠে ও কোমরে বেদনা। গঙ্গাজল লেজার পিউরিফায়ারে শুদ্ধ করে পান করে শান্তি লাভ। দলের প্রতি আনুগত্যের ফলের জন্য মাঘ পর্যন্ত অপেক্ষ করতে হতে পারে। বিরোধ কোনও নেত্রীর প্রেমে পড়া থেকে সাবধান। প্রতিকারে ধবলা কবচ পরিধান করুন।

কন্যা: গরু নিয়ে কোনও আলোচনা থেকে অশান্তি ও সাময়িক কারবাস। শেষ মুহূর্তে দলবদল লাভজনক মনে না-ও হতে পারে। পৌষের মাঝামাঝি দায়-দায়িত্ব বৃদ্ধি পেলেও পকেট থেকে খরচা হবে। আপাততঃ নিজের দলে মৌনব্রত অবলম্বন করাই শ্রেয়। মুক্তাভস্ম পানে শান্তিলাভ।

তুলা: অকস্মাৎ দেশদ্রোহী তকমায় ভূষিত হয়ে মনোকষ্ট। ফাল্গুনে দলত্যাগের বাসনা প্রবল হয়ে উঠবে। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে লাভক্ষতি বিবেচনা না করলে সমূহ অশান্তি। দুষ্টলোকের প্ররোচনায় নির্দল হয়ে ভোটে দাঁড়াবার ইচ্ছে হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। শান্ত থাকতে নিয়মিত প্ল্যানচেটে বসুন।

বৃশ্চিক: একাধিক অফার থাকায় কোন দলে যাবেন তা নিয়ে সিদ্ধান্তে বিলম্ব। তবে সময়টা সব দিক থেকেই আপনার পক্ষে ভাল বলে মনে হয়। করোনা থেকে সেরে উঠেছেন এমন কোনও নেতার সাহচর্যে উন্নতি। দলবদলের সিদ্ধান্ত বুধবারে নিলে অতিরিক্ত ফললাভ। শনিপূজা কর্তব্য।

ধনু: বিপক্ষের সমর্থকদের ঢিলে রক্তপাত ও আঘাতের সম্ভাবনা। উচ্চ কোনও নেতার প্রশংসায় শান্তিলাভ। মিডিয়াতে আপনার বক্তব্য বিকৃত হতে পারে। সে ক্ষেত্রে দল আপনাকেই বিশ্বাস করবে। উচ্চস্থানে এবং নদীর ধারে দলীয় পতাকা টাঙাবার সময় সাবধানতা আবশ্যক। পূবদিকে ঘুমোবেন না।

মকর: ভোটারদের মন বোঝার ক্ষেত্রে কষ্টার্জিত সাফল্যে অন্য কেউ ভাগ বসাতে পারে। পৌষের তৃতীয় সপ্তাহের পর বুথ দখল নিয়ে আলোচনা ফলপ্রসু। বিধায়ক পদপ্রার্থীর সাথে লেনদেন আগে থেকেই চূড়ান্ত না করলে আশাহত হতে হবে। কলকাতার কোনও নেতার অবহেলায় মানসিক দুঃখ। ছয় রতি প্লুটোনিয়াম ধারণে অব্যর্থ ফল।

কুম্ভ: নতুন দলে সাময়িক অস্বস্তি ও উপেক্ষা মুখ বুঁজে সহ্য করলে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা। মাঘের শুরুতে আপনি যা চাইছেন তা পেতে থাকবেন। পুরনো দলের বন্ধুদের হাতে অপমানিত হওয়ার আশঙ্কা। প্রতিকারে রক্তপ্রবাল দু-দিন সোমরসে চুবিয়ে পরবেন। শীতের শেষে মনের উৎফুল্লতা ফিরে আসবে।

মীন: আবেগের বশে নিজের দলে থেকে শহীদ হওয়ার প্রবণতা থেকে আখেরে ক্ষতি। ভোটের প্রচারে পকেটের টাকা খরচ করা থেকে সাবধান। চেষ্টা করুন দুই পক্ষকে নিয়ে মানিয়ে চলতে। উচ্চ নেতার মিষ্ট বাক্যে সন্তুষ্ট না হয়ে তাঁকে বিভ্রান্ত করুন। বিভিন্ন কমিটি থেকে বাদ যাওয়ার কারণে হতাশা। প্রতিকারে দন্ডকলসের ফুল মানিব্যাগে রাখুন।

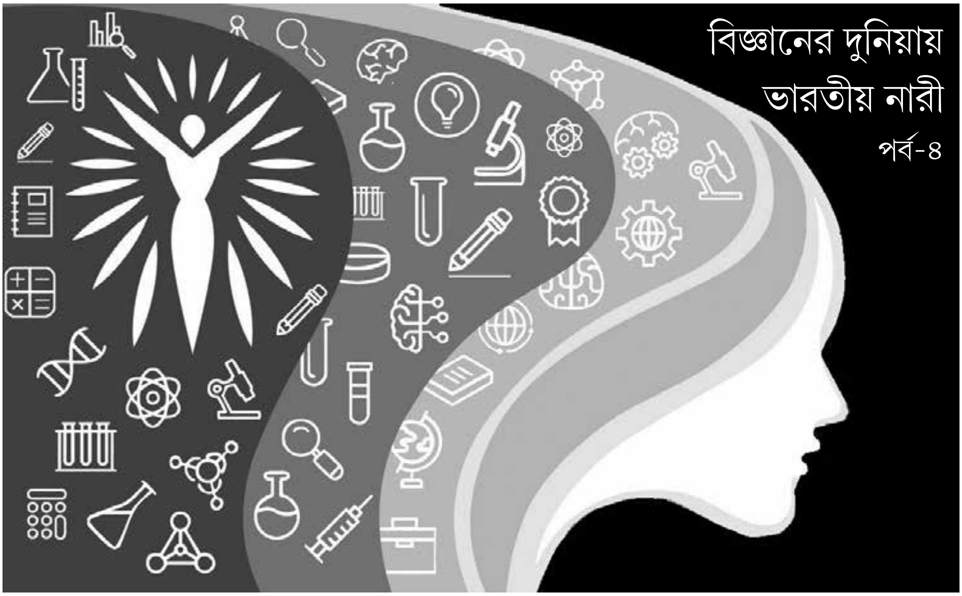

বিভা চৌধুরী: বিজ্ঞানের আকাশে এক বিস্মৃত উজ্জ্বল নক্ষত্র

রাখি পুরকায়স্থ

দূরবীনে চোখ রেখে রাতের আকাশ দেখতে-দেখতে হঠাৎ করেই একটি হলদে-সাদা নক্ষত্রের সন্ধান মিলতে পারে। স্যাক্সট্যানস নক্ষত্র মণ্ডলে অবস্থিত এই নক্ষত্রটি সূর্যের চাইতেও উত্তপ্ত, বড়, উজ্জ্বল এবং পুরনো। পৃথিবী থেকে ৩৪০ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত এই নক্ষত্রটির আলফানিউমেরিক নাম 'HD86081'। বিজ্ঞান বিশ্বের এক অপরিকীর্তিত ভারতীয় পদার্থবিজ্ঞানী ডঃ বিভা চৌধুরীর অসামান্য অবদানকে সম্মান জানাতে প্যারিসের ইন্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিয়ন ২০১৯ সালের ১৭ ডিসেম্বর এই নক্ষত্রটির নামকরণ করেছে 'বিভা'।

বিজ্ঞানের ইতিহাস ঘাঁটলেই একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায়, বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে প্রভূত পরিমাণ অবদান থাকা সত্ত্বেও, বিজ্ঞানের জগতে নারীদের অনায়াস বিচরণকে কখনওই সুনজরে দেখা হয় নি। লিঙ্গভিত্তিক অন্ধসংস্কারকে প্রাধান্য দিয়ে নারীদের বিজ্ঞান চর্চা করতে আবহমান কাল ধরে নিরুৎসাহিত করেছে আমাদের সমাজ। তবে সমাজের গভীরে প্রোথিত লিঙ্গপক্ষপাত দুষ্ট বাধানিষেধকে পরাভূত করে নারীরা সর্বদাই সমাজ নির্মিত লিঙ্গ-প্রাচীরকে লঙ্ঘন করেছেন, আপন দক্ষতায় এবং অসীম সাহসে। অধীত জ্ঞান সমাজের উন্নতিকল্পে প্রয়োগের উদ্দেশ্যে নিজেদের জন্যে সৃষ্টি করেছেন একান্ত নিজস্ব পরিসর।

আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজ অবশ্য এতে মোটেই দমে যায় নি। নারীদের মেধা এবং অবদানকে ইচ্ছাকৃতভাবে বই, গণমাধ্যম এবং দৈনন্দিন মানবজীবন থেকে মুছে দেওয়ার প্রক্রিয়া সচল রয়েছে। বহুকাল ধরে নারী বিজ্ঞানীদের কৃতিত্বগুলিকে অস্বীকার করে চলেছে আমাদের সমাজ। আর ঠিক সে-কারণেই ডঃ বিভা

বিভা চৌধুরী

বিভা চৌধুরী বেথুন স্কুল থেকে বিদ্যালয় শিক্ষা শেষ করেন। তারপর তিনি কলকাতার রাজাবাজার সায়েন্স কলেজ থেকে পদার্থবিদ্যায় সাম্মানিক সহ বিজ্ঞানে স্নাতক হন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩৬ সালে পদার্থবিদ্যায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের ১৯৩৪-৩৬ বর্ষের এম.এসসি ক্লাসের একমাত্র মহিলা পড়ুয়া ছিলেন তিনি!

চৌধুরীর মত একজন অনন্য বাঙালি বিজ্ঞানীর নামটা আজ আমাদের কাছে এত অচেনা!

ভারতে কণা পদার্থবিজ্ঞান এবং মহাজাগতিক রশ্মি সম্বন্ধীয় গবেষণার ইতিহাসে হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা, বিক্রম সারাভাই, এম.জি.কে.মেননের মত প্রথিতযশা বিজ্ঞানীদের নাম ও কর্মকাণ্ডের বিবরণ স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে। তবে দুঃখের বিষয়, ভারতের প্রথম নারী কণা পদার্থবিজ্ঞানী ডঃ বিভা চৌধুরির নিরলস গবেষণা এবং অপরিমেয় অবদান সম্পর্কে খুব কম মানুষই অবগত আছেন। অথচ বিভা চৌধুরী এমন একজন পদার্থবিদ, যিনি বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিদ্যায় ডক্টরেট প্রাপ্ত প্রথম ভারতীয় মহিলা। বিজ্ঞানী জীবনের শুরুতে দেবেন্দ্রমোহন বোসের নির্দেশনায় বসু বিজ্ঞান মন্দিরে, এবং পরবর্তীকালে হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা, বিক্রম সারাভাই, এম.জি.কে.মেননের মত প্রখ্যাত বিজ্ঞানীদের সাথে মুম্বাইয়ের টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ (টিআইএফআর) এবং আহমেদাবাদের ফিজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরিতে (পিআরএল) কণা পদার্থবিজ্ঞান এবং মহাজাগতিক রশ্মির ওপর ব্যতিক্রমী গবেষণা করেছিলেন তিনি। তাঁর সেই গবেষণা ভারতের বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে এক অন্যতম অগ্রণী কীর্তি বলে গণ্য করা হয়। এছাড়াও তিনি গবেষণায় সহায়তা করেছিলেন নোবেল জয়ী পদার্থবিজ্ঞানী প্যাট্রিক ব্ল্যাকেটকে, যিনি স্বাধীনতা উত্তর ভারতে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর উপদেষ্টা ছিলেন। দুর্ভাগ্যের কথা, কণা পদার্থবিজ্ঞান ও মহা জাগতিক রশ্মি সম্পর্কিত গবেষণায় অসামান্য অবদান রাখা সত্ত্বেও ডঃ বিভা চৌধুরি কার্যত খ্যাতির আড়ালেই রয়ে গিয়েছেন।

বিভার জন্ম ১৯১৩ সালে কলকাতায়। তাঁর পিতা বঙ্কুবিহারী চৌধুরী ছিলেন একজন প্রখ্যাত ডাক্তার এবং অবিভক্ত বাংলার হুগলি জেলার ভান্ডারহাটির জমিদার বংশের সন্তান। তাঁর মা ঊর্মিলা দেবী ছিলেন ব্রাহ্ম। ঊর্মিলা দেবীকে বিবাহ করার পর বঙ্কুবিহারী চৌধুরী ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে যুক্ত হন। ফলস্বরূপ তিনি পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হন। বিভা ছিলেন পাঁচ বোন আর এক ভাইয়ের মধ্যে তৃতীয়। ব্রাহ্মসমাজ

আন্দোলন সুপরিচিত ছিল সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় সংস্কারের জন্যে। সেই সঙ্গে নারী শিক্ষা প্রসারে ব্রাহ্মসমাজের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। ব্রাহ্মসমাজের জীবনদর্শন ও প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থা ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছিল বিভাকে।

বিভা চৌধুরী বেথুন স্কুল থেকে বিদ্যালয় শিক্ষা শেষ করেন। তারপর তিনি কলকাতার রাজাবাজার সায়েন্স কলেজ থেকে পদার্থবিদ্যায় সাম্মানিক সহ বিজ্ঞানে স্নাতক হন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩৬ সালে পদার্থবিদ্যায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের ১৯৩৪-৩৬ বর্ষের এম.এসসি ক্লাসের একমাত্র মহিলা পড়ুয়া ছিলেন তিনি!

স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের পর বিভা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'পদার্থবিজ্ঞানের পালিত অধ্যাপক' ডঃ দেবেন্দ্রমোহন বোসের অধীনে গবেষণা শুরু করেন। ডঃ বোস পরে বসু বিজ্ঞান মন্দিরের অধিকর্তা হিসাবে যোগদান করলে বিভাও তাঁর সঙ্গে বসু বিজ্ঞান মন্দিরেই কাজ শুরু করেন। তাঁদের গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল মহাজাগতিক রশ্মি। প্রাথমিকভাবে ক্লাউড চেম্বার বা মেঘকক্ষ ব্যবহার করে মহাজাগতিক কণার ভর নির্ণয় করলেও তাতে সমস্যা হচ্ছিল। কারণ, এই যন্ত্র বেশিক্ষণ ব্যবহার করা সম্ভবপর হয় না। তাই বিকল্প উপায় হিসেবে বিভা ও ডঃ বোস ফটোগ্রাফিক প্লেট ব্যবহার করলেন। ফটোগ্রাফিক প্লেট ব্যবহারের সুবিধে হল একে যতক্ষণ খুশি ব্যবহার করা যায়, সারাক্ষণই তা সক্রিয় থাকে। ফটোগ্রাফিক প্লেটের পাতলা কাঁচের পাতের ওপরে রূপার যৌগ সিলভার আয়োডাইডের (বা ব্রোমাইডের) ইমালশন বা অবদ্রব লাগানো থাকে। এই প্লেটে মহাজাগতিক রশ্মি এসে পড়লে প্লেটে উপস্থিত সিলভার আয়োডাইড রূপা এবং আয়োডিনে ভেঙে যায়। প্লেটের গায়ে বিন্দু-বিন্দু রূপা আটকে যায়। এই বিন্দুগুলো দেখে বোঝা যায়, মৌলিক কণা কোন পথ দিয়ে গিয়েছে। প্লেটের কোনও নিউক্লিয়াসের সঙ্গে যদি কণার ধাক্কা লাগে, তাহলে তার পথটা বেঁকে যায়। ডঃ বোস এবং বিভাই প্রথম দেখিয়েছিলেন, কতটা পথ বাঁকল তা পরিমাপ করে তার থেকে কণার ভর নির্ণয় করা সম্ভব। আবার ভারী কণারা একসঙ্গে বেশ কয়েকটা সিলভার আয়োডাইড অণুকে ভেঙে দেয় বলে বেশি রূপা মুক্ত করে। ফলে রূপার বিন্দুগুলো বেশি ঘন অবস্থায় জমে থাকে। এভাবে বিন্দুর ঘনত্ব আর কতটা পথ বেঁকে গেছে তা দেখে কণার ভর নির্ণয় করা সম্ভব হয়। ১৯৩৮-১৯৪১ সালের মধ্যবর্তী সময়ে বিভা চৌধুরী ও ডঃ বোস লিখিত কণার ভর নির্ণয় সংক্রান্ত তিনটি গবেষণাপত্র ইংল্যান্ডের বিখ্যাত নেচার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

এদিকে আবার ফটোগ্রাফিক প্লেট ব্যবহার করবার ঝক্কিও কম ছিল না। বায়ুমণ্ডল বাধা দেওয়ার কারণে মাটির কাছে মহাজাগতিক রশ্মি কম আসে। তাই গবেষণার জন্য ফটোগ্রাফিক প্লেটগুলোকে কখনও পাহাড়ের ওপর, আবার কখনও রাখতে হত বেলুনে। বিভারা দার্জিলিং, সান্দাকফু এবং ভুটান সীমান্তের নিকটবর্তী ফারি জং এলাকায় প্লেটগুলো রেখেছিলেন। সে-আমলে শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক গবেষণার তাগিদে এমন দুর্গম জায়গায় একজন মহিলার উপস্থিতি ছিল সত্যিই অকল্পনীয়! কয়েকমাস পরে প্লেটগুলো নিয়ে এসে পরীক্ষা করা হলে তাঁরা দু'ধরনের ভর পেলেন। একটি ভর ইলেক্ট্রনের ভরের প্রায় ২০০ গুণ। অপর ভরটি ইলেক্ট্রনের ভরের প্রায় ৩০০ গুণ। অর্থাৎ তাঁরা দু'ধরনের অতিপারমাণবিক কণার খোঁজ পেয়েছিলেন। কিন্তু কণা দুটিকে পুরোপুরি আলাদা করে চিনতে পারেন নি। ভর নির্ণয়েও খানিকটা ত্রুটি রয়ে গিয়েছিল।

কয়েক বছর পরে, ১৯৪৭ সালে, ইংরেজ পদার্থবিজ্ঞানী সিসিল পাওয়েল ফটোগ্রাফিক প্লেট ব্যবহার করে দু'ধরনের কণাকে আলাদা করে চিনতে পারেন। সেগুলি বর্তমানে পাইওন ও মিউয়ন নামে পরিচিত। তাই বলা যায়, বিভাদের ফটোগ্রাফিক প্লেটেই প্রথম ধরা দিয়েছিল পাইওন ও মিউয়ন নামক দু'ধরনের অতিপারমাণবিক কণা। পাওয়েল নিজেই উল্লেখ করেছেন, ভর মাপার জন্য বিভাদের আবিষ্কৃত পদ্ধতি ব্যবহার করেই তিনি সাফল্য পেয়েছেন। তবে পাওয়েলের গবেষণা পদ্ধতি ছিল আরও উন্নত। তাঁকে ১৯৫০ সালে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, একই সময়ে

ফটোগ্রাফিক প্লেট কাজে লাগিয়ে গবেষণা শুরু করলেও বিভারা কেন ১৯৪৪ সালে এই গবেষণা থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন? কেন পৌঁছতে পারেন নি কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে? উত্তর লুকিয়ে আছে সেই ফটোগ্রাফিক প্লেটের মধ্যেই। আসলে বিভারা যে ফটোগ্রাফিক প্লেট নিয়ে কাজ করেছিলেন, তা ছিল হাফটোন প্লেট। হাফটোন প্লেটের একদিকে ইমালশন লাগানো থাকে, ফুলটোন প্লেটের থাকে দু'দিকে। স্বাভাবিকভাবেই ফুলটোন প্লেট অনেক ভাল। গবেষণা শুরু করবার অল্পদিনের মধ্যেই, ১৯৩৯ সালে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। তখন ফুলটোন প্লেট দুষ্প্রাপ্য হয়ে ওঠে। ফলত বিভাদের হাফটোন প্লেট দিয়েই কাজ চালাতে হয়। তাই তাঁদের ভর নির্ণয় ত্রুটিমুক্ত হয় নি। ১৯৪৫ সালে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে আবার ফুলটোন প্লেট পাওয়া গেলেও বিভারা ততদিনে হতাশ হয়ে এই বিষয়ে গবেষণা বন্ধ করে দিয়েছেন। এদিকে পদার্থবিজ্ঞানী পাওয়েল ব্রিস্টলে উন্নত ফুলটোন প্লেট কাজে লাগিয়ে কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করেন। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ না বাধলে বিভারা হয়ত ফুলটোন প্লেট ব্যবহার করতে পারতেন। তাহলে সম্ভবত দুই বাঙালি নোবেলজয়ী হিসেবে বিভা চৌধুরী ও দেবেন্দ্রমোহন বোসের নাম বিজ্ঞানের ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লেখা থাকত।

মহাজাগতিক রশ্মি বিষয়ে গবেষণার জন্যে প্রসিদ্ধ নিউক্লীয় পদার্থবিজ্ঞানী হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা বম্বেতে (বর্তমানে মুম্বাই) তাঁর সদ্য প্রতিষ্ঠিত টাটা ইন্সটিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চে (টিআইএফআর) গবেষণার জন্যে ডঃ বিভা চৌধুরীকে আহ্বান জানান। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে ডঃ চৌধুরী ১৯৪৯ সালে ভারতে ফিরে এসে টিআইএফআর-এর প্রথম মহিলা বৈজ্ঞানিক হিসেবে যোগ দেন। সক্ষম!

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় গবেষণা চালিয়ে যাওয়ার মত অর্থের যোগান এবং উপাদানের ঘাটতির কারণেই সম্ভবত বিভা চৌধুরী গবেষণার জন্যে যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ১৯৪৫ সালে ম্যানচেস্টারে অবস্থিত প্যাট্রিক ব্ল্যাকেটের মহাজাগতিক রশ্মি গবেষণাগারে যোগ দেন বিভা। সেখানে তিনি Extensive air showers (বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে মহাজাগতিক রশ্মির সংঘর্ষের ফলাফল) বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেন। ১৯৪৯ সালের প্রথমদিকে এই বিষয়ে তিনি 'Extensive air showers associated with penetrating particles' শীর্ষক গবেষণা-সন্দর্ভ জমা দেন এবং ১৯৫২ সালে ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন।

The Manchester Herald পত্রিকায় সে-সময় ডঃ বিভা চৌধুরীর সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়। শীর্ষনাম ছিল 'Meet India's New Woman Scientist — She has an eye for cosmic rays'। সাক্ষাৎকারে ডঃ চৌধুরী বলেন, 'মেয়েরা পদার্থবিজ্ঞান সম্পর্কে আতঙ্কিত —এটাই সমস্যা। এ বড়ই দুঃখজনক যে, আজ আমাদের দেশে খুব কম সংখ্যক মহিলা পদার্থবিজ্ঞানী রয়েছেন... আমি ভারত এবং ইংল্যান্ড উভয় দেশেরই মহিলা পদার্থবিদদের একহাতের অঙ্গুলিতে গণনা করতে পারি। বিদ্যালয়ে যে সকল মেয়েদের বিজ্ঞান সম্পর্কে ঝোঁক আছে, তাঁরা সকলেই রসায়ন বেছে নেন; সম্ভবত তাঁরা উপলব্ধি করেন, উচ্চতর পদার্থবিদ্যার জন্য গণিতের প্রয়োজনীয়তা প্রবল।'

মহাজাগতিক রশ্মি বিষয়ে গবেষণার জন্যে প্রসিদ্ধ নিউক্লীয় পদার্থবিজ্ঞানী হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা বম্বেতে (বর্তমানে মুম্বাই) তাঁর সদ্য প্রতিষ্ঠিত টাটা ইন্সটিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চে (টিআইএফআর) গবেষণার জন্যে ডঃ বিভা চৌধুরীকে আহ্বান জানান। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে ডঃ চৌধুরী ১৯৪৯ সালে ভারতে ফিরে এসে টিআইএফআর-এর প্রথম মহিলা বৈজ্ঞানিক হিসেবে যোগ দেন। ১৯৫০ সালে সেখানে কাউন্টার হডোস্কোপ ব্যবস্থার করে তিনি এমন এক

ধরণের কণার উপস্থিতি প্রমাণ করেছিলেন যা দুই বা তার বেশি এয়ার শাওয়ার তৈরি করতে সক্ষম!

১৯৫৪ সালে মিসিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে একজন পরিদর্শক প্রভাষক হিসাবেও অল্পদিন পড়িয়েছেন ডঃ চৌধুরী। ১৯৫৫ সালে তিনি ইতালির পিসায় অনুষ্ঠিত প্রাথমিক কণা সম্পর্কিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। আট বছর বম্বের টাটা ইন্সটিটিউটে কর্মরত থাকবার পরে, ১৯৫৭ সালে আমেদাবাদের ফিজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরিতে যোগ দেন তিনি। বিখ্যাত মহাকাশবিজ্ঞানী ডঃ বিক্রম সরাভাই তখন সেখানকার অধিকর্তা। সেখানে ডঃ চৌধুরী এক্সটেনসিভ এয়ার শাওয়ার সম্পর্কিত উচ্চশক্তি সম্পন্ন মিউয়ন সনাক্তকরণের গবেষণায় যুক্ত হন। ১৯৬০ সালে খ্যাতনামা পদার্থবিজ্ঞানী এম.জি.কে.মেননের সাথে কোলার স্বর্ণখনিতে প্রোটন ক্ষয় সংক্রান্ত গবেষণায় লিপ্ত হন তিনি। তাঁর পরবর্তী পরিকল্পনা ছিল এক্সটেনসিভ এয়ার শাওয়ার সম্পর্কিত রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি নির্গমন বিষয়ে রাজস্থানের মাউন্ট আবুতে বিক্রম সারাভাইয়ের সঙ্গে গবেষণা করবার। তবে সারাভাইয়ের অকাল মৃত্যু তাঁর সেই পরিকল্পনাকে গোড়াতেই বিনষ্ট করে দেয়।

ফিজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরি থেকে স্বেচ্ছাবসর গ্রহণের পর, ডঃ চৌধুরী সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের পরিচালক প্রফেসর ডি.এন.কুন্ডুর আহ্বানে কলকাতা ফিরে আসেন, এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অফ সায়েন্সের সহযোগিতায় সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে জীবনের শেষ অবধি কণা পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণা চালিয়ে যান। দীর্ঘ গবেষক জীবনে ডঃ চৌধুরী রচিত অসংখ্য গবেষণাপত্র বিখ্যাত আন্তর্জাতিক জার্নালগুলিতে প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৯১ সালের ২ জুন কলকাতার ব্রড স্ট্রিটের বাসভবনে তিনি পরলোক গমন করেন।

ডঃ চৌধুরী তাঁর সমকালে যথেষ্ট সম্মানিত ছিলেন। তবে এ কথাও সত্যি, তাঁর আজীবনব্যাপী কর্মকান্ডের যোগ্য স্বীকৃতি তিনি পান নি। তাঁর গবেষণা অত্যন্ত উচ্চমানের হওয়া সত্ত্বেও ভারতের তিনটি বিজ্ঞান একাডেমির কোনওটিতেই তাঁকে সদস্য পদ প্রদান করা হয় নি। কোনও বিশেষ সম্মান বা পুরস্কারেও তিনি ভূষিত হন নি। এ বড়ই দুর্ভাগ্যজনক, তাঁর মত একজন প্রতিভাময়ী বিজ্ঞানীকেও সমাজের গভীরে ডালপালা ছড়িয়ে থাকা লিঙ্গ বৈষম্যের শিকার হতে হয়েছিল। শুধুমাত্র নারী হওয়ার কারণে নানান বঞ্চনার সম্মুখীন হয়েছেন তিনি। এইসব বঞ্চনার কথা নিঃসন্দেহে এক লজ্জার ইতিহাস।

২০১৮ সালে দুজন শীর্ষস্থানীয় ঐতিহাসিক রাজিন্দর সিং এবং সুপ্রকাশচন্দ্র রায়ের লেখা 'A Jewel Unearthed- Bibha Chowdhuri- The Story of an Indian Woman Scientist' বইটি প্রকাশিত হয়। বিস্মৃতপ্রায় এক তারকা বিজ্ঞানীর জীবনকে অতীত-কুয়াশার জাল সরিয়ে লোকচক্ষুর সামনে নিয়ে এসেছে এই বইটি। তবে দুঃখের বিষয়, কোলার স্বর্ণখনিতে মহাজাগতিক রশ্মি বিষয়ক গবেষণার কথা বিভিন্ন নামীদামী গবেষণাপত্রগুলিতে আলোচিত হলেও, ডঃ চৌধুরির নাম কোথাও উল্লিখিত হয় নি! মর্যাদাপূর্ণ ভারতীয় বিজ্ঞান সংস্থাগুলি থেকে প্রকাশিত বইগুলি আশ্চর্যজনকভাবে ডঃ চৌধুরী সম্পর্কে নীরব! ব্যাঙ্গালুরুর ইণ্ডিয়ান একাডেমি অব সায়েন্স কর্তৃক প্রকাশিত Lilavati's Daughters- The Women Scientists of India (2008), জার্নাল অব সায়েন্টোমেট্রিক রিসার্চ দ্বারা প্রকাশিত Scientifically Yours— Selected Indian Women Scientists (2017) প্রভৃতি অতি সাম্প্রতিক গ্রন্থগুলিতে ডঃ চৌধুরীর নাম এবং অবদানের কথা উল্লেখ করা হয় নি!

পরিশেষে এটুকুই সান্ত্বনা, কখনও অবসরে খোলা আকাশের নীচে দাঁড়ালে মনে পড়বে একটি বাঙালি মেয়ে তারা হয়ে নীরবে ফুটে আছে আকাশে। তাঁর অসামান্য মেধার উজ্জ্বল আলোকচ্ছটা, বিজ্ঞানকে আমৃত্যু ভালবাসার প্রতিশ্রুতি এবং লিঙ্গবৈষম্যমূলক সামাজিক নির্মাণের বিরুদ্ধে অদম্য লড়াই অসংখ্য নারী বিজ্ঞানীকে অনুপ্রাণিত করবে আগামীদিনে। তাঁর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে ভবিষ্যতে আরও বহু সংখ্যক নারী পদার্থবিজ্ঞানকে ভালবেসে গবেষণা করতে এগিয়ে আসবেন।

এক দৃঢ়চেতা নারী সত্যবতী

শাঁওলি দে

মহাভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র সত্যবতী। আদি পর্বের একশ সাতাশতম অধ্যায়ের পর থেকে তাঁর উল্লেখ আর না থাকলেও মহাভারতের মূল ঘটনার সূত্রপাতই সত্যবতীর জীবন থেকে।

মহাভারতে রাজা শান্তনু, সত্যবতী ও ভীষ্মের কাহিনী খুব বেশি প্রচলিত। সে গল্পে যাওয়ার আগে সত্যবতীর জন্মকাহিনী জানা আবশ্যক। সত্যবতীর জন্মের গল্পটি অদ্ভুত। চেদীরাজ উপরিচর বসু একবার শিকারে গিয়ে পত্নীর কথা মনে করে কামাতুর হয়ে পড়েন এবং সেখানেই বীর্যপাত ঘটান। এরপর তিনি একটি শ্যেনপাখিকে সেই বীর্য দিয়ে অনুরোধ করেন তাঁর স্ত্রীকে পৌঁছে দিতে। রাজা উপরিচর বসুর কথামত সেই শ্যেনপাখি বীর্য নিয়ে যাওয়ার সময় সেটি যমুনার জলে পরে যায় ও অদ্রিকা নামের এক মৎস্যকন্যা তা খেয়ে গর্ভবতী হন। অদ্রিকা নিজেও ছিলেন একজন শাপগ্রস্ত মৎসরূপিণী অপ্সরা।

এর কিছুকাল পর ধীবররাজ দাশের জালে মৎস্যরূপী অদ্রিকা ধরা পড়লে, দাশ দেখেন তাঁর গর্ভে রয়েছে একটি পুত্র ও একটি কন্যা। কালক্রমে তাদের জন্ম হয় ও ধীবররাজ সেই উপরিচর বসুর কাছেই ওদের নিয়ে যান। চেদীরাজ নিজে পুত্রটিকে গ্রহণ করলেও কন্যাটিকে ধীবররাজকে দিয়ে দেন। কন্যাটির গায়ে তীব্র মাছের গন্ধ থাকায় তাঁকে মৎসগন্ধাও বলা হয়। গায়ের রঙ কালো বলে তাকে কালীও বলা হত। এই মৎসগন্ধাই হলেন পরমাসুন্দরী সত্যবতী। অন্যদিকে তাঁর যমজ ভাইটি পরবর্তীকালে মৎসরাজ নামে এক ধার্মিক রাজা হন। এই সত্যবতীই ঘটনাক্রমে পাণ্ডব ও কৌরবদের প্রপিতামহী। এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা জেনে রাখা প্রয়োজন, সত্যবতী কুমারী অবস্থায় ঋষি পরাশরের ঔরসে একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দেন যাকে আমরা ব্যাসদেব বলে চিনি। এক দ্বীপে জন্ম হয়েছিল বলে তাঁর আরেক নাম কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন, যিনি স্বয়ং এই প্রকাণ্ড মহাকাব্যের রচয়িতা।

ঋষি পরাশর একবার যমুনা পার করার সময় একটি সুন্দরী রমণীর নৌকায় ওঠেন এবং তাঁর রূপ দেখে মুগ্ধ ও কামাতুর হন। সেই সুন্দরী নারীই হলেন সত্যবতী। পিতা ধীবররাজ দাশের কথামত তিনি যমুনায় নৌকা চালাতেন। শরীরে গন্ধ থাকায় কেউ তাঁর কাছে ঘেঁষত না। ঋষি পরাশর সত্যবতীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁর সঙ্গে মিলিত হতে চান। সেই সঙ্গে তাঁদের পুত্রসন্তানেরও কামনা করেন। কিন্তু দিনের আলোয় ও যমুনা নদীর তীরে থাকা অসংখ্য মানুষের সামনে মিলিত হতে রাজি হন না সত্যবতী। পরাশর মুনি তখন মন্ত্রবলে এক মায়াবী কুয়াশার সৃষ্টি করেন ও মিলনের জন্য সত্যবতীকে কাছে ডাকেন। সত্যবতী তবু কুমারী অবস্থায় তার কৌমার্য হারাতে রাজি হন না। প্রেমে ও কামে কাতর ঋষি পরাশর সেই মুহূর্তে জানান যে, মিলিত হলেও সত্যবতী কুমারীই থাকবেন এবং তৎক্ষণাৎ সন্তানও ভূমিষ্ট হবে যাতে গর্ভধারণও কারও চোখে না পড়ে। সেই সন্তানকে ঋষিই পালন করবেন সে কথাও দেন। অবশেষে সত্যবতী রাজি হন ও পরাশরের ঔরসে ব্যাসদেবের জন্ম দেন। পরাশরের আশীর্বাদে তাঁর শরীর থেকে মাছের গন্ধ চলে গিয়ে সুমিষ্টঘ্রাণ আসতে থাকে। বহু যোজন দূর থেকে সেই গন্ধ পাওয়া যেত বলে সত্যবতীর আরেক নাম যোজনগন্ধাও।

এই ঘটনার বেশ কিছুকাল পর হস্তিনাপুরের রাজা শান্তনুর সঙ্গে সত্যবতীর দেখা হয়। অপরূপ সুন্দরী ও

সুগন্ধী সত্যবতীকে দেখে শান্তনু তাঁকে সরাসরি বিয়ের প্রস্তাব দেন ও হস্তিনাপুরের রাজমহিষী করতে চান। কিন্তু সত্যবতীর পিতা ধীবররাজ সব শুনে রাজা শান্তনুর কাছে করজোরে বলেন, যদি রাজা কথা দেন যে তাঁর এবং সত্যবতীর সন্তানই ভবিষ্যতে হস্তিনাপুরের রাজা হবেন তবেই তিনি তাঁর কন্যাকে রাজার হাতে তুলে দেবেন। রাজা শান্তনুর দেবী গঙ্গার গর্ভজাত পুত্র দেবব্রত যে হস্তিনাপুরের যোগ্য উত্তরাধিকারী সে বিষয়ে ধীবররাজ নিশ্চিত ছিলেন। দাশের কথা শুনে শান্তনু মর্মাহত হন ও হস্তিনাপুর ফিরে যান। কারণ এই কথা মানার কোনও ইচ্ছেই ছিল না সেই মুহূর্তে। দেবব্রত ছিলেন সব দিক দিয়েই যোগ্যতম। কিন্তু বাড়ি ফিরে তিনি বিমর্ষই থাকতেন সারাক্ষণ। সত্যবতীর সৌন্দর্যে প্রায় পাগল হয়ে উঠছিলেন তিনি। পুত্র দেবব্রত এক বিশ্বস্ত মন্ত্রীর কাছে সব ঘটনা শুনে নিজেই ধীবররাজের সঙ্গে দেখা করেন।

ধীবররাজের কথা শুনে দেবব্রত প্রতিজ্ঞা করেন তিনি কখনই হস্তিনাপুরের সিংহাসনের দাবিদার হবেন না। তখন ধীবররাজ দাশ আরও বলেন যে, দেবব্রত রাজা হবেন না তিনি নিশ্চিত, কিন্তু তাঁর সন্তানেরাও যে দাবি করবেন না এ কথা কে বলতে পারে ! এই কথা শুনে দেবব্রত সকল দেবদেবীকে সাক্ষী রেখে এক ভীষণ প্রতিজ্ঞা করেন। ধীবররাজ দাশ ও সত্যবতীকে বলেন সারাজীবন ব্রহ্মচর্য পালন করবেন যাতে তাঁর কোনওদিন কোনও পুত্রই হতে না পারে। ব্রহ্মচর্য পালন করলেও তিনি স্বর্গেই স্থান পাবেন এই নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

এরপর আর না করার কিছু থাকে না। ধীবররাজ খুশি হন এবং রাজা শান্তনুর হাতে সত্যবতীর হাত সঁপে দেন। শান্তনু পুত্র এই এতবড় আত্মত্যাগে মোহিত হয়ে তাঁকে ইচ্ছামৃত্যুর আশীর্বাদ করেন। দেবব্রত এই ভীষণ প্রতিজ্ঞার জন্য ভীষ্ম নামে পরিচিত হন। আর এইভাবেই সত্যবতীর হস্তিনাপুরে আগমন ঘটে ও এক নতুন ইতিহাসের সৃষ্টি হয়।

শান্তনু ও সত্যবতীর বিবাহ পরবর্তী জীবন সুখেরই ছিল। তাঁদের চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য নামে দুই পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। কিন্তু দুজনেই ছিলেন ক্ষণজন্মা। চিত্রঙ্গদের মৃত্যুর পর খুব কম বয়সে বিচিত্রবীর্য রাজা হন। সত্যবতীর আদেশে তখন ভীষ্মই ভাইকে সিংহাসনে বসিয়ে রাজত্ব চালান এবং কাশীরাজের দুই কন্যা অম্বিকা ও অম্বালিকার সঙ্গে বিয়ে দেন। বিয়ের কিছুদিন পরই যক্ষ্মা রোগে বিচিত্রবীর্য মারা গেলে সত্যবতী নিজের কথা থেকে সরে এসে বংশরক্ষার জন্য ভীষ্মকে অম্বিকা ও অম্বালিকার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে বলেন। ভীষ্ম নিজের কথায়

অনড় থাকলে সত্যবতীর আদেশেই তাঁর অপর পুত্র ব্যাসদেবকে বলেন অম্বিকা ও অম্বালিকার গর্ভে পুত্র উৎপাদন করতে, যার ফল স্বরূপ ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর জন্ম হয়।

জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্র বড় হলেও শারীরিক কারণে সিংহাসনে বসতে পারেন না, পাণ্ডুই হন রাজা। তাঁর দুই পত্নী কুন্তী ও মাদ্রী। কিন্তু বনবাসে থাকাকালীন পান্ডুরও অকালমৃত্যু হল। সহমরণে যান মাদ্রী। কুন্তী পাঁচ পুত্রকে নিয়ে হস্তিনাপুরে ফেরেন, অন্যদিকে ধৃতরাষ্ট্রের স্ত্রী গান্ধারীও একশ পুত্র ও একটি কন্যার জন্ম দেন। হস্তিনাপুর জমজমাট হয়ে ওঠে। কিন্তু নিজের দুই পুত্র ও পৌত্র পাণ্ডুর অকাল মৃত্যুতে কার্যত

ভেঙে পড়েন সত্যবতী। তার ওপর আবার ব্যাসদেব জানান খুব শীঘ্রই পাণ্ডব ও কৌরবদের জীবনে আরও অন্ধকার নেমে আসবে, ধ্বংস হবে হস্তিনাপুর রাজ্য। সে ধাক্কা কি আদৌ সত্যবতী সামলাতে পারবেন? ব্যাসদেবের কথা শুনে সত্যবতী অম্বিকা ও অম্বালিকার সঙ্গে বাণপ্রস্থে যান ও কিছুদিন পর দেহত্যাগ করে স্বর্গে যাত্রা করেন।

এরপর আর সত্যবতীর কোনও উল্লেখ নেই মহাভারতে। তবু সম্পূর্ণ মহাভারতই দাঁড়িয়ে আছে তাঁর নেওয়া সিদ্ধান্তগুলোর ওপর। ঋষি পরাশরের সঙ্গে মিলনের ফলে জন্ম তাঁর পুত্র মহাভারতের রচয়িতা এবং পাণ্ডু ও ধৃতরাষ্ট্রের পিতা। অন্যদিকে দেবব্রতকে দিয়ে করানো প্রতিজ্ঞার ফলেই মহাভারতের মূল ঘটনার সূত্রপাত। প্রশ্ন জাগে যদি সত্যবতী এই প্রতিজ্ঞা না করাতেন তবে কি আদৌ মহাভারত রচিত হত?

সত্যবতীর চরিত্র পর্যালোচনা করলে আমরা এক দৃঢ়চেতা রমণীকে খুঁজে পাই। সেই যুগে দাঁড়িয়ে অশিক্ষিত হয়েও তিনি যেভাবে ঋষি পরাশরের থেকে কৌমার্য ঢাকার প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন তাতে এই প্রমাণ হয় যে, ঋষি যে তাঁকে বিয়ে করবেন এই নিয়ে তাঁর কোনও দিবাস্বপ্ন ছিল না। তিনি অত্যন্ত বাস্তববুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন। পরেও রাজা শান্তনুর সঙ্গে বিয়ের কথা উঠলে তিনি নিজের ও সন্তানদের জায়গা খুব বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সুরক্ষিত করে গেছেন। সেই সময়ের দিক দিয়ে বিচার করলে এই কারণেই সত্যবতীর চরিত্রটি অনেকের থেকে এগিয়ে থাকবে। ছেলেদের মৃত্যুর পর তাঁদের সন্তান না থাকায় তিনি পুত্রবধূদের অন্যের ঔরসে পুত্র উৎপাদনের আদেশ দেন। এতে তাঁর আধুনিক মনোভাবেরও পরিচয় মেলে।

হরিবংশ ও দেবীভাগবত পুরাণে সত্যবতীর কাহিনী লেখা আছে। মহাভারতে তিনি বিভিন্ন নামে পরিচিতা। গায়ে মাছের গন্ধ যখন তখন তিনি গন্ধকালী, আবার পরাশরের বরে সুগন্ধী হলে তিনি তখন গন্ধবতী। দাশরাজের কন্যা বলে ভীষ্ম তাকে দাশেয়ী নামেও সম্বোধন করতেন। বসুরাজের কন্যা জন্য তিনি বাসবী নামেও পরিচিত।

শীত মানেই গাছপালা বাড়িঘর ও নিজের দেখভালের সময় এল

আশা করছি সবার পুজো ও দীপাবলী মোটের মধ্যে ভাল কেটেছে, যদিও এবছর কেউই এই আশা নিশ্চয়ই রাখে নি যে সব একদম স্বাভাবিক হয়ে যাবে। হেঁটে হেঁটে পায়ের নতুন জুতোয় ফোস্কা ফেলে ঠাকুর দেখা আর রাস্তার পাশের স্টল থেকে যা পাচ্ছি খেয়ে নেওয়া সেসব এবার আর হয় নি। জোমাটো, সুইগি চুটিয়ে খাবার সাপ্লাই করে গেছে যদিও।

পুজোর ক'দিন বাড়িতে রান্না হবে না, এরকম একটা ঘোষণা আজকাল অধিকাংশ বাঙালি বাড়িতে শোনা যাচ্ছে বলে খবর। যার ফলশ্রুতি হিসেবে পুজো পরবর্তী সময়ে বেশ পৈটিক গোলযোগের খবর পাওয়া যাচ্ছে। এখন আবার সেটিও কাউকে বলা যাবে না। গোপনে পেট খারাপ সারান। পরের বছর থেকে পুজোর দিনগুলো হালকা হলেও বাড়িতে রান্না করতে চেষ্টা করলে পেটের পক্ষে মঙ্গল হবে এই আর কী।

যাইহোক পুজো তো শেষ, এখন সংখ্যায় সামান্য হলেও বাড়িতে এক দুজন অতিথি আসছেন। তাদের

জন্য

অ থ ব া

নিজের রসনা তৃপ্তির জন্য খুব চটজলদি দুটো উপায় বাতলে দিই। অর্ধেক কর্ন ফ্লাওয়ার আর ময়দা, তার মধ্যে সামান্য খাবার সোডা, নুন, চিনি, লঙ্কা গুঁড়ো বা গোলমরিচ গুঁড়ো আর জলের বদলে সোডা বা বিয়ার। এই ব্যাটার দিয়ে ঘাস ভেজে খেয়ে ফেললেও দারুণ লাগবে। তবে আমি ঘাস ভাজা খেতে বলছি না। এর মধ্যে আলু, বেগুন, পেঁয়াজ বা বক ফুল, কুমড়ো ফুল, যা কিছুই চটপট ভেজে নিয়ে অনায়াসে অতিথি সৎকার করা যায়। নিজেরাও সন্ধেবেলা একবাটি মুড়ি সহযোগে বসে পড়লেই হল।

এবার মিষ্টিমুখ। এটা না হলে চলে! এখন তো নাড়ু, তকথি বানানো উঠেই গেছে। বাজারে প্যাকেটে পাওয়া যায় দেখেছি। অতিথির আনা বা নিজের আনা রসগোল্লাগুলো রস থেকে হালকা হাতে চিপে নিয়ে একটা ছড়ানো বেকিং ট্রেতে সাজিয়ে রাখুন। পরিমাণ মত দুধে আধকৌটো মিল্ক মেড দিয়ে ঘন করুন। সামান্য এলাচ গুঁড়ো আর জাফরানের গোটা গোটা কয়েক কেশর। ঘন হয়ে এলে ঠান্ডা করে নিতে হবে, মানে ঘরের তাপমাত্রায় আসলে রসগোল্লার ওপর ঢেলে দিন। কনভেকশন মোডে ১৮০ ডিগ্রিতে মিনিট দশেক প্রিহিট করা আভেনে অন্তত ২৫ মিনিট বেক করুন। ওপরে কালচে বাদামি রং আসবে। মনমত রং না এলে নিশ্চিন্তে আরও পাঁচ/দশ মিনিট বেক করতে পারেন। তৈরি বেকড রসগোল্লা। বলরাম মল্লিকের দোকানের বিলটা নেহাৎ কম নয়, বেকড রসগোল্লা স্বাদেও এর থেকে কম না, আপনি যেটা নিজের হাতে বানাবেন।

সময় নিজের খেয়ালে কিন্তু এগিয়ে চলছে। এখন সিজন ফ্লাওয়ারের জন্য মাটি তৈরি করার সময়।

ষাট শতাংশ মাটি, দশ শতাংশ করে বালি আর কোকোপিট, কুড়ি শতাংশ গোবর সার অথবা ভার্মি কম্পোস্ট। এর সাথে পরিমাণ মত হাড়ের গুঁড়ো আর নিমখোল মিশিয়ে মাটি রোদে রাখুন। কিছুদিন রোদ খাইয়ে টবে ভরে রেডি করে রাখুন। এরপর বাজারে বা পরিচিত নার্সারি থেকে চারা কিনে এনে লাগিয়ে দিলে আপনার আশি শতাংশ কাজ হয়ে গেল। বাকি কুড়ি শতাংশ দেখভাল করলে শীতের সময় আপনার ঘর, বাড়ি রঙিন হয়ে আপনাকে যে আনন্দ দেবে তার কোনও পরিমাপ হয় না।

সবাই ভাল থাকুন। সুস্থ থাকুন।

পাতা মিত্র

EKHON DUARS, Vol-7, Issue-4 WBBEN/2014/56733 Rs. 30 only

ডুয়ার্সের বইপত্র। রংরুটের বইপত্র। ছোটদের বইপত্র

ডুয়ার্স বেস্ট সেলার

তিস্তা - উৎস থেকে মোহনা। অভিজিৎ দাশ। ২৫০ টাকা
ডুয়ার্স থেকে দিল্লি। দেবপ্রসাদ রায়। ১৫০ টাকা ***
চায়ের ডুয়ার্স কী চায়? গৌতম চক্রবর্তী ১১০ টাকা
ডুয়ার্সের চা অবলুপ্তির পথে? সৌমেন নাগ। ১৫০ টাকা ***
আলিপুরদুয়ার। প্রদোষ রঞ্জন সাহা সম্পাদিত। ২৫০ টাকা
কোচবিহার ২য় সংস্করণ। প্রদোষ রঞ্জন সাহা সম্পাদিত। ২৫০ টাকা
জলপাইগুড়ি। প্রদোষ রঞ্জন সাহা সম্পাদিত। ৩০০ টাকা
এখন ডুয়ার্স সাহিত্য ২০২০। শুভ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। ১৯৫ টাকা
গণ আন্দোলনে কোচবিহার। হরিপদ রায়। ২৪০ টাকা
রাণী নিরুপমা দেবীর নির্বাচিত রচনা। দেবায়ন চৌধুরী। ১৬০ টাকা
শ্রম ও জীবিকার উত্তরপক্ষ। প্রশান্ত নাথ চৌধুরী। ১৬০ টাকা
কথায় কথায় জলপাইগুড়ি। রণজিৎ কুমার মিত্র। ২০০ টাকা
আদিবাসী অসুর সমাজ ও সংস্কৃতি। প্রমোদ নাথ। ১৬০ টাকা

ডুয়ার্সের গল্প সংকলন

পঞ্চাশে ৫০। মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। ২৫০ টাকা
ডুয়ার্সের গপ্পোসপ্পো। সাগরিকা রায়। ১৫০ টাকা
চারপাশের গল্প। শুভ্র চট্টোপাধ্যায়। ১০০ টাকা ***
লাল ডায়েরি। মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা ***
সব গল্পই প্রেমের নয়। হিমি মিত্র রায়। ১৬০ টাকা
দিল সে দিল্লী সে। কল্যাণ গোস্বামী। ২৯৫ টাকা

ডুয়ার্সের পেপারব্যাক সিরিজ

ডুয়ার্সের দশ উপন্যাস। সংকলন। ১৯৫ টাকা
তরাই উৎরাই। শুভ্র চট্টোপাধ্যায়। ১৬৫ টাকা
লাল চন্দন নীল ছবি। অরণ্য মিত্র। ১১০ টাকা
শালবনে রক্তের দাগ। ১২৫ টাকা
অন্ধকারে মৃত্যু-আলিঙ্গন। বিপুল দাস। ৫৫ টাকা
মেঘের পর রোদ। মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। ৫৫ টাকা
কুন্তলিয়াদের দেশে। সুকান্ত গাঙ্গুলী। ৫৫ টাকা

ডুয়ার্সের কাব্য চর্চা

বিসমিল্লার সানাই চৌরাশিয়ার বাঁশি। অমিত কুমার দে। ২৫০ টাকা
পঞ্চাশ পর্যটন শেষে মাধুকরী ধান। অমিত কুমার দে। ২৫০ টাকা
ডুয়ার্সের হাজার কবিতা। অমিত কুমার দে সম্পাদিত। ৫০০ টাকা
বোধিবৃক্ষ ছুঁয়ে এক চির ভিক্ষুক। অমিত কুমার দে। ২৫০ টাকা

বিষয় পর্যটন

আমাদের পাখি।
তাপস দাশ ও উজ্জ্বল ঘোষ। ৪৯৫ টাকা
সিকিম। সংকলন। ২০০ টাকা ***
নর্থ ইস্ট নট আউট। গৌরীশংকর ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা
রংরুটে হিমালয় দর্শন। সংকলন। ২০০ টাকা ***
উত্তরবঙ্গের হিমালয়ে। প্রদোষ রঞ্জন সাহা। ২০০ টাকা ***
সব্যসাচীর সঙ্গে জলে জঙ্গলে। সংকলন। ১৫০ টাকা ***
মধ্যপ্রদেশের গড় জঙ্গল দেউলে।
সুভদ্রা উর্মিলা মজুমদার। ২০০ টাকা ***
সুন্দরবন অনধিকার চর্চা।
জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী। ১৫০ টাকা ***

প্রাণের ঠাকুর মদনমোহন। তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস। ১১০ টাকা
জয় জল্পেশ। শুভ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। ৯০ টাকা

অরণ্য কথা বলে।
শুভ্রকান্তি সিনহা। ১৫০ টাকা ***
সে আমাদের বাংলাদেশ।
গৌতম কুমার দাস। ২০০ টাকা
পাসপোর্ট প্রতিবেশিদের পাড়ায়।
দীপিকা ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা ***
তিন মহাদেশ দশ দিগন্ত।
শান্তনু মাইতি। ১৭৫ টাকা
মুর্শিদাবাদ। জাহির রায়হান। ১৯৫ টাকা
বাংলার উত্তরে টই টই। দ্বিতীয় সংস্করণ।
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। ১৯৫ টাকা

বিষয় নাটক

নাট্য চতুষ্টয়। রবীশ্বর ভট্টাচার্য। ১৬০ টাকা
নির্বাচিত বেতার-শ্রুতি নাট্যগুচ্ছ। সমর চৌধুরী। ২৪৫ টাকা
বাঙ্ময়। সব্যসাচী দত্ত সম্পাদিত। ১২৫ টাকা

শুরু হল ছোটদের সিরিজ

গাছ গাছালির পাঠ পাঁচালি। ঝেতা সরখেল। ১৯৫ টাকা
ডুয়ার্স ভরা ছন্দ ছড়া। বৈকুণ্ঠ মল্লিক সম্পাদিত। ১৯৫ টাকা

*** প্রায় নিঃশেষিত

বাড়িতে বসেই অর্ডার দিন আমাদের বই। পেয়েও যাবেন নিজের ঠিকানাতেই।
হোয়াটসঅ্যাপ করুন ৬২৯৭৭৩১১৮৮ নম্বরে
ন্যূনতম ৩০০ টাকার অর্ডার দিতে হবে। ৫০০ টাকা বা তার বেশি অর্ডার দিলে ডিসকাউন্ট মিলবে ২০%।
পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরার কোনও ঠিকানায় ক্যুরিয়ার খরচ লাগবে না।

আমাদের অনলাইন শোরুম **www. dooarsbooks.com**

PRINTER & PUBLISHER : PRADOSH RANJAN SAHA. On behalf of owner Mr. Pradosh Ranjan Saha, printed at Albatross Graphic Solution Pvt. Ltd., published at 3 Rajdanga Gold Park, Kolkata 700107, Editor - Pradosh Ranjan Saha.